অসিক্ষাপ্ত

সুমিত বর্ধন



অসিশপ্ত



প্রাপ্তমনস্ক কল্পবিজ্ঞান উপন্যাস

অসিশপ্ত

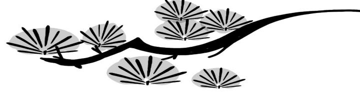
সুমিত বর্ধন



কল্পবিশ্ব পাবলিকেশনস

support your favorite writers, please purchase the books in hard form.”

ISBN: 978-81-952443-5-5
প্রচ্ছদ : ওঙ্কারনাথ ভট্টাচার্য
অলংকরণ : ওঙ্কারনাথ ভট্টাচার্য, অদ্রীজা ও সুমিত বর্ধন (ম্যাপ)
বর্ণশুদ্ধি : সংকল্প সেনগুপ্ত
পৃষ্ঠাবিন্যাস : সন্তু বাগ
ইবুক প্রকাশ : এপ্রিল ২০২৩



কী করুণ!
যোদ্ধার শিরস্ত্রাণের নীচে
ঝিঁঝির ডাক

মাৎসুও বাশো (১৬৪৪-৯৪)

লেখকের অন্যান্য বই

অর্থতৃষ্ণা

নক্ষত্রপথিক

কৈফিয়ত

জাপানি ‘জিদাইগেকি’ বা ঐতিহাসিক সিনেমা এবং নাটকের শৈলীকে কল্পবিজ্ঞানে ব্যবহার করার প্রয়াস থেকে বছরকয়েক আগে ‘মঙ্গলদেউড়ি’ নামে একটি গল্প লিখি। গল্পটি আকিরো কুরোসাওয়া পরিচালিত বিখ্যাত ‘রাশোমন’ চলচ্চিত্র এবং চলচ্চিত্রটির কাহিনিকার রাইয়ুসোনোকো আকুতাগাওয়ার ‘রাশোমন’ ও ‘ইয়াবু নো নাকা’ নামক যে দুটি গল্পকে ভিত্তি করে নির্মিত, তাদের আশ্রয় করে একটি কল্পিত দুনিয়ার পটভূমিকায় রচিত। অনান্য গুণীজনের লেখার পাশাপাশি আমার এই গল্পটি কল্পবিশ্ব ওয়েবজিনে স্থান পায়।

‘অসিশপ্ত’ উপন্যাসটিও জিদাইগেকি শৈলীকে কল্পবিজ্ঞানে ব্যবহার করতে চাওয়ার সেই একই দুঃসাহসের ফসল। কাইজান নাকাজাতো রচিত ‘দাই বোসাৎসু তোগে’ বা ‘মহান বোধিসত্ত্ব পাস’ কাহিনি অবলম্বনে পরিচালক কিহাচি ওকামোতো ১৯৬৬ সালে তাঁর ‘দ্য সোর্ড অফ ডুম’ বা ‘ধ্বংসের অসি’ সিনেমাটি নির্মাণ করেন। কাইজান নাকাজাতোর কাহিনিটি ধারাবাহিকভাবে ১৯১৩ থেকে ১৯৪৩ সালের মধ্যে জাপানের বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। বর্তমান উপন্যাসটির কাঠামোটি ওকামোতোর সিনেমা এবং নাকাজাতোর মূল কাহিনির ওপর আধারিত। ‘মঙ্গলদেউড়ি’র মতো ‘অসিশপ্ত’ কাহিনির পটভূমিকাও অম্বালিকা নামক কাল্পনিক গ্রহটি। তবে ‘মঙ্গলদেউড়ি’ গল্পটি ছিল মূল কাহিনির সন্তর্পণ অনুসরণ, কিন্তু এই উপন্যাসটি কাইজান নাকাজাতো এবং কিহাচি ওকামোতোর ইমারতের চারপাশে আরও নানা মহল তুলে একটি স্বতন্ত্র পুনর্নির্মাণের প্রচেষ্টা। তার মধ্যে যেমন রয়েছে লাভক্রাফ্‌টিয়ান হরর, তেমনই আছে অসিযুদ্ধের দর্শন এবং রাজনীতি। এই পুনর্নির্মাণের প্রয়াস সার্থক হল কি না, তার বিচার অবশ্যই থাকবে পাঠকের হাতে।

কাইজান নাকাজাতো এবং কিহাচি ওকামোতো ছাড়াও এই উপন্যাসে যে সমস্ত রচনার প্রভাব আছে, তার মধ্যে অসিযুদ্ধের দর্শন মূলত নির্ভরশীল ১৬৪৩ সালে মিয়ামোতো মুসাশি রচিত ‘গো রিন নো শো’ বা ‘পঞ্চবৃত্তের পুস্তক’ বইটির ওপর। এ ছাড়াও সেনগাই গিবোন, ফুসে ইয়াজিরো, মিনামোতো নো শিতাগো, কোজান ইচিগিও এবং আরও নানান কবির কাছে আমি ঋণী। তাঁদের কবিতার টুকরো ছড়িয়ে রয়েছে কাহিনির নানা অংশে।

অসিশপ্ত বইটির নির্মাণকার্যটি খুব একটা সহজ ছিল না। বাংলায় কল্পবিজ্ঞানে ওয়ার্ল্ড বিল্ডিং এর উদাহরণ খুব একটা নেই। সেখানে অম্বালিকার অচেনা জীবজগৎ, সমাজ সংস্কৃতি, শহর ইত্যাদি অলঙ্করণ ও মানচিত্রের মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা একেবারেই নতুন ধরনের প্রচেষ্টা। বইটিকে সর্বাঙ্গসুন্দর করে তোলার জন্যে কৃতজ্ঞতা জানাই শিল্পী ওঙ্কারনাথ ভট্টাচার্য ও প্রকাশক সন্তু বাগের প্রচেষ্টা ও নিরলস পরিশ্রমকে। এ ছাড়াও ধন্যবাদ জানাই প্রকাশক দীপ ঘোষ, সুপ্রিয় দাস ও গৌতম মন্ডলকে। কল্পবিজ্ঞানের সম্পূর্ণ একটি অচেনা শৈলির বই প্রকাশের দুঃসাহস দেখিয়ে তাঁরা আমার কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন।

উপন্যাসটি পাঠকের অনুগ্রহ পেলে আবার অন্য কোনও জিদাইগেকি কাহিনির হাত ধরে অম্বালিকায় পুনরায় পদার্পণের ইচ্ছে অবশ্যই রইল।

কিমধিকমিতি।

সুমিত বর্ধন

কালভৈরব পাস

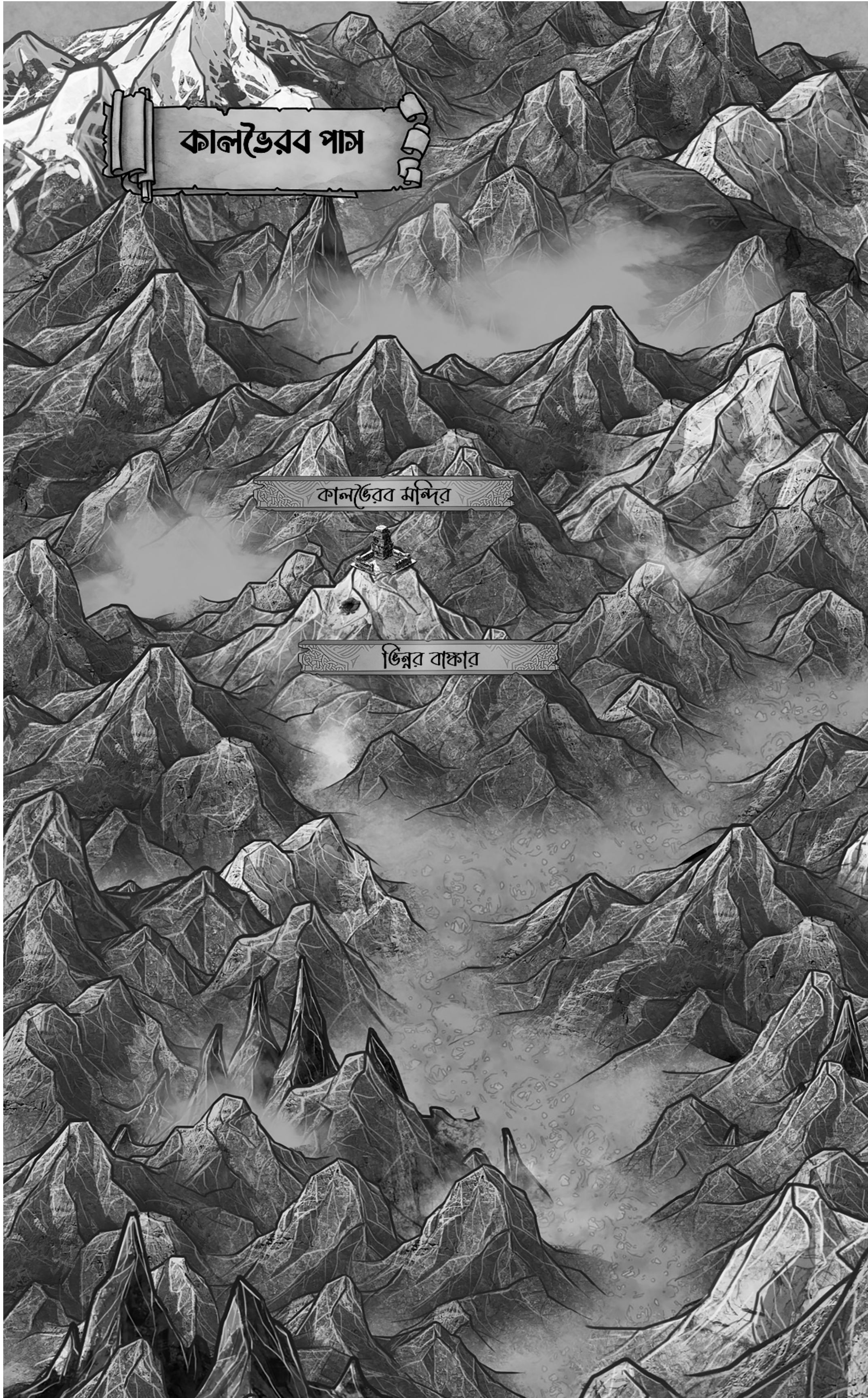


নির্জন অরণ্যপথ
সূর্যের তির্যক রেখা
কলকে ফুলের সুবাস



পাহাড়ের নীচে
ঢলে পড়ে সূর্য
ভেসে আসে ঘণ্টাধ্বনি




কালভৈরব পাস
কালভৈরব মন্দির
ভিন্নর বাঙ্কার



১

“আগেই সন্দেহ হয়েছিল মানুষ মারছে উটিয়া বাঁদরে, আর আজ একেবারে হাতেনাতে প্রমাণ পেয়ে গেলাম।”

বাইরে অন্ধকার গাঢ় হয়ে এসেছে। এক সারি জানলার কাচের পেছনে একটু আগেও আকাশের গায়ে যেখানে লালচে আভা দেখা যাচ্ছিল, এখন সেখানে তারা-জ্বলা কালো।

দেওয়ালগিরির ম্লান নীলচে আলোয় ঘরের অন্ধকার সবটা যায়নি। ঘরের কোণে আর আসবাবের আনাচকানাচে ঘন ছায়া জমে আছে। ঘরের এক প্রান্তে পড়ার টেবিল। তার ওপরে রাখা লণ্ঠন থেকে দেওয়ালের গায়ে ছবি পড়ে। টেবিলের একদিকে বসে হোমিগঞ্জের কাউন্সিলার অরূপরতন। দীর্ঘদেহী, মেদহীন ছিপছিপে গঠন, চওড়া কপাল। দু-হাত টেবিলে ছড়িয়ে ছবির দিকে তিনি ঝুঁকে তাকিয়ে থাকেন। ছবিতে একটা দ্বিপদ জীব। শীর্ণকায় লম্বাটে দেহ। ধূসর লোমে ঢাকা। গলা আর মাথার গড়ন অনেকটা মন্দিরচিত্রে দেখতে পাওয়া পৃথিবীর উটের মতন। দু-হাতের প্রান্তে কালো সরু আঙুল। হাঁটু পেছনদিকে বেঁকানো।

“কোথায় তোলা এটা?” কপালে ভাঁজ পড়ে অরূপরতনের।

টেবিলের উলটোদিকে বসা ইন্সপেক্টর বিকাশ ভারী শরীরটাকে চেয়ারের দুই হাতলের মধ্যে বাঁকিয়েচুরিয়ে কিছুটা স্বাচ্ছন্দ্য খোঁজার চেষ্টা করেন, “হোমিগঞ্জের ঠিক বাইরেই। আয়সরেশম কুঠির কাছে।”

“কে তুলল?”

রুমালে মুখ আর মাথার টাক মোছেন বিকাশ, “পরেশ। কুঠির গোমস্তা। পরেশ একটা নতুন ফোটোস্কোপ কিনেছে। কুঠির বাইরে সেটা চেক করছিল। হঠাৎ এটাকে দেখতে

পেয়ে—”

ঘরের অন্য প্রান্তে একটা র‍্যাকে সার দিয়ে খাড়া করা হাতিয়ার রাখা। বেশির ভাগই নানা সাইজের তলোয়ার, তবে দু-একটা লাঠি আর বল্লমও রয়েছে। দেওয়ালগিরির আলোয় তাদের লম্বা ছায়া পড়ে মেঝেয়।

র‍্যাকের সামনে একটা গদি-আঁটা কেদারায় বসে একটা বছর পনেরোর ছেলে। হাতে তার একটা শামুক বাঁশের বাঁশি। ঘরের উলটোদিকের দেওয়ালে ফেলা প্রাণীটার ছবির দিকে তাকিয়ে সে বড়দের কথা শোনে।

অরূপরতনের ধূসর চোখের তারায় উদ্‌বেগের ছায়া পড়ে, “লোকালয়ের এত কাছে! সাধারণত এদের কালভৈরব পাসের জঙ্গল ছাড়া দেখতে পাওয়া যায় না।”

আবার মুখ মোছেন ইন্সপেক্টর বিকাশ, “হ্যাঁ, ছবিটা না দেখলে আমিও বিশ্বাস করতাম না।”

“কোনদিকে গেছে পরেশ দেখেনি?”

“না। ছবি তুলেই পরেশ পড়ি-মরি করে কুঠিতে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দেয়। তারপর ঘণ্টাখানেক বাদে সাহস করে দু-চারজনকে সঙ্গে নিয়ে কোতোয়ালিতে খবর দেয়।”

টেবিলে ছড়ানো হাতের তালু দুটো মুঠো করেন অরূপরতন, “স্বাভাবিক। এর মতো হিংস্র প্রাণী আর এই গ্রহে নেই। কে শখ করে সামনে যাবে!”

“এই খুনিয়া জানোয়ার শহরের মধ্যে ঢুকে কী ফ্যাসাদ বাধাবে কে জানে?” ফের রুমালে মুখ মোছেন ইন্সপেক্টর বিকাশ, “এখন তো আর কিছু করা যাবে না, কোতোয়ালি থেকে সবাইকে খবর পাঠিয়েছি রাতটা সাবধানে থাকতে। সকাল হলেই খোঁজ শুরু করব।”

ওপর-নীচে মাথা নাড়েন অরূপরতন, “হ্যাঁ, এখন অন্ধকার হয়ে গেছে, ঝুঁকি না-নেওয়াই ভালো।”

“আপনার কাছে আমাকে কমিশনার সাহেব পাঠালেন আর-একটা কাজে। কাল সকালে এটাকে খুঁজতে লোকের দরকার। আপনার এস্টেটের কয়েকজনকে দিতে পারবেন কি?”

ঘরের অন্যদিকে বসা ছেলেটা বড়দের কথায় মনঃসংযোগ হারিয়ে ফেলে বাঁশিতে ফুঁ দেয়। দিনকয়েক আগে এক কালান্দরের বাঁশিতে শোনা সুর বাজাতে চেষ্টা করে আনাড়ি হাতে।

“আঃ রজত! শব্দ কোরো না।” মৃদু ধমক দিয়ে বিকাশের দিকে তাকান অরূপরতন, “অবশ্যই! কমিশনার সাহেবকে বলে দেবেন, শুধু আমার লোক কেন, আমিও সঙ্গে যাব।”

লণ্ঠন থেকে ফোটো ক্রিস্টাল বের করে রোশনি ক্রিস্টাল ভরেন ইন্সপেক্টর। ছবি মিলিয়ে গিয়ে নীল আলো পড়ে দেওয়ালে।

“তাহলে তো খুব ভালো হয়। আপনার মতো নামজাদা তলোয়ারবাজ সঙ্গে থাকলে লোকেও সাহস পাবে।” স্বস্তির ছোঁয়া লাগে ইন্সপেক্টর বিকাশের কণ্ঠে।

“আরে দুর! ছাড়ুন তো,” মৃদু হাসেন অরূপরতন, “ওসব লোকে বাড়িয়ে বাড়িয়ে বলে।”

লণ্ঠন তুলে নেন বিকাশ, “সে বললে হবে? ওস্তাদ তলোয়ারবাজ বলে এ তল্লাটে আপনাকে লোকে একডাকে চেনে। যা-ই হোক, চলি, কোতোয়ালিতে ফিরে কমিশনার সাহেবকে রিপোর্ট দিতে হবে।”

ঘর থেকে বেরিয়ে যান ইন্সপেক্টর, পেছনে টেনে বন্ধ করে দেন দরজা। জানলার কাচ দিয়ে রজত দেখতে পায়, অন্ধকারের মধ্যে দুলতে দুলতে ক্রমে দূরে সরে যাচ্ছে লণ্ঠনের নীল আলো। যেন আকাশ থেকে নেমে-আসা একটা তারা ধীরে ধীরে সরে যাচ্ছে অন্ধকারের বুক চিরে।

গলাখাঁকারি দেন অরূপরতন, “রজত!”

জানলার দিক থেকে চোখ ফেরায় রজত, “হ্যাঁ বাবা।”

“রজত, তোমাকে অনেকবার আগেও বলেছি, যখন দরকারি কথাবার্তা হবে, তখন অযথা শব্দ করবে না। কাজের মধ্যে তুমি বাঁশি বাজাচ্ছিলে কেন?’’

“আমি—’’

কিছু বলতে গিয়েও বলতে পারে না রজত, হাত তুলে তাকে বাধা দেন অরূপরতন, “দ্যাখো, বাঁশি বাজানোটা দরবেশ কালান্দরদের মানায়। তারা পথে পথে ঘুরে বেড়ায়। বড় হলে তোমাকে অনেক দায়িত্ব নিতে হবে। এবার থেকে একটু কাজে মন দাও।”

আরও হয়তো বকুনি খেত রজত, কিন্তু অরূপরতনের কথার মধ্যেই ভেতরের দরজা ঠেলে ঘরে ঢোকে শিবানী, এস্টেটের হাউসকিপার। রজতের মা-র মৃত্যুর পর থেকে এই বছর পঞ্চাশের মহিলাই এস্টেটের এক রকমের কর্ত্রী।

“ছোটেসাব, খেতে চলো।”

গোঁজ হয়ে বসে থাকে রজত, “খাব না, খিদে নেই।”

“খিদে না পেলেও রাত্রে খেতে হয়। চলো।”

রজত ফের কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার আগেই বাইরে থেকে হঠাৎ ভেসে আসে কোনও মানুষের কাতর আর্তনাদ।

সচকিত হয়ে জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকান অরূপরতন, “একটা চিৎকার শোনা গেল না?”

মাথা নেড়ে সায় দেয় শিবানী, “হ্যাঁ বড়েসাব, কাছেই কোথাও।”

বাইরের দিকে তাকায় রজতও। কিন্তু সেখানে নিশ্ছিদ্র অন্ধকার, কিছুই নজরে আসে না।

কয়েক মিনিট কেটে যায়, কিন্তু সেই প্রথম চিৎকারের পর আর কোনও আওয়াজ আসে না। শিবানীর দিকে ফেরেন অরূপরতন, শঙ্কাজড়িত কণ্ঠে বলেন, “তাড়াতাড়ি লোক ডাকো, আলো নিয়ে আসতে বলো। বাইরে গিয়ে খুঁজতে হবে।”

শশব্যস্তে বাড়ির ভেতরে যাওয়ার জন্যে পা বাড়ায় শিবানী।

কিন্তু সে কয়েক পা এগোতে-না এগোতেই, যেন একটা বিস্ফোরণ ঘটে। একটা জানলার পাল্লা, কাচ, কাঠ সব সশব্দে টুকরো টুকরো হয়ে ছিটকে আসে ভেতরদিকে, আর তার পেছনে ঘরের মেঝেয় আছড়ে পড়ে একটা রক্তাক্ত দেহ।

দেওয়ালগিরির ঝাপসা আলোতেও রজতের মানুষটাকে চিনতে অসুবিধে হয় না।

ইন্সপেক্টর বিকাশ।

শিবানীর দুই চোখ বিস্ফারিত হয়ে ওঠে, নিজের হৃৎপিণ্ডের শব্দ রজত যেন পরিষ্কার শুনতে পায়।

ভাঙা জানলা দিয়ে একঝলক ঠান্ডা হাওয়া বয়ে আনে নীল আপেলের মিষ্টি গন্ধ।

চোয়াল শক্ত করে টেবিলের ওপর ভর দিয়ে ঝুঁকে দাঁড়ান অরূপরতন।

কিন্তু তাঁর কাছ থেকে কোনওরকম প্রতিক্রিয়া আসার আগেই, ঠিক পরের মুহূর্তেই একটা তীক্ষ্ণ চিৎকার করে ভাঙা জানলা দিয়ে ঘরে লাফ দিয়ে এসে পড়ে সেই প্রাণীটা, যার ছবি একটু আগেই রজত দেওয়ালের গায়ে দেখেছে। একটা বুনো দুর্গন্ধ ছড়িয়ে যায় ঘরে।

উটিয়া বাঁদর।

কিছুক্ষণের জন্যে সময়ের গতি যেন থেমে যায়। রজতের মনে হয় ঘরখানা যেন দাবার সাজানো ছক, আর সেই ছকের ওপর তারা সবাই নিশ্চল হয়ে আটকে গেছে। ঘরের একদিকে টেবিলের পেছনে তারা বাবা। ঠিক তার উলটোদিকে হাতিয়ার র‍্যাকের সামনে সে। ঘরের মাঝখানে ভাঙা জানলার সামনে লম্বা গলা বাড়িয়ে উটিয়া বাঁদর। আর তার বিপরীতে মুঠো-করা দু-হাত মুখের কাছে তুলে বিস্ফারিত নয়নে দাঁড়িয়ে হাউসকিপার শিবানী।

থেমে-থাকা সময় আবার গতি পায়। টেবিলের পেছনে থেকে চিৎকার করে ওঠেন অরূপরতন, “রজত, হাতিয়ার, হাতিয়ার দে আমাকে একটা।”

কিন্তু রজতের হাতিয়ার দেওয়ার মতন অবস্থা নেই, হাঁটু দুটো দু-হাতে জড়িয়ে সে তখন ঠকঠক করে কাঁপছে।

লম্বা ঘাড়টা ঘুরিয়ে উটিয়া বাঁদর এতক্ষণ ঘরটা জরিপ করছিল, অরূপরতনের গলার স্বরে আকৃষ্ট হয়ে সেটা এবার এক-পা এক-পা করে টেবিলের দিকে এগোতে থাকে।

আবার চিৎকার করেন অরূপরতন, “রজত, হাতিয়ার দে, হাতিয়ার!”

নড়তে পারে না রজত। তার মনে হয় যেন তার সমস্ত শরীর অবশ হয়ে গেছে।

হাঁটার গতি বাড়িয়ে দেয় উটিয়া বাঁদর।

শিবানীর যেন হঠাৎ সংবিৎ ফেরে, হাতিয়ার র‍্যাকের দিকে দৌড়োতে শুরু করে সে।

শিবানীর দৌড়োনোর আওয়াজে সচকিত হয়ে ওঠে উটিয়া বাঁদর, লম্বা ঘাড়টা ঘুরিয়ে তার দিকে তাকায়। চোখগুলো তার কেমন একটা শয়তানি বুদ্ধিতে চকচক করে ওঠে, অরূপরতনকে ছেড়ে শিবানীর দিকে দৌড়ে আসে সেটা।

হাতিয়ার র‍্যাকের ওপর প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়ে শিবানী। একটা তলোয়ার টেনে নিয়ে অরূপরতনের দিকে ফিরে দু-হাতে মাথার ওপর তুলে ছুড়ে দেয় সর্বশক্তিতে।

কিন্তু ততক্ষণে উটিয়া বাঁদর এসে পড়েছে প্রায় ঘাড়ের ওপর। শিবানীকে প্রায় ন্যাকড়ার পুতুলের মতোই তুলে নিয়ে দেওয়ালের গায়ে ছুড়ে দেয় পশুটা।

অদ্ভুত ক্ষিপ্রতায় অরূপরতন লাফিয়ে ওঠেন টেবিলে, তারপর টেবিল থেকে স্প্রিং-এর মতন লাফিয়ে যান শূন্যে।

দেওয়ালে ধাক্কা খেয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে শিবানী, উটিয়া বাঁদর লাফিয়ে পড়ে তার ওপর, মাথা বাড়িয়ে দাঁত বসিয়ে ছিঁড়ে নেয় তার টুঁটি।

রক্তের ফোয়ারা ছড়িয়ে যায় শিবানীর গলা থেকে, তার পা দুটো ছটফট করতে থাকে, গোড়ালি দুটো এক বীভৎস ছন্দে ঠকঠক আওয়াজ তোলে কাঠের মেঝেতে।

অসাড় শরীরে চেয়ারে হাঁটু দুটো জড়িয়ে বসে থাকে রজত। তার হাতের মুঠোয় তখনও বাঁশিটা শক্ত করে ধরা।

শূন্যেই শিবানীর ছুড়ে-দেওয়া তলোয়ার দু-হাতে ধরে ফেলেন অরূপরতন। বাঁ হাত খাপের ওপর, ডান হাত তলোয়ারের হাতলে। মাটিতে পড়ার আগেই তলোয়ার টেনে নিয়ে খাপ ছুড়ে ফেলেন দূরে।

লম্বা ঘাড়টা ঘুরিয়ে তাঁর দিকে তাকায় উটিয়া বাঁদর, তারপর শিবানীর শরীরের ওপর থেকে ধীর ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়ায়।

মাটিতে পড়েই সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ান অরূপরতনও। বাঁ পা সামনে, ডান পা পেছনে, বাঁ পায়ের গোড়ালি মাটি থেকে তোলা। তলোয়ারের লম্বা ফলা খাড়া করে উঁচুতে তুলে ধরা, জমির সঙ্গে নব্বই ডিগ্রিতে। দুই মুঠোয় ধরা তলোয়ারের হাতল ডানদিকের গালের কাছাকাছি, কনুই ছড়ানো শরীর থেকে দূরে।

তাঁকে লক্ষ্য করে দৌড়োতে শুরু করে উটিয়া বাঁদর।

চেয়ারে অবশ হয়ে বসে থাকে রজত।

সবেগে দৌড়ে-আসা উটিয়া বাঁদরের বিন্দুমাত্র পরোয়া না করে একই জায়গায় অটল, অচল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন অরূপরতন।



তাঁর কাছাকাছি এসে পড়ে উটিয়া বাঁদর, তার উটের মতো মাথাটা সামনের দিকে ছিটকে আসে তাঁর গলা লক্ষ্য করে। ঠোঁটের ফাঁক থেকে বেরিয়ে আসে রক্ত-মাখা দাঁত।

কোনও দক্ষ নর্তকের মতোই সমস্ত শরীর নিশ্চল রেখে কেবল ডান পায়ে ভর দিয়ে উটিয়া বাঁদরের সামনে থেকে ডানদিকে ঘুরে যান অরূপরতন, বাঁ পা নিয়ে আসেন ডান পায়ের পেছনে। উটিয়া বাঁদরের লম্বা গলাটা এখন তাঁর বুকের সামনে আড়াআড়ি ছড়ানো।

খাড়া করে ধরে-থাকা তলোয়ারের ফলাটা পেছনদিকে এবার বেঁকিয়ে দেন অরূপরতন, তারপর কাঁধের ওপর থেকে বিদ্যুৎবেগে নামিয়ে আনেন উটিয়া বাঁদরের ঘাড়ের ওপর।

ঘাড় থেকে লম্বাটে মাথাটা সঙ্গে সঙ্গে খসে পড়ে মাটিতে, আর তার একটু পরেই রক্ত ছড়িয়ে আছড়ে পড়ে উটিয়া বাঁদরের কবন্ধ লাশটাও।

মাটিতে তলোয়ার ফেলে দেন অরূপরতন। লম্বা পায়ে এগিয়ে এসে মাটিতে পড়ে-থাকা শিবানীর চোয়ালের তলায় হাত রেখে তার নাড়িটা একবার দেখেন। তারপর তার খুলে-থাকা চোখের পাতা দুটো বন্ধ করে দিয়ে সস্নেহে কপালে একবার হাত বুলিয়ে দেন।

রজত তখনও চেয়ারের ওপর হাঁটু দুটো দু-হাতে জড়িয়ে বসে। শিবানীর পাশ থেকে উঠে এসে তার গালে সপাটে একটা চড় কষিয়ে দেন অরূপরতন।

"নালায়েক, নামর্দ! একটা অপদার্থ তৈরি হয়েছিস! কাল থেকেই তুই চিরাগ আখড়ায় যাবি তলোয়ারবাজির তালিম নিতে।"

রজতের মুঠো থেকে বাঁশিটা এক হ্যাঁচকায় টেনে নেন অরূপরতন। মাটিতে ফেলে পা দিয়ে পিষে দেন মড়মড় শব্দে।

২

সকালের নরম রোদে আলোছায়া-মাখা পাথরের উঠোনে দিনের তালিম শুরু করেন ওস্তাদ উদয়ভান, চিরাগ আখড়ার ওস্তাদ। কাঠের তলোয়ার হাতে সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে শোনে নবিশরা[১]।

উদয়ভানের বয়স পঞ্চাশ ছাড়িয়েছে, চুলে আর দাড়িতে সাদার ছোঁয়া লেগেছে, কিন্তু চওড়া কাঁধ আর ছড়ানো বুক প্রমাণ দেয় তাঁর স্বাস্থ্য এখনও অটুট।

প্রতিদিনের মতো আজও তলোয়ারবাজির তরিকাগুলো দিনের প্রথমে একবার রপ্ত করান উদয়ভান। রোদ লেগে ঝকঝক করে তাঁর হাতের মুঠোয় ধরা তলোয়ারের ইস্পাত কাচের ফলা।

"ফটক। তলোয়ারবাজির এইটা প্রথম তরিকা।" আখড়ার চারপাশের ছায়া ফেলা গাছের পাতার মর্মরধ্বনির সঙ্গে মেশে উদয়ভানের উঁচু গলার আওয়াজ। "ডান পা বাঁ পায়ের এক কদম আগে। বাঁ পায়ের গোড়ালি মাটি থেকে এক আঙুল তোলা, ডান পায়ের গোড়ালি তোলা সামান্য। পা একটু বেঁকানো, শরীরের ওজন পায়ের মাঝামাঝি। লাফ দেওয়ার জন্যে তৈরি। তলোয়ারের হাতল বাঁ হাতের তালুতে, ডান তালু হাতলের কড়ার নীচে হালকা

করে ধরা। তলোয়ারের ডগা দুশমনের বাঁদিকে চোখের দিকে। মাথা সোজা, চিবুক ভেতরে টেনে আনা। আর হাত? হাত কোথায় থাকবে? বিজন?”

নবিশদের দু-একজনের মুখে বাঁকা হাসি খেলে যায়। বিজন ওস্তাদের একেবারে পেয়ারের শাগির্দ। কারণে-অকারণে তাকে সবার সামনে তুলে ধরাটা আজকাল অনেকেরই গায়ে লাগে।

বিজন অবশ্য সেসবে ভ্রূক্ষেপ করে না, লাইন থেকে বেরিয়ে ওস্তাদের পাশে দাঁড়িয়ে ফটক তরিকায় কাঠের তলোয়ার তুলে ধরে।

“হাত শরীর থেকে সামান্য দূরে আলগা করে ধরা, যেন বাহুমূল আর শরীরের মধ্যে দু-দিকে দুটো বল ধরা আছে।”

বিজনের দিক হাত উঁচু করে দেখান উদয়ভান, “এই তরিকায় শরীর পুরোটাই তলোয়ারের আড়ালে থাকে। মাথাটা দেখা যায় বটে, কিন্তু মাথার ওপর কোপ চালালে পালটা দেওয়াটা শক্ত নয়।”

মুখের কাঁচাপাকা দাড়িতে হাত রেখে নবিশদের লাইনের দিকে তাকান উদয়ভান, “ফটকের কাছাকাছি আর কোনও তরিকা আছে?”

“বেওকুফ!” কেউ একজন উত্তর দেয়।

“হ্যাঁ। দুশমনকে বুদ্ধু বানিয়ে কাছে টেনে আনার তরিকা বলে এর নাম বেওকুফ। এটা প্রায় ফটক তরিকার মতোই, কেবল তলোয়ারের ডগা থাকবে নীচের দিকে, দুশমনের হাঁটুর দিকে তাক করা।” বিজনের দু-হাতে বাড়িয়ে-ধরা কাঠের তলোয়ারের মাথাটা একটা আঙুল দিয়ে নীচের দিকে নামিয়ে দেন উদয়ভান, “দুর্বল ভেবে দুশমন কাছে এলে তাকে পালটা দেওয়া এর উদ্দেশ্য। তবে এই তরিকা নতুনদের জন্যে নয়।”

খানিকটা অন্যমনস্ক হয়ে নবিশদের লাইনে দাঁড়িয়ে থাকে ছিপছিপে লম্বাটে রজত। গত তিন বছর ধরে কথাগুলো শুনে শুনে তার মুখস্থ হয়ে গেছে, এক কথা শুনতে তার কিছুটা বিরক্তিই লাগে। সুরেলা আওয়াজ তুলে আকাশে উড়তে-থাকা রামধনু ফিঙের ঝাঁকের দিকে নিজের অজান্তেই চলে যায় তার বাদামি রঙের চোখজোড়া।

“রজত!” ওস্তাদের হুংকারে রজতের মন আকাশ থেকে মাটিতে নেমে আসে। “সামনে দুশমন থাকলে কি আকাশের পাখি দেখবি?”

নবিশদের সারির মধ্যে থেকে দু-একটা খুকখুক হাসির শব্দ ওঠে।

“খামোশ!’’ ধমকে ওঠেন ওস্তাদ উদয়ভান, “রজত, সামনে আয়।”

মাথা নিচু করে নবিশদের লাইন পার করে সামনে বিজনের পাশে গিয়ে দাঁড়ায় রজত। আড়চোখে তাকিয়ে দ্যাখে বিজনের কান-এঁটো-করা হাসিটা।

জ্বলন্ত দৃষ্টিতে রজতের দিকে তাকান ওস্তাদ উদয়ভান, “ফটক যদি নিজে নিজেকে বাঁচানোর তরিকা হয়, তাহলে বেপরোয়া হামলার তরিকা কী?”

“চাঁদোয়া।” মাথা নিচু করে উত্তর দেয় রজত।

“করে দেখা।”

চাঁদোয়া তরিকায় পজিশন নেয় রজত। বাঁ পা সামনে, কাঠের তলোয়ার কোপ মারার মতো করে ধার ওপরদিকে রেখে দু-হাতে মাথার ওপর তোলা। ফলা পেছনদিকে আর ডানদিকে বেঁকানো। বাঁ হাত কপালের কাছে, কনুই কাছাকাছি টেনে আনা।

হাতের তলোয়ার তুলে রজতের দিকে ইঙ্গিত করেন, “এই তরিকা হামলা করার, দুশমনকে ভয় পাওয়ানোর। এতে একচোটে দুশমনকে মেরে ফেলা যায়, কিন্তু শরীর, গলা, কবজি আড়ালে থাকে না। এ তরিকায় কোনও ডিফেন্স নেই, সবটাই অফেন্স।”

বিজনের দিকে তাকান উদয়ভান, “বিজন!”

“ওস্তাদ!’’

“রজতের মুখোমুখি দাঁড়া!”

একটা বাঁকা হাসি খেলে যায় বিজনের ঠোঁটে, কাঠের তলোয়ার দু-হাতে ধরে রজতের মুখোমুখি দাঁড়ায় সে। ঢোঁক গেলে রজত। এই সামনে দাঁড়ানোর অর্থ সে ভালোই বোঝে।

“অফেন্স আর ডিফেন্স দুটোই যাতে আছে, সেই তরিকার নাম কি বিজন?’’

“খুঁটি! ওস্তাদ।”

“পজিশন নে।”

দেহের সঙ্গে তলোয়ারের ফলা প্রায় সমান্তরাল রেখে তলোয়ার উঁচু করে তুলে ধরে বিজন। তলোয়ারের হাতল চেপে-ধরা মুঠো দুটো ডানদিকের চিবুকের কাছে, তলোয়ারের ফলা আকাশের দিকে, বাঁ পা সামনে।

নিজের ইস্পাত কাচের তলোয়ারের ফলাটা কাঠের তলোয়ার উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে-থাকা দুই নবিশের মাঝখানে বাড়িয়ে ধরেন ওস্তাদ উদয়ভান, “বিজন, খুঁটি। রজত, চাঁদোয়া। দুটো তরিকা মুখোমুখি। এবার, হামলা!”

বিদ্যুৎবেগে দুজনের মাঝখান থেকে নিজের তলোয়ার সরিয়ে নেন উদয়ভান।

মাথার ওপর তুলে-রাখা তলোয়ার দিয়ে বিজনের শরীরের ওপর কোপ চালায় রজত, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তার নিজের সোজা করে তুলে-ধরা তলোয়ার বাঁদিকে মাথার সামনে আড়াআড়ি করে নামিয়ে আনে বিজন।

রজতের তলোয়ারের কোপ বিজনের শরীরের ওপর পড়ে না, আটকে যায় তার তলোয়ারের বাধায়। কাঠে কাঠে ঠোকাঠুকির ঠকাস শব্দটা আকাশের দিকে ছিটকে যায়, একটা যন্ত্রণার তরঙ্গ রজতের মুঠো থেকে শুরু হয়ে ছড়িয়ে পড়ে তার কাঁধের হাড় অবধি।

রজতকে সামলে নেওয়ার সুযোগ দেয় না বিজন। তার ডান হাতের কনুই ওপরদিকে ঘুরে আসে, কবজি মুচড়ে যায়, আর কাঠের তলোয়ারের ডগাটা ওপর থেকে কোনাকুনি নেমে এসে আঘাত করে রজতের বুকের মাঝখানে।

যন্ত্রণায় মুখটা কুঁকড়ে যায় রজতের। তার হাত থেকে তলোয়ার খসে পড়ে, দু-হাতে বুক চেপে ধরে মাটিতে বসে পড়ে সে।

একরকম ঘাড় ধরেই রজতকে টেনে দাঁড় করিয়ে দেন উদয়ভান, "চাঁদোয়া তরিকা ওস্তাদ তলোয়ারবাজদের জন্যে। বোঝাই যাচ্ছে, রজত তাদের মধ্যে পড়ে না।"

হাসির আওয়াজ ছড়িয়ে যায় সার দিয়ে দাঁড়ানো নবিশদের মধ্যে। বিজনের মুখের হাসিটা আরও চওড়া হয়।

তলোয়ার কুড়িয়ে নেওয়ার অছিলায় জামার হাতায় চোখের জলটা সবার অলক্ষে মুছে নেয় রজত।

৩

আখড়া থেকে ফিরে হাত-মুখ ধুয়ে শরীরের কালশিটে-পড়া দাগগুলোতে মলম লাগায় রজত, পোশাক পালটে দু-একটা জিনিস ঢোকায় পকেটে। তারপর বাইরের ঘরের হাতিয়ার র‍্যাক থেকে একটা তলোয়ার বের করে কোমরবন্ধে গুঁজে নিয়েই তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আসে বাইরে।

বাইরের ঘরে বেশিক্ষণ থাকতে পারে না রজত। সেই রাতের ঘটনার পর বছর তিনেক হয়ে গেছে, তবু ঘরে ঢুকলেই সেদিনের কয়েকটা গন্ধ যেন ফের তার নাকে ভেসে আসে।

উটিয়া বাঁদরের গায়ের দুর্গন্ধ, শিবানীর রক্তের তামাটে গন্ধ, ভাঙা জানলা দিয়ে ভেসে-আসা নীল আপেলের মিষ্টি গন্ধ, আর তার ঘাড়ের ওপর হুমড়ি খেয়ে-পড়া অরূপরতনের শরীর থেকে ভেসে-আসা সাবানে হালকা সুগন্ধ। সেই সঙ্গে কানে বাজতে থাকে সেদিন প্রথম শোনা দুটো কথা।

"নালায়েক! নামর্দ!"

হনহন করে পা চালিয়ে দেয় রজত, যেন স্মৃতিগুলো সব সে পেছনে ফেলে আসতে চায়। রাস্তা ধরে রজত হাঁটতে থাকে দক্ষিণদিকে, যেখানে আকাশের গায়ে দেখা যায় পাহাড়ের সারি।

হাঁটতে হাঁটতে হোমিগঞ্জের বাইরে এসে পড়ে রজত। আয়াসরেশমের কুঠি, চালকল, মালগুদাম পেরিয়ে কালভৈরব পাসের রাস্তা ধরে উঠতে থাকে পাহাড়ে।

প্রায় আধ ঘণ্টা ওঠার পর কালভৈরব পাসের একদম ওপর এসে দাঁড়ায় রজত। পাহাড়ি পথটা এখানে আরও দক্ষিণে নেমে গিয়ে পাহাড়ের মধ্যে হারিয়ে গেছে। এই রাস্তা গিয়ে মিশেছে রুসোগঞ্জ আর হকিন্সাবাদের রাস্তায়। এদিকে তাকালে জঙ্গল ছাড়া কিছু দেখতে পাওয়া যায় না। যেদিক দিয়ে সে উঠে এসেছে, সেদিকে তাকালে অবশ্য হোমিগঞ্জকে পরিষ্কার দেখতে পাওয়া যায়।

কালভৈরব পাস থেকে নেমে-আসা রাস্তাটা হোমিগঞ্জের আগে তিন ভাগ হয়ে গেছে। একটা দক্ষিণদিকে বেঁকে চলে গেছে গোডেলগাঁও অবধি, একটা শেষ হয়েছে হোমিগঞ্জে, আর অন্যটা চলে গেছে আরও উত্তরদিকে এশারগাঁওয়ের দিকে। এখানে থেকে দেখা না গেলেও এই রাস্তাই এশারগাঁওয়ের পর পুবদিকে বাঁক নিয়ে পাহাড়ের কোল ঘেঁষে চলে গেছে হকিন্সাবাদের দিকে।

হোমিগঞ্জের দিকে নেমে-যাওয়া কালভৈরব পাসের রাস্তা থেকে একটা সরু পথ পুবদিকের একটা পাহাড়ে উঠে গেছে। হোমিগঞ্জের দিকে আর-একবার তাকিয়ে এবার এই পথটা ধরে রজত। গাছের ছায়া-ঢাকা খাড়াই পথ ধরে একটু ওঠার পর এসে দাঁড়ায় পাহাড়ের মাথায়।

পাহাড়ের ওপরে একটা পাথরের মন্দির। বেশি বড় নয়। কয়েক ধাপ সিঁড়ি, একটা চাতাল, আর তার পেছনে কালভৈরবের বিগ্রহ। এই মন্দিরের নাম থেকেই পাহাড়ের মধ্যে দিয়ে যাওয়ার পথটার নাম কালভৈরব পাস হয়েছে।

কালভৈরবের মন্দিরের চেহারা অত্যন্ত সাদাসিধে, মন্দিরের গায়ে ছবি, খোদাই বা অন্য কোনওরকম অলংকরণ নেই। তবে মন্দিরের থামের গায়ে নানান নাম লেখা। এখানে যারা আসে, তারা থামের গায়ে নিজেদের নাম লিখে যায়। কয়েক শতাব্দী ধরে এই প্রথা পালন করার পর এখন থামগুলো আঁকাবাঁকা অক্ষরে ভরে গেছে।

থামে নাম লেখা ছাড়াও এখানে আর-একটা প্রথা আছে। যাত্রীরা এখানে চাতালে নানা জিনিস রেখে যায়, আবার চাতালে রেখে-যাওয়া জিনিসের মধ্যে থেকে নিজের যেটা প্রয়োজন, সেটা তুলে নিয়ে যায়। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এই মন্দিরে এই নীরব বিনিময় প্রথা চলে আসছে।

চাতালে উঠে কালভৈরবকে একটা প্রণাম করে মন্দিরের সিঁড়িতে বসে রজত। উত্তর-পশ্চিমের উঁচু উঁচু পাহাড় এখান থেকে পরিষ্কার দেখা যায়। তাদের বরফ-ঢাকা চুড়োগুলো বিকেলের আলোয় ঝকঝক করে।

দূরের পাহাড়গুলোর দিকে তাকিয়ে পকেট থেকে একটা বাঁশি বের করে তাতে ফুঁ দেয় তাতে রজত। বহুদিন আগে এক অচেনা কালান্দরের কাছে শোনা সুর বাজতে থাকে তার বাঁশিতে।

পাহাড়, গাছ, আকাশ তার বাঁশির সুর শোনে, কেউ তাকে নিয়ে হাসাহাসি করে না, কেউ তাকে ব্যঙ্গ করে না।

সুর যখন শেষ হয় তখন হোমিগঞ্জ থেকে ভেসে আসছে ঘণ্টার হালকা শব্দ। সন্ধের প্রস্তুতিতে যেন দূরের পাহাড়ের সারি তাদের চূড়ায় লাল রং মেখে ধীরে ধীরে অঙ্গে জড়িয়ে নিচ্ছে কুয়াশার চাদর।

বাঁশিটা পকেটে পুরে নামতে আরম্ভ করে রজত, অন্ধকার হওয়ার আগে নীচে নেমে যেতে হবে, এ অঞ্চলে উটিয়া বাঁদরের উৎপাত আছে।

পাহাড় থেকে নেমে কালভৈরব পাস ধরে রজত কিছুটা এগিয়েছে, হঠাৎ রাস্তার পাশের জঙ্গলে একটা মড়মড় করে ডালপালা ভাঙার আওয়াজ ওঠে। রজতের হৃৎপিণ্ডটা গলার কাছে লাফিয়ে ওঠে, তলোয়ারের মুঠের ওপর তার আঙুলগুলো সজোরে চেপে বসে। উটিয়া বাঁদর, ডিমকি হায়েনা, শিঙেল চিতা, এই জঙ্গলে হিংস্র পশুর অভাব নেই।

কিন্তু না, কোনও পশুর আক্রমণ নয়, আওয়াজের দিকে তাকিয়ে আশ্বস্ত হয় রজত। একটা গাছ কোনওভাবে উপড়ে গিয়ে পাহাড়ের গা বেয়ে ঝোপঝাড় ভাঙতে ভাঙতে নীচে

গড়িয়ে পড়ছে।

জঙ্গলে এভাবে গাছ ভেঙে পড়াটা নতুন কিছু নয়, এর আগেও রজত এরকম দেখেছে। মেটে খরগোশ বা ডোরা ইঁদুর গাছের গোড়ায় বাস করে গাছের শেকড় কেটে দিলে গাছে ওইভাবে ভেঙে পড়ে।

পথে দাঁড়িয়ে গাছের গড়ানো দেখছে রজত, হঠাৎ পাহাড়ের ওপর থেকে একটা বড় পাথর ছিটকে এসে তার কয়েক ফুট সামনে এসে পড়ে।

চমকে উঠে কয়েক পা পিছিয়ে যায় রজত, পাথরটা হয়তো গড়ানো গাছের ধাক্কায় পাহাড়ের গা থেকে খসে পড়েছে। এভাবে দাঁড়িয়ে থাকাটা নিরাপদ নয়, পাথরটা তার মাথাতেও পড়তে পারত। যাওয়ার জন্যে ফের পা বাড়ায় সে।

কিন্তু পথের মাঝে পড়ে-থাকা পাথরটার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় তার ওপর চোখ পড়তে আর-একবার দাঁড়িয়ে পড়তে হয় তাকে।

চওড়া চ্যাটালো গোল পাথরের স্ল্যাবটা দেখে বুঝতে অসুবিধে হয় না যে প্রকৃতির জল-হাওয়া তার রূপ গড়ে দেয়নি। উপরন্তু তার গায়ে খোদাই করা রয়েছে কোন এক অদ্ভুত লিপির আঁকিবুকি।

দ্বিতীয়বারের জন্যে রজতের হৃৎপিণ্ডটা লাফিয়ে ওঠে। তবে এবারে ভয়ে নয়, প্রত্যাশায়।

ভিন্নর বাঙ্কার! গাছের ধাক্কায় পাথরটা কোন ভিন্নর বাঙ্কারের মুখ থেকে খসে পড়েছে!

মানুষ অম্বালিকায় পা দেওয়ার বহু আগেই ভিন্নররা উধাও হয়ে গেছে এই গ্রহ থেকে। কোথায় গেছে, বা কেন গেছে, তার উত্তর কেউ জানে না। কিন্তু অম্বালিকায় রয়ে গেছে তাদের ফেলে-যাওয়া নানা প্রযুক্তি। কিছু মাটির ওপরে, আর কিছু ভূগর্ভে। তাদের ফেলে সে সমস্ত জিনিসের চাহিদা আকাশছোঁয়া।

নিজের ভয়গুলোকে দাবিয়ে রেখে কালভৈরব পাসের রাস্তা ছেড়ে জঙ্গলের মধ্যে ঢোকে রজত, মাথা উঁচু করে পাহাড়ের গায়ে খোঁজার চেষ্টা করে ভিন্নর বাঙ্কারের প্রবেশদ্বার।

নীচ থেকে পাহাড়ের গায়ের গাছপালা আর ঝোপঝাড়ের আলো-আঁধারির মধ্যে কোনও কিছু ঠাহর করা সহজ নয়। মাথা ঘুরিয়ে এদিক-সেদিক দেখেও কিছু নজরে না পড়তে রজত কিছুটা হতাশ হয়ে ভাবছে কী করবে, হঠাৎ পড়ন্ত আলো আর মেঘের কোন এক অদৃশ্য কারসাজিতে রোদের একটা তির্যক রেখা আকাশ থেকে যেন অদৃষ্টের আঙুলের মতোই পাহাড়ের গায়ে এসে পড়ে।

আর সে আলোয় রজত স্পষ্ট দেখতে পায় পাহাড়ের গায়ে গাছপালার সবুজের কোলে ভিন্নর বাঙ্কারের অন্ধকার গুহামুখ।

হাত-পায়ে ভর দিয়ে পাহাড়ের ওপর উঠে গুহার মুখের কাছে পৌঁছোয় রজত। গুহার মুখটা চার ফুটের বেশি চওড়া হবে না, তার চারপাশটা পাথর দিয়ে বাঁধানো। দেখলে বুঝতে অসুবিধে হয় না যে নীচে যে পাথরটা গড়িয়ে পড়েছে, সেটা দিয়েই এই গুহামুখটা শক্ত করে বন্ধ করা ছিল।

বাঁ হাতে রোশনি প্রদীপ ধরে আর ডান হাত তলোয়ারের হাতলে রেখে, ঘাড়-মাথা গুঁজে গুহার মধ্যে পা রাখে রজত। সরু গুহাটা সুড়ঙ্গের মতো এঁকেবেঁকে পাহাড়ের ভেতরে চলে গেছে, রোশনি প্রদীপের নীল আলোয় বেশি দূর দেখা যায় না। এবড়োখেবড়ো স্যাঁতসেঁতে দেওয়ালে গা ঘষটে কিছুটা দেখে, কিছুটা আন্দাজে রজত গুহার ভেতরে ঢুকতে থাকে।

কিছুটা যাওয়ার পর রজত বুঝতে পারে, সুড়ঙ্গটা ঢালু হয়ে ওপরের দিকে উঠছে, আর একই সঙ্গে গুহার ব্যাস ক্রমশ ছোট হয়ে আসছে। এবার আর ঘাড় গুঁজেও হয় না, একেবারে পিঠটা বেঁকিয়ে কোনওমতে এগোতে হয়। পায়ের নীচেটা পিচ্ছিল হয়ে আসে, জুতোর মধ্যে দিয়েও জলের স্পর্শ টের পাওয়া যায়।

মিনিট পাঁচেক এইভাবে যাওয়ার পর আচমকাই সুড়ঙ্গটা ফুরিয়ে যায়, আর রজত একটা খোলা জায়গায় এসে দাঁড়ায়।

চারপাশে রোশনি প্রদীপের নীল আলো ফ্যালে রজত। নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে বেশি দূর দেখা যায় না বটে, কিন্তু বেশ বোঝা যায় যে সে একটা চওড়া গুহার ভেতর এসে দাঁড়িয়েছে। গুহাটার ছাদটা অনেক উঁচুতে, দেওয়ালগুলোও বেশ দূরে।

রোশনি প্রদীপের আলোতে মাটিতে পড়ে-থাকা কিছু একটা চকচক করে ওঠে। কাছে গিয়ে আলো ফেলে ভালো করে দ্যাখে রজত।

লণ্ঠন। একটা লণ্ঠন।

রজতের মনের ভিন্নর পুরাবস্তু পাওয়ার আশাটুকু আচমকাই নিভে যায়। গুহায় লণ্ঠন পাওয়ার অর্থ তার আসার আগে এখানে মানুষের পা পড়েছে। অর্থাৎ এখানে যা ছিল, তার সবই হয়তো আগেই লুঠ হয়ে গেছে।

নিচু হয়ে লণ্ঠনটা জ্বালায় রজত। লণ্ঠনের জোরালো আলোয় এবার চারপাশটা ভালো করে দেখা যায়। গুহাটা দৈর্ঘ্য-প্রস্থে বিশ ফুটের মতন হবে, ছাদটা প্রায় দু-মানুষ উঁচুতে।

যেদিক থেকে সে গুহায় ঢুকেছে, তার উলটোদিকে পাথরের স্তূপ, হয়তো গুহাটা এককালে আরও বড় ছিল, ছাদ ধসে পড়ে বাকিটা বুজে গেছে। গুহার মাটিতে একটা জলের কুণ্ড, তার থেকে জল উপচে তিরতির করে বয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে তার আসা সুড়ঙ্গ দিয়ে। কুণ্ডের পাশ থেকে একটা প্যাঁচালো পাথরের সিঁড়ি উঠে গেছে গুহার ছাদ অবধি।

এবং রজতের আশঙ্কা অমূলক নয়, লণ্ঠনটা ছাড়া গুহাটা একেবারেই ফাঁকা। মাটিতে ছড়িয়ে পড়ে-থাকা ছোটবড় পাথরের টুকরো ছাড়া আর কিচ্ছু নেই সেখানে।

মুষড়ে পড়ে রজত। তার সমস্ত পরিশ্রমটাই বৃথা। সে আসার আগেই গুহা কেউ খালি করে দিয়েছে।

কিছুটা শেষ চেষ্টার মতো করেই প্যাঁচানো পাথরের সিঁড়িটা বেয়ে ওপরে ওঠে রজত। কিন্তু সেখানেও কিছু পায় না। সিঁড়িটা হঠাৎ করেই গুহার ছাদে শেষ হয়ে গেছে, আর ওপরে ওঠার জায়গা নেই।

সিঁড়িটা ছাদের যেখানে শেষ হয়েছে সে জায়গাটা লণ্ঠন তুলে একবার ভালো করে দ্যাখে রজত। না, কোনও লুকোনো দরজা চোখে পড়ে না রজতের, তবে সিঁড়ির শেষাংশ ঘিরে ছাদের গায়ে একটা হালকা রেখা দেখতে পায় সে।

হাত দিয়ে জায়গাটা ছোঁয় রজত। রেখার দু-দিকের স্পর্শ হাতের ছোঁয়ায় দু-রকম লাগে তার। আর-একবার লণ্ঠন তুলে ভালো করে দ্যাখে সে।

এবার বুঝতে অসুবিধে হয় না তার। যেখানে এখন ছাদ, সেখানে একটা ফোকর ছিল, যেখান দিয়ে ওপরে ওঠা যেত। কিন্তু কোনও কারণে সেই প্রবেশপথটা বুজিয়ে দেওয়া হয়েছে। যারা গুহা থেকে মালপত্র সরিয়েছে, তারাই হয়তো কাজটা করেছে।

কিন্তু কেন? কৌতূহল আরও জোরালো হয় রজতের, সিঁড়ি থেকে নেমে গুহার চারপাশ আর-একবার ভালো করে দেখতে আরম্ভ করে সে।

গুহার যেদিকটা পাথরের স্তূপ, সেখানটা খুঁটিয়ে দেখলে স্পষ্টই বোঝা যায় যে সেখানে একটা প্রবেশদ্বার ছিল। পাথরের স্তূপের চারপাশে সেই হারিয়ে যাওয়া প্রবেশদ্বারের খোদাই-করা ফ্রেমটা চিনতে অসুবিধে হয় না। রজতের প্রথমে বুঝতে ভুল হয়েছিল। গুহাটার ছাদ ধসে পড়েনি, পাথর দিয়ে সেটাকে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

কিন্তু কেন? ভিন্নর বাঙ্কার লুঠ করার কাজটা মানুষ অম্বালিকায় পা দেওয়া অবধি হয়ে আসছে। কিন্তু বাঙ্কার লুঠ করে তারপর তার কিছু অংশ বুজিয়ে দেওয়ার কথা রজত

কখনও শোনেনি। তার কৌতূহল প্রশমিত হওয়া দূরস্থান, আরও দ্বিগুণ হয়ে বেড়ে ওঠে।

লণ্ঠনের আলোতে এবার গুহার অন্য দেওয়ালগুলো দ্যাখে রজত। চারটে দেওয়ালেরই মাঝের অংশে একটা টানা লম্বা পটির মতন ফ্রেস্কো আঁকা। আর সেই ফ্রেস্কোর প্যানেলের পর প্যানেল জুড়ে কেবল ভিন্নরদের নানা নারকীয় ছবি।

ভিন্নরদের ছবি রজত আগে যে দেখেনি তা নয়। অম্বালিকায় নানান জায়গায় তাদের ছবি ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। ভিন্নরদের শরীরের আকারের সঙ্গে উটিয়া বাঁদরের চেহারার বেশ কিছুটা সাদৃশ্য আছে। অনেকেই মনে করে, জংলি উটিয়া বাঁদর থেকেই ভিন্নররা বিবর্তিত হয়েছে।

কিন্তু এই গুহার ফ্রেস্কোর মতো ভিন্নরদের এমন সব কুৎসিত, বীভৎস ছবি রজত আজ পর্যন্ত দেখেনি। ফ্রেস্কোর প্রতিটি প্যানেলে কেবল আঁকা বিকৃত যৌনাচার আর নৃশংস অত্যাচারের দৃশ্যপট।

ছবিগুলো দেখলে সর্বশরীর কেমন গুলিয়ে ওঠে। কিন্তু তার মনে ওঠা প্রশ্নের সূত্র খুঁজে পাওয়ার আশায় তা-ও প্রত্যেকটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দ্যাখে রজত।

প্রায় সব ক-টা ছবি যখন তার দেখা শেষ হয়ে এসেছে, একটা ছবিতে চোখ আটকে যায় তার। একটা পাহাড়ের চুড়োয় একদল ভিন্নর আর-একটি ভিন্নরের ওপর নির্যাতন করছে। তার চোখ খুবলে নিচ্ছে, তার হাত-পা কেটে নিচ্ছে।

ছবিতে আঁকা আকাশ আর তার প্রেক্ষাপটে আঁকা পাহাড়ের দিকে চোখ আটকে যায় রজতের। দৃশ্যটা তার কেমন পরিচিত লাগে।

হঠাৎ তার মনে পড়ে যায়, ঠিক এই দৃশ্যটাই সে খানিক আগে কালভৈরবের মন্দিরের কাছ থেকে দেখেছে। মন্দিরের সিঁড়িতে বসলে দূরের পাহাড়গুলোকে ওইরকমই দেখতে লাগে।

কপাল কুঁচকে আসে রজতের, সুড়ঙ্গের মধ্যে দিয়ে পাহাড়ের কোনদিকে সে এসেছে, ঠাহর করতে চেষ্টা করে। গুহার মাঝখানে ছাদে গিয়ে ঠেকা সিঁড়িটায় আর-একবার চোখ যায় তার।

আর কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই অন্ধকারে বিদ্যুৎ চমকানোর মতোই সে কোথায় আছে, তার কাছে সেটা জলের মতো পরিষ্কার হয়ে যায়।

কালভৈরবের মন্দির! এই গুহাটা কালভৈরবের মন্দিরের ঠিক নীচে। মানুষ যখন অম্বালিকায় আসে তখন কেউ পাহাড়চুড়োয় বাঙ্কারে ঢোকার মূল প্রবেশপথটা বন্ধ করে দিয়ে ওপরে মন্দির তুলে দেয়। এবং তারাই হয়তো গুহার অর্ধেকটা পাথর দিয়ে বুজিয়ে দেয়। কিন্তু কেন? কী রহস্য লুকিয়ে আছে এই গুহায়?

পকেট থেকে টাইমস্কোপ বের করে দ্যাখে রজত। বেশ দেরি হয়ে গেছে, তাকে অনেকটা পথ যেতে হবে। তা ছাড়া এর রহস্যের জট এখানে বসে ছাড়ানো সম্ভব নয়, হোমিগঞ্জে লোককে জিজ্ঞেস করলে, কিংবা কাউন্সিল হাউসের পুরোনো রেকর্ড ঘাঁটলে হয়তো কিছু সূত্র পাওয়া যেতে পারে।

যাওয়ার আগে গুহাটার ভেতর আর-একবার চোখ বোলাতে গিয়ে রজতের নজর পড়ে সিঁড়ির পাশে জলকুণ্ডের দিকে। পাহাড়ের ভেতরে কোনও জলের স্রোত প্রস্রবণ হয়ে বেরিয়ে এসেছে গুহার মাটি থেকে, অল্প অল্প করে গুহার পাথুরে মেঝে হয়ে গড়িয়ে চলে যাচ্ছে তার আসা সুড়ঙ্গ দিয়ে।

মাথায় একটা চিন্তা খেলে যায় রজতের। গুহাটা মানুষে খালি করে দিয়েছে বটে, কিন্তু জলের তলায় যদি ছোটখাটো দু-একটা পুরাবস্তু লুকিয়ে থাকে?

হারিয়ে-যাওয়া আশাটা আবার নতুন করে জেগে ওঠে রজতের মনে। লণ্ঠনটা সে তুলে ধরে জলকুণ্ডের ওপরে। কিন্তু লণ্ঠনের নীল আলোয় জলের অন্ধকার কাটে না। মসিবর্ণ জলের তলায় কী আছে তা দেখতে পাওয়া যায় না।

জলটা একবার হাতড়ে দেখার ইচ্ছেটা মনে জাগে রজতের, কিন্তু জলে হাত দিতেও তার সাহস হয় না। অম্বালিকায় বিষাক্ত প্রাণীর অভাব নেই। জলের মধ্যে ঘাপটি মেরে কী লুকিয়ে আছে, বলা মুশকিল।

খাপ থেকে তলোয়ার টেনে বের করে রজত, হাত না দিয়ে বরঞ্চ এটা দিয়ে জল নেড়ে দেখাটা বেশি নিরাপদ।

ইস্পাত কাচের ফলাটা জলে খানিকটা ডোবায় রজত, কিন্তু তলোয়ারের ডগা জলের তলা স্পর্শ করে না। কিছুটা অবাকই হয় সে, কুণ্ডটা কি তাহলে খুব গভীর?

ফলার প্রায় অর্ধেকটা জলে ডুবিয়ে দেয় রজত, কিন্তু তা-ও তলোয়ারের প্রান্তভাগ কুণ্ডের জলের নীচে ঠ্যাকে না।

রজত তলোয়ারটা আরও কিছুটা ডোবাতেই ইতস্তত একটা মৃদু কাঁপুনি অনুভব করে শরীরে। যেন জল থেকে তলোয়ারের ফলা বেয়ে তার হাতে উঠে আসছে জুঁই বোলতার গুঞ্জনের মতো একটা কম্পন। হাতের হাড় চিনচিন করে ওঠে তার, গ্রন্থিগুলো অবশ হয়ে আসতে চায়।

চমকে উঠে রজত তলোয়ার টেনে নিতে চেষ্টা করে, কিন্তু তলোয়ার নড়ে না। কে যেন বজ্রমুষ্টিতে তলোয়ারের ফলা ধরে রেখেছে। সেটাকে ডাইনে-বামে, ওপরে-নীচে একচুলও নড়ানো যায় না। জল থেকে উঠে-আসা কম্পন এবার হাত থেকে রজতের শরীরে ছড়িয়ে যেতে আরম্ভ করে, তার শরীরের একটা চিনচিনে অবশতা ধীরে ধীরে ছড়িয়ে যেতে থাকে।

আতঙ্কে তলোয়ারের হাতল থেকে হাত ছাড়িয়ে নিতে যায় রজত, কিন্তু তার হাতের আঙুলগুলো যেন অসাড় হয়ে গেছে, তার নির্দেশ মানে না, আগের মতোই তার মুঠো তলোয়ারের হাতল আঁকড়ে থাকে। জল থেকে এবার একটা কালো ধোঁয়ার সরু বিনুনি উঠতে আরম্ভ করে তলোয়ারের ফলা বেয়ে। কোথাও যেন দূর থেকে ভেসে আসে একই সুরে বিরামহীনভাবে বাজতে-থাকা ভেঁপুর তীক্ষ্ণ শব্দ, আর বেতালা বেয়াড়া ঢাকঢোলের আওয়াজ।

রজতের মনে হয়, গুহার ছাদ, মাটি, দেওয়াল সব যেন ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছে, মিশে যাচ্ছে কোন এক অন্তহীন অন্ধকারে। সেই নিঃসীম অন্ধকারের কেন্দ্রে এক অদ্ভুত সত্তার উপস্থিতি যেন মর্মে অনুভব করে সে। মুহুর্মুহু স্পন্দিত হয়ে-চলা সেই নিরাবয়ব, অজানা, সীমাহীন চেতনার মন নেই, অহং নেই, অনন্ত বুভুক্ষা ছাড়া কোনও বোধ নেই। সেই ক্ষুধা যেন সৃষ্টির শৃঙ্খলায় অন্ধ আক্রোশে দাঁত ঘষে চলেছে চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলার জন্ম দেবার উন্মাদ প্রচেষ্টায়।

সেই সত্তার একটা ক্ষুদ্র অংশ স্পর্শ করে রজতের মন। কোথাও যেন একটা সংযোগ তৈরি হয়। রজতের মনে হয়, শূন্য কলসি যেমন ধীরে ধীরে জলে ভরে ওঠে, তার অন্তঃকরণও যেন কোন এক উপস্থিতিতে পূর্ণ হয়ে উঠছে, এই অনন্ত অন্ধকারে সে-ও যেন লীন হয়ে যাচ্ছে, হারিয়ে যাচ্ছে তার চেতনা।

যখন বোধ ফিরে আসে, রজত খেয়াল করে, সে হাঁটু গেড়ে বসে আছে জলের কুণ্ডের কাছে। তার দুই হাঁটুর সামনে আড়াআড়িভাবে পড়ে তার তলোয়ার।

ডান হাতের মুঠোয় তলোয়ারের হাতল চেপে ধরে রজত। তার মনের মধ্যে সে অনুভব করে যে কোথাও বহু দূর থেকে ভেসে আসা এক সীমাহীন ক্ষুধার হাহাকার।

দাঁড়িয়ে উঠে তলোয়ার খাপে ঢোকায় রজত, বন্ধ হয়ে যায় হাহাকার।

সুড়ঙ্গ দিয়ে বেরিয়ে যখন রজত ফের কালভৈরব পাসে পা রাখে তখন রাত হয়ে গেছে, অম্বালিকার আকাশের মাঝখানে উঠে এসেছে ভামিনীর দুধসাদা থালার চেহারা। তার আলোয় রজতের পথ চলতে অসুবিধে হয় না।

পাহাড়ি পথ বেয়ে কিছুটা নেমে এসেছে রজত, পাশের জঙ্গল থেকে পথের ওপর লাফিয়ে পড়ে একটা উটিয়া বাঁদর। লম্বা গলাটা রজতের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে তীক্ষ্ণ চিৎকার করে ওঠে প্রায় চ্যালেঞ্জের ভঙ্গিতে।

মনে বিন্দুমাত্র আলোড়ন হয় না রজতের। প্রায় শিথিল ভঙ্গিতে খাপ থেকে তলোয়ার খুলে বাড়িয়ে ধরে সে। আগের মতোই তলোয়ারের স্পর্শে অনুভব করে সেই বুভুক্ষার হাহাকার।

নাক তুলে হাওয়ায় কিছুর গন্ধ শোঁকার চেষ্টা করে উটিয়া বাঁদর। তার চিৎকার মাঝপথেই বন্ধ হয়ে যায়, তার বদলে সেটার গলা দিয়ে যে আওয়াজটা বেরিয়ে আসে, তাকে অনায়াসে আর্তনাদ বলা চলে। রজতকে ফেলে হুড়মুড় করে ঝোপঝাড় মাড়িয়ে জঙ্গলের অন্ধকারে দৌড়ে অদৃশ্য হয়ে যায় সেটা।

তলোয়ার খাপে ঢুকিয়ে হোমিগঞ্জের দিকে হাঁটতে হাঁটতে নিজের মনের ভেতরটা একবার হাতড়ায় রজত। কিন্তু সেখানে সে দ্বিধা, শঙ্কা বা ভয়ের কোনও চিহ্ন খুঁজে পায় না। সেগুলো যেন সে ভিন্নর বাঙ্কারের গুহাতেই ফেলে এসেছে।

৪

সকালের নরম রোদে আলোছায়া-মাখা পাথরের উঠোনে আজকেও দিনের তালিম শুরু করেন ওস্তাদ উদয়ভান, চিরাগ আখড়ার ওস্তাদ। কাঠের তলোয়ার হাতে সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে শোনে নবিশরা।

আজও নবিশদের লাইনে দাঁড়িয়ে থাকে রজত। তফাতের মধ্যে অন্যদিনের মতো তার মনে বিরক্তির জায়গায় একটা নিস্পৃহতার ভাব। এমনকী সুরেলা আওয়াজ তুলে আকাশে উড়তে-থাকা রামধনু ফিঙের ঝাঁকও আজ তাকে আকর্ষণ করে না।

আজও তলোয়ারবাজির তরিকাগুলো রপ্ত করান উদয়ভান। আখড়ার চারপাশে ছড়িয়ে যায় তাঁর উঁচু গলার আওয়াজ।

“পুচ্ছ্! এই তরিকায় দুশমন তলোয়ার দেখতে পাবে না, কতটা লম্বা তা-ও বুঝতে পারবে না, ধাঁধায় থাকবে। তলোয়ার ফেরানো শরীরের পেছনদিকে, তলোয়ারের হাতল-ধরা দু-হাতের মুঠি ডানদিকের কোমরের কাছাকাছি, তলোয়ারের ডগা মাটি থেকে সামান্য ওপরে, যেন জানোয়ারের ল্যাজ।”

তরিকা দেখানো শেষ করে সোজা হয়ে দাঁড়ান উদয়ভান, “আজ তিন তরফা মোকাবিলা। বিজন, রজত, সুজয়!”

বিজন আর রজতের সঙ্গে তাদেরই বয়সি একটা ছেলে নবিশদের লাইন ছেড়ে সামনে এসে দাঁড়ায়।

“বিজন, সুজয় এদিকে। রজত এপাশে।”

একটা বাঁকা হাসি খেলে যায় বিজনের ঠোঁটে। প্রতিদিনের মতো আজও উদয়ভানের উদ্দেশ্য রজতকে অপদস্থ করা। না হলে তার মতো আনাড়িকে কেউ দুজনের বিরুদ্ধে লড়াই করতে পাঠায় না।

উদয়ভানের উদ্দেশ্যটা বোঝে রজতও। কিন্তু অন্যদিনের মতো আজ আর তার রাগ, ক্ষোভ, অভিমান কিছুই বোধ হয় না। তার সমস্ত মন আজ কেমন একটা নিস্পৃহতাতে আচ্ছন্ন হয়ে আছে।

“রজত, বিজন, সুজয়। ফটক। তিনজনে একই তরিকা!” উদয়ভানের হুকুম ছড়িয়ে যায় আখড়ার উঠোনে।

তিনজনেই পজিশন নেয়। ডান পা-বাঁ পায়ের এক কদম আগে, বাঁ পায়ের গোড়ালি তোলা, দু-হাতে ধরা কাঠের তলোয়ারের প্রান্ত প্রতিপক্ষের চোখের দিকে তাক করা।

শরীরটা আলগা করে দেয় রজত। গত রাতের ভিন্নর বাঙ্কারের মতোই আজও তার মনের ভেতর জায়গা করে নেয় কোনও এক নামহীন উপস্থিতি।

তরিকার পোজ ঢিলে হয়ে যায় রজতের। কাঠের তলোয়ারের প্রান্ত দুলতে দুলতে, নীচের দিকে ঝুঁকে পড়ে। যেন রজত তার হাতিয়ারের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছে।

মুখের হাসিটা আরও চওড়া হয় বিজনের। তার কাঠের তলোয়ারের ফলা ডানদিকে বেঁকে গিয়েই ছুটে আসে রজতের গর্দান লক্ষ্য করে।

নিজেকে বাঁচানোর কোনও চেষ্টাই করে না রজত। বিজনের তলোয়ার তার শরীর স্পর্শ করার আগেই তার নিজের নীচে ঝুঁকে-পড়া তলোয়ার বিদ্যুৎবেগে সোজা ওপরে উঠে আসে। বিজনের তলোয়ার ধরে-থাকা দুই হাতের ছড়ানো কনুইয়ের ফাঁক দিয়ে উঠে তলোয়ারের কাঠের প্রান্তটা বর্শার মতো আঘাত করে বিজনের থুতনির ঠিক নীচে।

যন্ত্রণায় দু-চোখ বিস্ফারিত হয়ে ওঠে বিজনের। এক হাত তলোয়ার থেকে তুলে গলা চেপে ধরে সে পিছিয়ে যায় এক-পা।

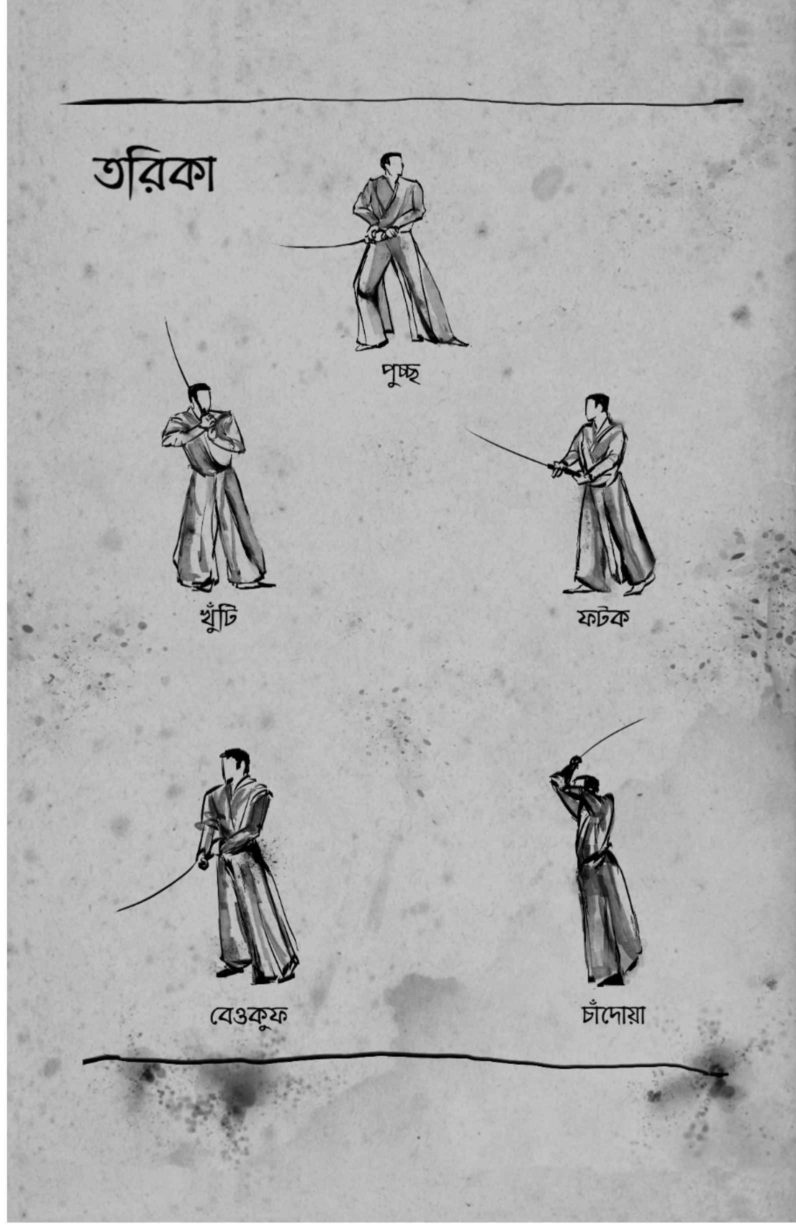
সুজয় তখনও কাঠের তলোয়ার উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে। তার মুখের হতভম্ব চেহারা পরিষ্কার জানা দিচ্ছে যে এই পরিস্থিতিতে কী করতে হবে তা তার বুদ্ধির বাইরে।

বিজনকে আঘাত করে রজতের তলোয়ার থামে না। সুজয়ের উঁচিয়ে-থাকা তলোয়ারকে সম্পূর্ণ এড়িয়ে গিয়ে কোনাকুনি নীচে নেমে আঘাত করে তার হাঁটুর ঠিক তলায়। কাঠের তলোয়ার আর সুজয়ের পায়ের সংঘর্ষে যে বীভৎস আওয়াজটা হয়, তাতে বুঝতে অসবিধে হয় না যে সুজয়ের পায়ের হাড় সম্ভবত অক্ষত নেই।

একটা মর্মভেদী আর্তনাদ করে হাতের তলোয়ার ছুড়ে ফেলে দেয় সুজয়, দু-হাতে পা চেপে ধরে মাটিতে পড়ে চিৎকার করতে থাকে যন্ত্রণায়।

বিজনের দিকে কয়েক পা এগিয়ে যায় রজত। নীচ থেকে আবার কোনাকুনি উঠে আসে তার তলোয়ার, আছড়ে পড়ে বিজনের বাঁদিকের পাঁজরে। হাড় ভাঙার আওয়াজটা এবারেও স্পষ্ট শোনা যায়।

বিজনকে নিশ্বাস, দম নেওয়ার সুযোগ দেয় না রজত। পেছন থেকে ভেসে আসা উদয়ভানের, “খতম! খতম! ম্যাচ খতম” চিৎকারের তোয়াক্কা না করে বিজনের আরও কাছে পৌঁছে দু-হাতে ধরা তলোয়ারের বাঁটের প্রান্ত সজোরে হাতুড়ির মতো নামিয়ে আনে তার নাকের ওপর। নাক দিয়ে রক্ত ছিটকে যায় বিজনের, দেহটা তার কাটা গাছের মতন আছড়ে পড়ে মাটিতে।



মাত্র কয়েকটা মিনিটের মধ্যেই তালিম নিতে-আসা দুটো ছেলে গুরুতর জখম হয়ে ছটফট করে মাটিতে, আর ভাবলেশহীন মুখে তাদের দিকে তাকিয়ে থাকে রজত। বিস্ফারিত চোখে তার দিকে তাকিয়ে থাকে অন্য নবিশেরা।

ক্রুদ্ধ শিঙেল চিতার মতো রজতের সামনে লাফিয়ে পড়েন উদয়ভান, “বেরিয়ে যা! আমার আখড়া থেকে এক্ষুনি বেরিয়ে যা!”

একটা তাচ্ছিল্যের ভাব ছড়িয়ে পড়ে রজতের চোখ-মুখে। কাঠের তলোয়ারের দু-প্রান্ত দু-হাতে ধরে সজোরে নামিয়ে আনে উরুর ওপরে।

কাঠ ভাঙার তীক্ষ্ণ শব্দটা ছড়িয়ে যায় আখড়ার প্রতিটি কোণে। চমকে উঠে গাছের আশ্রয় ছেড়ে আকাশের দিকে ছিটকে উড়ে যায় রামধনু ফিঙের ঝাঁক।

কাঠের তলোয়ারের ভাঙা টুকরো দুটো উদয়ভানের গায়ে ছুড়ে দিয়ে বিনা বাক্যব্যয়ে রজত বেরিয়ে যায় চিরাগ আখড়া ছেড়ে।

বিকেলবেলা বাইরের ঘর থেকে ওস্তাদ উদয়ভানের গলা পায় রজত। অরূপরতনের সঙ্গে তাঁর কথাবার্তার টুকরোটাকরা তার কানে আসে।

"...জখম গুরুতর... শয্যাশায়ী..."

উত্তরে অরূপরতন কী বলেন, শোনা যায় না।

"হয়তো আমারই দোষ, ভেবেছিলাম, কোণঠাসা করলে, রাগিয়ে দিলে লড়াইয়ের ইচ্ছেটা... তাহলেও এরপর আর আখড়ায় ওকে...।"

আবার ভেসে আসে উদয়ভানের কণ্ঠস্বর।

কিছুক্ষণ পরে রজতের ঘরে ঢোকেন অরূপরতন। রাগত স্বরে বলেন, "ওস্তাদ উদয়ভান আর আখড়ায় তোকে রাখতে চান না।"

"কী করা যাবে!" নিরাসক্ত কণ্ঠে উত্তর দেয় রজত।

"তুই ছেলেগুলোকে ওভাবে জখম করলি কেন?"

"তলোয়ারবাজি লোক খুনজখম করার জন্যেই শেখে, মৌজমস্তি করার জন্যে নয়।" নিরুত্তাপ কণ্ঠে বলে রজত, "জখম হওয়ার ভয় থাকলে ওদের তলোয়ারবাজি শিখতে আসাই উচিত হয়নি।"

উত্তর দিতে গিয়েও দিতে পারেন না অরূপরতন। রজতের দিকে তাকিয়ে তাঁর কথা মুখেই থেকে যায়। তাঁর কেমন মনে হয় যেন আদিম কোনও আক্রোশ আর ক্রূরতা পুঞ্জীভূত হয়ে রজতের দু-চোখের পেছন থেকে উঁকি দিচ্ছে, ছাড়া পেলেই তাঁকে মুহূর্তের মধ্যে ছিন্নভিন্ন করে দেবে।

তাঁর বুকের ভেতর কোথায় যেন একটা ধাক্কা লাগে। মাথা নিচু করে ঘর থেকে বেরিয়ে যান তিনি।

মাসখানেক কেটে যায়। রজত আর অরূপরতনের মধ্যে বহুদিন ধরেই যে ধীরে ধীরে একটা অদৃশ্য দেওয়াল গড়ে উঠেছিল, সেটা এ ক-দিনে আরও মজবুত, পাকাপোক্ত হয়ে ওঠে। একই ছাদের নীচে দুটো মানুষ পাশাপাশি থেকেও পরস্পরের থেকে আলাদা হয়ে যায়।

আখড়া যাওয়া বন্ধ হলেও তলোয়ারবাজি বন্ধ হয়নি রজতের। রোজ বাড়ির সামনের আঙিনায় ইস্পাত কাচের তলোয়ার হাতে টানা কসরত করে সে। তলোয়ারবাজির সমস্ত ধরনের প্রথা লঙ্ঘন করা নিয়ম-ভাঙা ছন্দে তার দেহের চারপাশে ঘোরে তার তলোয়ার। পথচলতি লোক অনেক সময়ে দাঁড়িয়ে তার সেই অদ্ভুত, অজানা তলোয়ারবাজি দেখে।

সেদিন বিকেলেও রজত তার কসরতে ব্যস্ত, মন্টু ছুটতে ছুটতে আসে।

মন্টু হোমিগঞ্জের বাইরের তাদের চালকল আর চালের গুদাম দেখাশোনা করে। গোলগাল চেহারা, কিছুটা স্থূলবুদ্ধি হলেও সর্বদা হাসিখুশি থাকে। বেশি খায় বলে সবাই তাকে খ্যাপায়, তবে সে নিয়ে তার বিশেষ মাথাব্যথা নেই।

“ছোটেসাব, বড়েসাব কোথায়?”

“বাগানে।”

সংক্ষিপ্ত উত্তরটা দিয়েই হয়তো রজত নিজের তলোয়ারবাজিতে মন দিত, কিন্তু মন্টুর মুখের দিকে নজর পড়তে তার কপাল কুঁচকে যায়।

মন্টুর একটা চোখ ফোলা, ঠোঁট ফেটে রক্ত পড়ছে। তার মুখের সেই চিরাচরিত হাসি আজ উধাও।

“কী হয়েছে তোর?”

“পিণ্ডারি!” হাঁপাতে হাঁপাতে উত্তর দেয় মন্টু।

“কোথায়?’’

“চালকলে। বলছে, আমাদের কাফিলা[২] নাকি চুঙ্গিকর দেয়নি, তাই বাকি আদায় করতে এসেছে।”

পিণ্ডারি। একটা শব্দেই রজত বুঝে যায়, কী হয়েছে। আজকাল নানা সরকারি বিভাগ ভাড়াটে সিপাহি নিয়োগ করে। ক্ষমতার অপব্যবহার করে এরা প্রায়ই খাজনা আদায়ের ছুতোয় নানা জোরজুলুম করে, বা লুঠতরাজ করে। এদের সাজা দিতে পারে এমন কোনও

বিচারব্যবস্থা অম্বালিকায় নেই, কেবল তলোয়ারের জোরেই এদের তলোয়ার আটকাতে হয়।

তলোয়ার খাপে ঢুকিয়ে কোমরবন্ধে গোঁজে রজত, "আস্তাবল থেকে গ্রিবিন নিয়ে আয়।"

অবাক হয়ে রজতের মুখের দিকে তাকায় মন্টু, "বড়ে সাবকে—?"

"পরে খবর দিবি। তাড়াতাড়ি যা!"

একটু বাদে লাগাম ধরে নীল রঙের লম্বা গলা পশুটাকে হাঁটিয়ে নিয়ে আসে মন্টু।

লাগামটা তার হাত থেকে নিয়ে রেকাবে পা রেখে গ্রিবিনের পিঠে লাফিয়ে ওঠে রজত, "এবার যা, বাবাকে খবর দে।"

হতভম্ব হয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে মন্টু, "তুমি কোথায় চললে?"

"চালকলে।"

গোড়ালির ধাক্কায় গ্রিবিন ছুটিয়ে দেয় রজত। পেছন থেকে তার দিকে অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে মন্টু।

চালকলটা হোমিগঞ্জের কিছুটা বাইরে, পাহাড়ের গায়ে। পাহাড় থেকে নেমে আসা ঝরনায় তার টারবাইনের বিশাল চাকাটা ধীরে ধীরে ঘোরে।

টারবাইনের চাকার সামনে দাঁড়িয়ে একটা নীলকান্ত মোষে টানা গাড়িতে চালের বস্তা বোঝাই করে দু-তিনজন। আরও চার-পাঁচজন তলোয়ার হাতে গাড়ির সামনে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পাহারায় দাঁড়িয়ে। প্রত্যেকটা লোকেরই রুক্ষ চেহারা, চাহনিতে মায়ামমতার লেশমাত্র নেই।

গ্রিবিনের পিঠ থেকে নেমে তার লাগামটা একটা গাছের ডালে বাঁধে রজত। তারপর খাপ থেকে তলোয়ার বের করে পাহারা-দেওয়া দলটার সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। মুখ তার ভাবলেশহীন, দু-হাতে ধরা তলোয়ার শিথিলভাবে শরীরের সামনে ঝুলছে।

তার তলোয়ার ধরার ভঙ্গি দেখে এর-ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বাঁকা হাসি হাসে পিণ্ডারিদের দলটা।

চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে রজত। তলোয়ার বয়ে যে ক্ষুধার হাহাকারের মতো বোধ তার হাতে উঠে আসে, তাতেই যেন তার শরীর আচ্ছন্ন হয়ে আছে।

এক হাতে তলোয়ার নাচাতে নাচাতে একজন এগিয়ে আসে। উশকোখুশকো চুল, পোকা-লাগা দাঁত, ময়লা জামাকাপড়।

“খোকাবাবুর তো ভালো করে গোঁফ গজায়নি দেখছি। তোমাকেই লড়তে পাঠিয়ে দিল?”

কোনও উত্তর দেয় না রজত, তার শারীরিক ভঙ্গিরও কোনও পরিবর্তন হয় না, মুখের চেহারাও তার আগের মতনই নিরুত্তাপ থাকে। কেবল তার তলোয়ারটা নীচ থেকে বিদ্যুৎবেগে উঠে আসে। তার কবজির সামান্য মোচড়ে ফলার ধারালো দিকটা ওপরদিকে বেঁকে গিয়ে পিণ্ডারির বাঁদিকের চিবুক থেকে গাল এবং কান চেঁচে বাদ করে দেয়।

ইচ্ছে হলে রজত তলোয়ারের ওই টানটা লোকটার গলাতেও দিতে পারত, কিন্তু এই মুহূর্তে তার কোনও তাড়া নেই।

গাল বাদ গিয়ে লোকটার মুখের ভেতরের দাঁতের পাটি প্রকট হয়ে পড়ে। রক্ত-মাখা বীভৎস মুখ নিয়ে সে আর্তনাদ করে কয়েক পা পিছিয়ে যায়।

“শালা বাঞ্চোত।” আর-একজন পিণ্ডারি তলোয়ার তুলে ছুটে এসে রজতের মাথা লক্ষ্য করে কোপ চালায়।

রজতের তলোয়ার এবার ওপর থেকে নীচে নেমে আসে। তার মাথায় কোপ পড়ার আগেই তার তলোয়ারের ফলা পিণ্ডারির পেটের ওপরদিকে হালকাভাবে আড়াআড়ি বয়ে যায়। তলোয়ারের টানে লোকটার পেট চিরে যায়, হাতের তলোয়ার ফেলে আর্তনাদ করে সে মাটিতে বসে পড়ে। তার চেরা পেটের ভেতর থেকে নাড়িভুঁড়িগুলো পরিত্যক্ত আবর্জনার মতো ছড়িয়ে পড়ে মাটিতে।

তারপর চলতে থাকে এক অদ্ভুত, অসম যুদ্ধ। রক্ত ছলকায়, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ছিটকে পড়ে, আর্তনাদ আর রক্তের তামাটে গন্ধ ছড়িয়ে যায় বাতাসে।

আর প্রতিটি আঘাতের পর, প্রতিটি আর্তনাদের পর তার তলোয়ারের ধরা হাতে রজত কোনও সুদূর এক বুভুক্ষার পরিতৃপ্তির আভাস পায়।

বেশ কিছুক্ষণ পরে যখন অরূপরতন লোকজন জুটিয়ে চালকলে এসে উপস্থিত হন ততক্ষণে লড়াই শেষ হয়ে গেছে। রক্ত-ভেজা মাটিতে পিণ্ডারির দল ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে আর্তনাদ করছে। তলোয়ারের আঘাত তাদের শরীর এমনভাবে খুবলে দিয়েছে যে তারা বাঁচবে না বটে, কিন্তু মারা যাবে অনেকক্ষণ বাদে, এবং অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করে।

আর এদের থেকে কিছু দূরে, একটা গাছের তলায় বসে সম্পূর্ণ নির্লিপ্তভাবে রক্ত মুছে তলোয়ার পরিষ্কার করে রজত।

পড়ে-থাকা মানুষগুলোর আঘাতের চেহারা দেখে অরূপরতনের সঙ্গে আসা কয়েকজন ওয়াক তুলতে থাকে, কয়েকজন থরথর করে কাঁপতে থাকে।

রজতের কাছে পাংশু মুখে এসে দাঁড়ান অরূপরতন, "এ তুই কী করেছিস? এরপর লোক তোর সম্বন্ধে কী বলবে জানিস?"

বাবার দিকে তাকায় রজত। মুখে তার একটা তিক্ত হাসি, বসে-যাওয়া চোখে উন্মত্ততার ছাপ।

"যা-ই বলুক, নালায়েক-নামর্দ তো বলবে না।"

মাসকয়েক আগে বুকে অনুভব করা ধাক্কাটা আজ যেন আরও দ্বিগুণ জোরে আঘাত করে অরূপরতনকে। একটা অন্ধকার আচ্ছন্ন করে তাঁর চেতনাকে, জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে পড়ে যান তিনি।

রাতের বেলা ডাক্তার এসে অরূপরতনকে পরীক্ষা করে গম্ভীর মুখে রজতকে জানিয়ে দিয়ে যায় যে স্ট্রোকে অরূপরতনের নিম্নাঙ্গ আড়ষ্ট হয়ে গেছে, সুস্থ না-হওয়া অবধি তিনি নিজের পায়ে চলতে পারবেন না।

ডাক্তার বিদায় নেওয়ার পর রজত নিজের ঘরে এসে পোশাক পালটাচ্ছে, তার তাক থেকে কী একটা মাটিতে গড়িয়ে পড়ে।

নীচের দিকে তাকিয়ে দ্যাখে রজত। তার শামুক বাঁশের বাঁশিটা।

গোড়ালি দিয়ে মাটিতে পড়ে-থাকা বাঁশিটাকে মড়মড় করে পিষে দেয় রজত।

৬

আরও বছর পাঁচেক কেটে গেছে। অরূপরতন সুস্থ হয়ে উঠেছেন বটে, কিন্তু তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙে গেছে। ভগ্নস্বাস্থ্য অরূপরতনকে এখন লাঠি ঠুকে ঠুকে চলাফেরা করতে হয়, তলোয়ারবাজি করার প্রশ্নই নেই।

অন্যদিকে দুর্ধর্ষ তলোয়ারবাজ বলে রজতের নাম হোমিগঞ্জের চারপাশে রাষ্ট্র হয়ে গেছে। তলোয়ারবাজির যে-কোনও কম্পিটিশনে তাকে দেখা যায়, এবং সে থাকলে সেই প্রতিযোগিতা জেতা অন্য কারও পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ে।

অবশ্য চিরাগ আখড়ার সেই ঘটনার পর প্রতিযোগিতার সময় রজত নিজেকে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে রাখে এবং নিয়মকানুন কঠোরভাবে মেনে চলে। এ বিষয়ে আজ পর্যন্ত তার কোনও অন্যথা হয়নি।

তবে লড়াইটা যখন কাঠের বদলে ইস্পাত কাচের তলোয়ার দিয়ে হয়, আর প্রতিযোগিতার বদলে জান দেওয়া-নেওয়ার হয়, সেখানে রজত সাক্ষাৎ মৃত্যুর মতোই নির্মম, নির্দয়। তার নাম শুনে তাকে চ্যালেঞ্জ করতে এসে অনেকেই প্রাণ খুইয়ে তার মূল্য চুকিয়েছে। যারা কোনও কারণে বদলা নিতে এসেছে, তারাও ফিরে যেতে পারেনি।

তবে তার নাম শুনে কেবল তলোয়ারবাজরাই আসে না, আসে তলোয়ার সওদাগরেরাও। আজ সকালে যেমন এসেছে মন্মথ।

জানুর ওপর দু-হাত রেখে ফরাশে হাঁটু গেড়ে বসে থাকে রজত। টিকোলো নাকের নিচে চোখ দুটো আগের চাইতে ঈষৎ বসে গেছে, চোয়াল আরো শক্ত হয়ে উঠেছে। রজতের সামনে দু-হাতে যত্ন করে ধরে এক-এক করে তলোয়ার বিছিয়ে ধরে মন্মথ।

“এইটার হাতলে পাথর-বসানো মিনাকারির কাজ, কোমরবন্ধে লাগালে হুজুরকে মানাবে ভালো। এইটা দেখুন হুজুর, একেবারে বনেদি তলোয়ার। দৌলতনগরের প্রথম গভর্নরের এডিকং[৩]-এর খাস হাতিয়ার। বংশের লোকজন যত্ন করে অনেকদিন রেখে দিয়েছিল। অবস্থা পড়ে গেছে বলে বাধ্য হয়ে বিক্রি করেছে। আর হুজুর, এইটা হকিন্সাবাদের সুখেন ওস্তাদের নিজের হাতে বানানো। ফলার ওপরে মহাকাল স্তোত্র খোদাই করা আছে।”

ডাইনে-বাঁয়ে হালকা মাথা নাড়ে রজত, “মন্মথ, তলোয়ার সাজগোজের জন্যেও নয়, আর বনেদিয়ানা দেখানোর জন্যেও নয়। তলোয়ারের কাজ হল মানুষের জান নেওয়া, মানুষকে জখম করা। আর তাতে মহাকাল স্তোত্রও কোনও কাজে আসে না। সহজে খুন ঝরানো যায় এমন কোনও হাতিয়ার থাকলে দেখাও।”

ইতস্তত করে ঝোলা থেকে একটা তলোয়ার বের করে মন্মথ। খাপ থেকে খুলে ফরাশের ওপর নামিয়ে রাখে সন্তর্পণে, “হুজুরের এটা ঠিক পছন্দ হবে কি না জানি না। পুরোনো জিনিস, অনেক হাত ঘুরে আমার কাছে এসেছে। দেখতে সাদামাটা, তবে শুনেছি, ইউলারগঞ্জে ব্যবহার হয়েছিল।”

কপাল কুঁচকোয় রজত, “ইউলারগঞ্জে? মানে ইউলারগঞ্জের গণহত্যায়?”

ঢোঁক গেলে মন্মথ, "জি হুজুর, তা-ই তো শুনেছি। যার কাছ থেকে কিনেছিলাম, সে বলেছিল, গণকবরে লাশের সঙ্গেই এটা পাওয়া গিয়েছিল। এটা দিয়েই হয়তো—!"

তলোয়ারটা হাতে তুলে দ্যাখে রজত। মন্মথ মিথ্যে বলেনি, তলোয়ারটা দেখতে অতি সাধারণ। বৈশিষ্ট্যের মধ্যে তার লম্বা সোজা হাতলের প্রান্তটা পেছনদিকে বাঁকানো, আর বাঁকানো অংশটা উটিয়া বাঁদরের মাথার আকারে খোদাই করা। ধার পরীক্ষা করার জন্যে ফলার ওপর আলতো করে দুটো আঙুল বোলায় রজত। এবং সঙ্গে সঙ্গে ঘোলাটে কাচের ফলা সূর্যোদয়ের মতো লাল হয়ে ওঠে। বিস্মিত রজত আঙুল দুটো তুলে ধরে দ্যাখে, দুটো আঙুলই আড়াআড়িভাবে চিরে গেছে।

"সাবধান হুজুর!" তাড়াতাড়ি একটা রুমাল বাড়িয়ে ধরে মন্মথ, "আমি দু-একজন ওস্তাদ কারিগরকে তলোয়ারটা দেখিয়েছিলাম, তারা সবাই একবাক্যে বলেছে এই তলোয়ারের কাচটা মানুষের তৈরি নয়। খাঁটি ভিন্নর কাচ।"

অম্বালিকায় লোহা অপ্রতুল। হাতিয়ার তাই এখানে তৈরি হয় ইস্পাতের বদলে ইস্পাত কাচে। আর ইস্পাত কাচ মানুষ তৈরি করা শেখে অম্বালিকায় পাওয়া ভিন্নরদের ফেলে-যাওয়া ইস্পাত কাচের নমুনা থেকে। কিন্তু ক্ষমতায় আর গুণে মানুষের বানানো ইস্পাত কাচ ভিন্নরদের তৈরি ইস্পাত কাচের ধারেকাছে আসে না।

রুমালে আঙুল মুছে তলোয়ার নামিয়ে রাখে রজত, "আমি এটাই নেব।"

একটা চওড়া হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে মন্মথের মুখ, "হুজুর সমঝদার। কাজের জিনিস চেনেন।"

দরজায় এসে দাঁড়ায় একজন গৃহভৃত্য, "ছোটেসাব, বড়েসাব আপনাকে ডাকছেন।"

উঠে দাঁড়ায় রজত, "যাচ্ছি। মন্মথকে অফিসঘরে নিয়ে যাও। বলো এই তলোয়ারটার দাম চুকিয়ে দিতে। আর পয়সা মেটানো হয়ে গেলে এটাকে এখানেই রেখে যেয়ো।"

ঘর থেকে বেরিয়ে একটা ঢাকা বারান্দা পেরোয় রজত। অরূপরতনের ঘরের লাক্ষার কাজ করা দরজার পাল্লা দুটো ঠেলে ভেতরে পা রাখে। দরজার দু-পাশে বিশাল জালার মতো ফুলদানিতে রাখা মোহনচাঁপার গাঢ় মিষ্টি গন্ধে ভারী হয়ে আছে ঘরের বাতাস। তার সঙ্গে মেশে জানলা দিয়ে ভেসে-আসা নীল আপেলের হালকা সুবাস।

"ডাকছিলে?"

একটা কাউচে আধশোয়া হয়ে-বসা অরূপরতন জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে ছিলেন, মাথা ঘোরান রজতের ডাকে।

"ওস্তাদ উদয়ভান এসেছিল।"

"কেন?"

"তুই চিরাগ আখড়ার কম্পিটিশনে নাম দিয়েছিস?"

রজতের কণ্ঠস্বরে বিরক্তি ঝরে পড়ে, "হ্যাঁ দিয়েছি। এ তল্লাটে যে-কোনও কম্পিটিশনেই আমি নাম দিয়ে থাকি। এতে নতুন কী আছে? তার জন্যে ওস্তাদজিকে আসতে হল কেন, বুঝলাম না।"

"তুই বিজনের বিপক্ষে নাম দিয়েছিস!"

চেষ্টা করেও কণ্ঠস্বরে ব্যঙ্গের ছোঁয়া চেপে রাখতে পারে না রজত, "সেটা দেওয়াটাই তো স্বাভাবিক। বিজন এখন চিরাগ আখড়ার এক নম্বর তলোয়ারবাজ, প্রায় ওস্তাদজির ডান হাত। বাকিরা তো নবিশ। নিজের তলোয়ারবাজির প্রমাণ দিতে গেলে তো বিজনের সঙ্গে লড়েই দিতে হবে। কেন, বিজন ভয় পেয়েছে নাকি?"

দু-পাশে মাথা নাড়ান অরূপরতন, "ভয় পায়নি, তবে—"

"তবে কী?"

জানলার বাইরের নীলচে-সবুজ আকাশের দিকে তাকিয়ে একটা লম্বা নিশ্বাস টানেন অরূপরতন।

"দেখ, চিরাগ আখড়ার কম্পিটিশন দেখতে হকিঙ্গাবাদ থেকে অনেক ফৌজি অফিসাররা আসে। বিজনের হকিঙ্গাবাদের ফৌজি স্কুলে ইন্সট্রাক্টরের চাকরিতে যোগ দেওয়া প্রায় পাকা। চাকরিটা পাওয়ার জন্যে বিজনের পরিবার প্রচুর পয়সা ঢেলেছে। এখন বিজন যদি তোর কাছে হকিঙ্গাবাদের অফিসারদের সামনে হেরে যায়, তাহলে এই চাকরিটা পাওয়া খুব মুশকিল হয়ে যাবে।"

"তো আমি কী করব?" বিরক্তি দ্বিগুণ হয় রজতের কণ্ঠস্বরে।

"উদয়ভান আমাকে বলতে এসেছিল তোকে একটা অনুরোধ করতে।"

কপাল কুঁচকে আসে রজতের, "কী অনুরোধ?"

"তুই যদি বিজনের কাছে হেরে যাস তো ভালো হয়।"

ঘরের মধ্যে একটা উটিয়া বাঁদর লাফ দিয়ে পড়লেও রজত হয়তো এতটা চমকে উঠত না, "মানে ইচ্ছে করে হেরে যাব? বিজনের কাছে? কী বলছ তুমি!"

রজতের চোখে চোখ রেখে কিছুটা অনুনয়ের স্বরেই অরূপরতন বলেন, "হ্যাঁ, ক্ষতি কী বল? তুই তো ওই আখড়া কবে ছেড়ে দিয়েছিস। হারলি কি জিতলি, তাতে কী যায় আসে? কিন্তু জিতলে বিজনের যদি চাকরিটা পেতে সুবিধা হয়—"

একটা রক্তলাল ক্রোধ যেন লাভার মতো ছড়িয়ে যায় রজতের মাথার মধ্যে। অরূপরতন তাঁর কথা শেষ করার আগেই যেন বিস্ফোরণে ফেটে পড়ে সে, "এই বিজনটা পুরো জালি। হিজড়েটার মারদাঙ্গা করার ক্ষমতা নেই, যাচ্ছে মাস্টারি করতে। সেটাতেও দু-নম্বরি। নিজে জেতার দম নেই, অন্যকে বলছে হেরে যেতে।"

দু-হাত শরীরের দু-পাশে মুঠো করে ধরে অরূপরতনের দিকে ঝুঁকে পড়ে রজত, "আর তুমিও বলিহারি। আমি কী চাই আর না চাই, সে কথা কোনওদিন জানতে চাইলে না। শুধু তোমার কী প্রয়োজন, সেটাই শুনে গেলাম।"

ফুঁসতে ফুঁসতে অরূপরতনের ঘর থেকে বেরিয়ে আসে রজত। নিজের ঘর থেকে উঠিয়ে নেয় মন্মথর রেখে-যাওয়া নতুন তলোয়ারটা। তারপর বাড়ির বাইরে এসে গ্রিবিন ছুটিয়ে দেয় কালভৈরব পাসের উদ্দেশে।

ব্যবহারের আগে নতুন তলোয়ারটাকে ভিন্নর বাঙ্কারের কুণ্ডের জলে চুবিয়ে নিতে হবে।

৭

রজত যখন অরূপরতনের কাছে বিজন সম্বন্ধে তার বিরূপ ধারণা ব্যক্ত করছে, সেই সময়ে হোমিগঞ্জের অন্য প্রান্তে আর একজনও বিজন সম্বন্ধে মনের মধ্যে একই রকমের বিরূপ ধারণা নিয়েও তাকে জেতানোর পথ খুঁজতে ব্যস্ত। সে অন্য আর কেউ নয়, বিজনের স্ত্রী রিমা।

রিমা বরাবরই উচ্চাকাঙ্ক্ষী। এশারগাঁওয়ের সামান্য রেশমচাষির মেয়ে থেকে হোমিগঞ্জের অন্যতম বনেদি পরিবারের বধূ হয়ে ওঠাটা উচ্চাকাঙ্ক্ষা না থাকলে হয় না। এর জন্যে তাকে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে।

কিন্তু উচ্চাকাঙ্ক্ষা বস্তুটা এমনই যে সেটা এক জায়গায় স্থিতু হতে চায় না। সিঁড়ির একটা ধাপে ওঠামাত্র পরের ধাপে কীভাবে উঠবে, সেই নিয়ে উতলা হয়ে পড়ে। হোমিগঞ্জ এশারগাঁওয়ের তুলনায় বড় জায়গা বটে, কিন্তু হকিন্সাবাদের কাছে মফস্‌সল। হোমিগঞ্জের সামাজিক সিঁড়িটা গোটাকতক বনেদি পরিবার অবধি উঠেই ফুরিয়ে গেছে। সে তুলনায় হকিন্সাবাদে সেই সিঁড়ি উঠে গেছে অনেক উঁচুতে, খোদ চ্যান্সেলরের দরবার অবধি।

রিমাই তাই অনেক বুঝিয়েসুঝিয়ে বিজনকে রাজি করিয়েছিল হকিন্সাবাদে একটা সরকারি চাকরি জোটাতে। রিমাই বহু কষ্টে তাকে বুঝিয়েছিল, চাকরি পেতে গেলে দু-হাতে পয়সা ঢালতে হয়। এখন তার পরিশ্রমের ফল যখন হাতে প্রায় এসে পড়েছে, তখন তলোয়ারবাজির কম্পিটিশনে মাঝখান থেকে রজত এসে পড়ে শেষ মুহূর্তে সব পণ্ডশ্রম করে দিতে চলেছে। যেদিন থেকে বিজন জানতে পেরেছে যে তাকে রজতের বিরুদ্ধে তাকে লড়তে হবে, হারার আতঙ্ক যেন তাকে গ্রাস করেছে। দুশ্চিন্তায় তার আহার-নিদ্রা বন্ধ হয়ে গেছে।

এইরকম মেরুদণ্ডহীন পুরুষমানুষের ভরসায় থাকলে রিমার উচ্চাকাঙ্ক্ষার স্বপ্নগুলোকে অঙ্কুরিত হওয়ার আগেই জলাঞ্জলি দিতে হয়। অতএব রিমা বিজনকে জেতানোর দায়িত্বটা নিজের কাঁধেই তুলে নিয়েছে। চোখের জল ফেলে, নানা গল্প ফেঁদে উদয়ভানকে সে-ই অরূপরতনের কাছে পাঠিয়েছিল। আর উদয়ভানের অনুরোধে কাজ হয়েছে কি না জানার জন্যে নজর রাখতে বলেছিল সুবলকে। সুবল বিজনদের বাড়ির পুরোনো কাজের লোক।

বই পড়ার অছিলায় রিমা সকালে থেকেই বাড়ির সামনের আঙিনায় সুবলের জন্যে অপেক্ষা করে আছে।

বেলা যখন কিছুটা বেড়ে উঠেছে, সুবল এসে হাজির হয়।

“কিছু খবর পেলি? হারতে রাজি হয়েছে?’’ অধীর আগ্রহে প্রশ্ন করে রিমা।

মাথা নাড়ে সুবল, “না। বোধহয় রাজি হয়নি। ওদের বাড়ির লোক বলল নাকি বাবার সঙ্গে কথা কাটাকাটি করে বাড়ি থেকে গ্রিবিনে চড়ে বেরিয়ে গেছে।’’

কিছুটা দমে যায় রিমা কিন্তু হাল ছাড়ে না, “বাড়ি থেকে বেরিয়ে কোথায় গেছে?”

“কালভৈরব পাসের দিকে গেছে, যা শুনলাম। প্রায়ই নাকি ওদিকে যায়।’’

“কালভৈরব পাস? কালভৈরব পাসে কী করতে যায়?’’

“তা জানি না। কালভৈরবের মন্দিরে যায় হয়তো।”

কয়েক মুহূর্ত চিন্তা করে রিমা। উদয়ভানের অনুরোধে যদি কাজ না হয়ে থাকে তাহলে তাকেই রজতকে বুঝিয়েসুঝিয়ে রাজি করাতে হবে। রজতের মন ভেজাতে যদি কান্নাকাটি, চোখের জল, মনগড়া দুঃখের গল্প— এইসবের প্রয়োজন হয় তাহলে সেইসব নাটকের জন্যে কালভৈরবের মন্দিরের মতো নির্জন জনবিরল জায়গাই আদর্শ।

সুবলের হাতে বইটা ধরিয়ে দিয়ে উঠে দাঁড়ায় রিমা, "দেখি, আমি যদি রাজি করাতে পারি। কেউ যদি জিজ্ঞেস করে, বলবি, আমি মন্দিরে পুজো দিতে গিয়েছি।"

"কালভৈরবের মন্দিরের কাছে উটিয়া বাঁদরের উপদ্রব আছে।" মৃদু প্রতিবাদ করে সুবল।

"এখন দিনের বেলা কিছু হবে না।" হাত নেড়ে প্রতিবাদ উড়িয়ে দিয়ে হাঁটা দেয় রিমা।

কালভৈরব পাসে ওঠার রাস্তার মুখের কাছটা এসে রিমা দ্যাখে, সুবল ভুল বলেনি, পাহাড়ে ওঠার পথের ধারে একটা গাছের সঙ্গে একটা গ্রিবিন বাঁধা।

গ্রিবিনটাকে ছাড়িয়ে কিছুটা এগিয়ে রিমা দেখতে পায়, বেশ কিছুটা দূরে একজন বৃদ্ধ ও একটি কিশোরী মেয়ে পাহাড়ি পথ দিয়ে ধীরে ধীরে ওপরে উঠছে। দূর থেকে তাদের দুজনের কথাবার্তার অস্পষ্ট শব্দ ভেসে আসে। তাদের সঙ্গে দূরত্ব বজায় রেখে রিমাও কালভৈরব পাস ধরে পাহাড়ে চড়তে থাকে।

প্রায় বেশ কিছুক্ষণ হাঁটার পর রিমা খেয়াল করে, সে প্রায় কালভৈরব পাসের ওপরদিকে উঠে এসেছে। বৃদ্ধ আর মেয়েটিও পথের বাঁকের আড়ালে হারিয়ে গেছে, তাদের আর দেখা যাচ্ছে না।

কিছুক্ষণ জিরিয়ে সে আবার হাঁটা শুরু করতে যাবে, রাস্তার ধারের পাহাড়ের ওপর থেকে তার গায়ে কয়েকটা পাথরকুচি ছিটকে এসে লাগে। চমকে উঠে রিমা ওপরদিকে তাকিয়ে দ্যাখে, পাহাড়ের গায়ে একটা ছোট গুহার মুখে কিছু নড়াচড়া করছে।

রিমার বুকের ভেতর হৃৎপিণ্ডটা লাফিয়ে ওঠে। এ অঞ্চলে উটিয়া বাঁদরের উৎপাতের কথা সুবিদিত। তাড়াতাড়ি রাস্তার ধারে একটা গাছের আড়ালে লুকিয়ে পড়ে গুহার মুখটা লক্ষ করতে থাকে সে।

কিন্তু কয়েক মুহূর্ত বাদেই রিমা আশ্চর্য হয়ে দেখতে পায়, গুহা থেকে বেরিয়ে আসছে কোনও উটিয়া বাঁদর নয়, যার সঙ্গে দেখা করবে বলে সে কালভৈরব পাসে উঠে এসেছে, সেই রজত স্বয়ং।

পাহাড় থেকে নেমে পথ ধরে রজত আরও ওপরে উঠে গেলেও রিমা চুপ করে লুকিয়ে থাকে। তার মনে হয়, রজতের সঙ্গে কথা বলার আগে একবার তার রহস্যটা জেনে নেওয়া দরকার। সে ওই গুহার মধ্যে কী করছিল, তার প্রমাণ জোগাড় করতে পারলে তার ওপর হয়তো চাপ দেওয়া সম্ভব।

রজতের চেহারাটা বাঁকের আড়ালে মিলিয়ে গেলে রিমা পাহাড়ে উঠে গুহার মধ্যে ঢোকে।

দুর্গম, সরু সুড়ঙ্গটা দিয়ে ভেতরে ঢুকে রিমাকে অবশ্য হতাশই হতে হয়। একটা প্যাঁচানো সিঁড়ির ধাপে রাখা লণ্ঠনের আলোয় দেখা বা বোঝা যায়, জায়গাটা একটা পরিত্যক্ত ভিন্নর বাঙ্কার ছাড়া কিছু নয়। এখানে রজত যে জন্যই এসে থাকুক, তার বিরুদ্ধে ব্যবহার করা যেতে পারে এমন কোনও কিছুরই অস্তিত্ব নেই।

তবু যাওয়ার আগে কেবল কৌতূহলের বশবর্তী হয়ে লণ্ঠন তুলে দেওয়ালের ছবিগুলো দেখতে থাকে রিমা।

কয়েকটা ছবি দেখার পরই রিমার শ্বাসপ্রশ্বাসের গতি বেড়ে যায়, তার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে, সে খেয়াল করে, তার মনের ভেতর মাথাচাড়া দিচ্ছে এমন কিছু উদগ্র বাসনা, যার অস্তিত্বের কথা তার কয়েক মুহূর্ত আগেও জানা ছিল না। কোন এক দুর্নিবার আকর্ষণ তাকে যেন বাধ্য করে ভিন্নর বাঙ্কারের প্রতিটি ছবি খুঁটিয়ে দেখতে।

সব ছবি যখন দেখা শেষ হয় তখন রিমার সমস্ত শরীর ঘামে ভিজে গেছে, পাঁজরের খাঁচাটা প্রায় হাপরের মতন ওঠানামা করছে।

অস্থির শরীর আর মনের মধ্যে ঘুরপাক খেতে-থাকা উৎকট বাসনা নিয়ে সিঁড়ির পাশের জলকুণ্ডের দিকে তাকায় রিমা। চোখে-মুখে জলের ঝাপটা দিলে হয়তো কিছুটা স্বাভাবিক হওয়া যাবে। কৌতূহল মেটাতে গিয়ে এখানে এসে তার খামোখা সময় নষ্ট হল। রজতের সঙ্গে কথা বলা তার এখনও বাকি।

কুণ্ডের ধারে বসে আঁজলা করা হাত দুটো জলে ডোবায় রিমা। সঙ্গে সঙ্গে জল থেকে একটা অদ্ভুত শিরশিরানি তার হাত বেয়ে শরীরে উঠে আসে। কোনও আদিম বুভুক্ষা যেন হাহাকার করে তার সমস্ত শরীরকে ডাক দেয়।

দু-হাত জলে ডুবিয়ে কুণ্ডের ধারে হাঁটু গেড়ে আচ্ছন্নের মতো বসে থাকে রিমা।

রিমা যখন উটিয়া বাঁদরের ভয়ে গাছের পেছনে লুকোচ্ছে, তার আগে আগে হাঁটতে-থাকা বৃদ্ধ আর কিশোরীটি তখন পৌঁছে গেছে কালভৈরবের মন্দিরের কাছে।

মন্দিরের সিঁড়িতে বসে কাঁধের ঝোলা থেকে কয়েকটা ফল বের করে মেয়েটির দিকে বাড়িয়ে দেয় বৃদ্ধ, "মিতা, এগুলো মন্দিরের ভেতর রেখে আয় তো মা। আর দেখ যদি কাজে লাগার মতো কিছু পাস।"

মন্দিরের ফল রেখে বেরিয়ে আসে মিতা, হাতে একটা পাতার ঠোঙা, "চিঁড়ে আছে, দাদু। খাবে?"

"চিঁড়ে?'' মিতার হাতের ঠোঙার দিকে তাকায় বৃদ্ধ, "চিঁড়ে তো ভেজাতে হবে। জল তো নেই। উঠতে উঠতে এত তেষ্টা পেল যে সব জল খেয়ে ফেলেছি।"

"ও তোমায় চিন্তা করতে হবে না, দাদু। পাহাড়ে ওঠার সময় আমি জলের শব্দ পেয়েছি। কাছেই কোথাও একটা ঝরনা আছে। তুমি এখানে বোসো, আমি চিঁড়ে ভিজিয়ে আনছি।''

বৃদ্ধকে প্রতিবাদ করার সুযোগ না দিয়ে তরতর করে নীচে জঙ্গলের মধ্যে নেমে যায় মিতা।

মিতার যাওয়ার পথের দিকে তাকিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফ্যালে বৃদ্ধ। তারপর মন্দিরের দিকে ফিরে বিড়বিড় করে প্রার্থনা করতে আরম্ভ করে, "হে বাবা কালভৈরব, আমার এই বাপ-মা-মরা নাতনিটার একটা ব্যবস্থা করে দাও বাবা, তাহলে আমি শান্তিতে চোখ বুজতে পারি। জয় বাবা কালভৈরব। হে বাবা কালভৈরব—''

চোখ বুজে প্রার্থনা করতে-থাকা বৃদ্ধ টেরও পায় না কখন রজত মন্দিরের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

বিশেষ কোনও কারণে রজত মন্দিরের কাছে আসেনি। ভিন্নর বাঙ্কারে এলে সে এখানটা একবার ঘুরে যায়। পাহাড়চুড়ো থেকে চারপাশের দৃশ্যটা কিছুক্ষণ দ্যাখে, তারপর চলে যায়। আজও সে একই কারণে এসেছিল। কিন্তু পাহাড়ের ওপর একলা বৃদ্ধকে পেয়ে তার মনে আদিম এক বুভুক্ষার বোধ হঠাৎই মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। যেন কোনও ভোজনবিলাসী অনাহারে কাতর হয়ে হাহাকার করছে।

একটা আঙুল দিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে-থাকা বৃদ্ধের কাঁধে খোঁচা দেয় সে, "এই বুড়ো! কী করছ এখানে?"

থতোমতো খেয়ে উঠে দাঁড়ায় বৃদ্ধ। সামনে একজন তলোয়ারবাজকে দেখে সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে কিছুটা।

"কিছু না, হুজুর। বুড়ো মানুষ হাঁটতে হাঁটতে হাঁপিয়ে পড়েছি, তাই একটু জিরিয়ে নিচ্ছি।"

"কোথা থেকে আসছ?"

"গোডেলগাঁও থেকে, হুজুর। দৌলতনগর যাব, মহাকালের মন্দির দর্শন করতে।"

"সঙ্গে কেউ নেই?"

ইতস্তত করে না বৃদ্ধ। অম্বালিকায় কোনও তলোয়ারবাজকে কোনও সহায়হীন অল্পবয়সি মেয়ের সংবাদ দেওয়াটা যে আদৌ নিরাপদ নয়, তার দীর্ঘ জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে সে কথা সে ভালোই জানে। তাই সত্যিটা গোপন করে বলে, "না, হুজুর। সবারই কাজকর্ম আছে। বুড়ো মানুষকে কে আর তীর্থযাত্রায় নিয়ে যাবে। একাই যাচ্ছি।"

"হুঁ।" নির্নিমেষ নয়নে বৃদ্ধের মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে রজত। হাত নেমে আসে তার তলোয়ারের হাতলে, "তাহলে তোমার থাকা-না-থাকাতে কিছু যায়-আসে না, বলো? চোখ বন্ধ করো।"

রজত কী করতে চলেছে, বুঝতে এক মুহূর্তও লাগে না বৃদ্ধের। তার দু-চোখ বিস্ফারিত হয়ে ওঠে। আত্মরক্ষার ভঙ্গিতে হাত দুটো সামনে তুলে পিছিয়ে যাবার চেষ্টা করে সে।

কিন্তু তার আগেই সাপের ছোবলের মতো খাপ থেকে লাফিয়ে ওঠে রজতের তলোয়ার, বৃদ্ধ সামান্য নড়াচড়াটুকু করার আগেই দু-ফাঁক করে দেয় তার গলার নলি।

পিচকিরির মতন রক্ত ছিটকে যায় বৃদ্ধের গলা থেকে, তার দেহটা আছড়ে পড়ে মাটিতে।

বৃদ্ধের জামায় তলোয়ারের রক্ত মুছে সেটাকে খাপে ঢোকায় রজত, তারপর কালভৈরব পাসের রাস্তা দিয়ে নীচে নামতে থাকে শিস দিতে দিতে।

অর্ধেকটা রাস্তা রজত নেমে এসেছে, হঠাৎ উলটোদিক থেকে ওপরে উঠতে-থাকা একজন তার মুখোমুখি এসে পড়ে। মাঝবয়সি লোকটার সাদামাটা চেহারা, পরনে অতি

সাধারণ পোশাক, পিঠে ফেরিওয়ালাদের মতন একটা বাক্স বাঁধা। রজতকে দেখে সে যেন ভূত দেখার মতো চমকে ওঠে, তাড়াতাড়ি পথ ছেড়ে দেয়।

লোকটার হাবভাব কেমন যেন সন্দেহজনক লাগে রজতের, হাত তুলে পথ আটকায় তার।

"দাঁড়াও। কোথায় যাচ্ছ?''

"রুসোগঞ্জ যাব, হুজুর। মাল ফিরি করতে।"

"বাড়ি কোথায়?"

"এই হোমিগঞ্জেই হুজুর।"

"হোমিগঞ্জে? তোমাকে তো কোনওদিন হোমিগঞ্জে দেখেছি বলে মনে হচ্ছে না?"

লোকটা উত্তর দেওয়ার জন্যে দাঁড়ায় না। পথ থেকে লাফ দিয়ে পাশের জঙ্গলে পড়েই ঝোপঝাড় ভেঙে ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড় লাগায়।

খাপ থেকে তলোয়ার বের করে চালায় বটে রজত, কিন্তু লোকটা ততক্ষণে নাগালের বাইরে চলে গেছে। নিজের ওপর কিছুটা বিরক্ত হয়েই রজত ফের নামতে শুরু করে কালভৈরব পাস ধরে।

৯

ঠিক সেই সময়ে মন্দিরের কাছে উঠে এসে বুকফাটা আর্তনাদ করে ওঠে মিতা। তার ঠাকুরদার দেহটা চিত হয়ে পড়ে মন্দিরের সামনের মাটি রক্তে লাল করে দিচ্ছে। খোলা চোখ দুটো যেন কোনও নীরব অনুযোগ নিয়ে তাকিয়ে আছে আকাশের দিকে।

অল্প বয়সেই মিতা তার মা-বাপকে হারিয়েছে। তার নিজের লোক বলতে ছিল একমাত্র এই ঠাকুরদা। তাকেও এই অচেনা বিজন জায়গায় হারিয়ে যেন মাথায় বাজ ভেঙে পড়ে তার। ঠাকুরদার পাশে বসে হাহাকার করে কাঁদতে থাকে সে।

পাণ্ডববর্জিত কালভৈরব পাসে মিতার কান্নার শব্দ কোনও মানুষের কানে যায় না। কিন্তু পাহাড়ে ধাক্কা খেয়ে সে শব্দের প্রতিধ্বনি পৌঁছে যায় মানুষের বৈরী একটি প্রাণীর কানে। লম্বাটে মাথায় বসানো দুটো কান সজাগ হয়ে সেই কান্নার উৎস খোঁজে, দুটো রক্তলাল চোখ পাহাড়চুড়োয় মৃতদেহের পাশে বসে কাঁদতে-থাকা মেয়েটার সন্ধান পায়, তারপর

পেছনদিকে বেঁকানো হাঁটুর নীচে বসানো দুটো চ্যাটালো পা ঝোপঝাড় ভেঙে দৌড়োতে শুরু করে কালভৈরব মন্দির লক্ষ্য করে।

ঠাকুরদার শরীরের পাশে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে-থাকা মিতা হঠাৎ তার পেছনে কিছুর উপস্থিতি টের পায়। মাথা ঘুরিয়ে আর-একবার আর্তনাদ করে ওঠে সে। জঙ্গলের মধ্যে থেকে কালভৈরব মন্দিরের পাহাড়চুড়োয় উঠে এসেছে একটা উটিয়া বাঁদর।

কিন্তু আর্তনাদ করলেও ঠাকুরদার শরীর ছেড়ে পিছু হটে না সে। চিৎকার করতে করতেই দু-চারটে পাথর কুড়িয়ে ছুড়তে থাকে উটিয়া বাঁদরকে লক্ষ্য করে।

গায়ে এসে-পড়া পাথরগুলোকে গ্রাহ্য করে না উটিয়া বাঁদর। লম্বা গলাটা সামনের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে আর হাত দুটো দু-পাশে ছড়িয়ে সেটা তীক্ষ্ণ চিৎকার করে ওঠে চ্যালেঞ্জের ভঙ্গিতে, আর তারপর এক-পা এক-পা করে এগোতে থাকে ঠাকুরদার শরীর আগলে দাঁড়িয়ে-থাকা মিতার দিকে।

চিৎকার করে পাথর ছুড়তে থাকে মিতা, আর তার দিকে ধীর কদমে এগিয়ে আসতে থাকে উটিয়া বাঁদর।

এই অসম লড়াইয়ের পরিণতি একটাই হওয়ার ছিল। কিন্তু মিতাও একটা টুঁটি-ছেঁড়া লাশে পরিণত হওয়ার আগেই ছুটতে ছুটতে মন্দিরের কাছে উঠে আসে সেই ফেরিওয়ালা, একটু আগেই যে রজতের হাত এড়িয়ে পালিয়েছে। সে-ও হয়তো মিতার চিৎকার শুনে থাকবে।

পাহাড়ের মাথায় উঠে পরিস্থিতি বুঝে উঠতে বেশিক্ষণ লাগে না ফেরিওয়ালার। বিন্দুমাত্র দেরি না করে সে পিঠে বাঁধা বাক্স থেকে একটা সলতে-পরানো মাটির বোতল বের করে, তারপর সলতেতে আগুন লাগিয়ে বোতলটা ছুড়ে দেয় উটিয়া বাঁদরের গায়ে।

উটিয়া বাঁদরের গায়ে লেগে বোতলটা টুকরো টুকরো হয়ে যায়, আর বোতলের মধ্যে ঠুসে-রাখা তেল, খড়ের কুচি আর কাঠের গুঁড়ো মাখামাখি হয়ে যায় তার শরীরে। এবং সঙ্গে সঙ্গে সলতের আগুনে দাউদাউ করে জ্বলে ওঠে দাহ্য পদার্থের সেই মিশ্রণ।

মুহূর্তের মধ্যে উটিয়া বাঁদরের সারা শরীরে আগুন লেগে যায়, তার চিৎকার পালটে যায় করুণ আর্তনাদে। কাতর স্বরে চিৎকার করতে করতে সেটা দৌড়ে পালায় জঙ্গলের মধ্যে।

নিচু হয়ে ঝুঁকে মাটিতে পড়ে-থাকা বৃদ্ধের চোখ দুটো বুজিয়ে দেয় ফেরিওয়ালা। তার গলার ক্ষতটা পরীক্ষা করে বলে, "ওস্তাদ তলোয়ারবাজের কাজ। কে মারল এভাবে?"

দু-দিকে মাথা নাড়ে মিতা, "আমি জানি না, নীচে ঝরনায় গিয়েছিলাম। এসে দেখি—"

কান্নায় গলা বুজে আসে মিতার, বাকিটা আর বলতে পারে না।

কাজটা কার, আন্দাজ করতে অসুবিধে হয় না ফেরিওয়ালার। খুব সম্ভব তার হাত এড়িয়েই সে পালিয়েছে একটু আগেই। কিন্তু সন্দেহ হলেও সে কথা এই মুহূর্তে শোকে কাতর মেয়েটাকে শোনানোর সময় নয়। তার বদলে সে বলে, "যেতে দাও। সে কথা পরে ভাবা যাবে। বরঞ্চ এখান থেকে চলো তাড়াতাড়ি। আবার কোথা থেকে কোন বিপদ এসে হাজির হয়, বলা যায় না।"

পড়ে-থাকা বৃদ্ধের দেহের দিকে সজল নয়নে তাকায় মিতা, "কিন্তু দাদু—!"

"তোমার দাদু এখন সব সাহায্যের বাইরে চলে গেছেন। নাও, তাড়াতাড়ি চলো। না হলে আমাদেরও একই অবস্থা হবে। কোথায় যাচ্ছিলে তোমরা?''

"হকিঙ্গাবাদ, আমার মাসির কাছে।'' চোখ মুছে বলে মিতা।

"হকিঙ্গাবাদ? সে তো অনেক দূরে! তুমি বাচ্চা মেয়ে, একা অত দূর কী করে যাবে? আমি এখন রুসোগঞ্জ যাচ্ছি, তবে দিন পনেরো বাদে কাজ হয়ে গেলে আমি ওখান থেকে হকিঙ্গাবাদ যাব। এক কাজ করো, আমার সঙ্গে চলো, আমি তোমায় সঙ্গে করে তোমায় মাসির কাছে পৌঁছে দেব।"

যেতে গিয়েও থমকে দাঁড়িয়ে যায় মিতা। সন্দিগ্ধ চোখে তাকিয়ে বলে, "কিন্তু তুমি কে?''

"আমার নাম রবি। শহরে শহরে জিনিস ফেরি করে বেড়াই। চলো তাড়াতাড়ি। আর যা প্রশ্ন আছে, যেতে যেতে জিজ্ঞেস কোরো। এ জায়গাটা নিরাপদ নয়।"

আর কথা না বাড়িয়ে ফেরিওয়ালার সঙ্গে পাহাড়চুড়ো থেকে নেমে যায় মিতা।

১০

ভিন্নর বাঙ্কারে হুঁশ ফিরে আসে রিমার। সে খেয়াল করে, জলে দু-হাত ডুবিয়ে কুণ্ডের পাশে বসে রয়েছে, শরীরে তার কেমন একটা ঘোর-লাগা ভাব।

টলতে টলতে উঠে দাঁড়ায় রিমা, কোনওমতে হাতড়ে হাতড়ে বাইরে বেরিয়ে আসে সুড়ঙ্গ দিয়ে। বাইরের হাওয়ায় শ্বাস নেয় জোরে জোরে।

কিছুক্ষণ বাদে শরীরটা স্বাভাবিক হয়ে আসে রিমার, ঘোর-লাগা ভাবটা কেটে যায়। আকাশের দিকে তাকিয়ে সে বুঝতে পারে, বেলা চলে গেছে, দিন এখন পড়ার দিকে। গুহার মধ্যে সে বেশ অনেকক্ষণই আটকে ছিল।

নিজের নির্বুদ্ধিতাকে দোষ দেয় রিমা। রজতের দেখাদেখি ওই গুহার মধ্যে তার না ঢুকলেও চলত। কোনও সন্দেহ নেই যে ভিন্নর বাঙ্কারের বদ্ধ হাওয়ায় সে অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। এবার হয়তো আর রজতকে পাওয়া যাবে না, তার নিজের বোকামিতে একটা সুযোগ হাতছাড়া হয়ে গেল।

নিজেকেই মনে মনে গাল দিতে দিতে কালভৈরব পাস বেয়ে ওপরে ওঠে রিমা। যদি কোনওভাবে রজতকে ধরতে পারা যায়, তাহলে তার এত দূর আসার উদ্দেশ্যটা পণ্ড হয় না।

কিন্তু কালভৈরবের মন্দিরের চুড়োয় উঠে আঁতকে ওঠে রিমা। মন্দিরের সামনে চিত হয়ে পড়ে আছে সেই বুড়োটার গলাকাটা লাশ, যাকে সকালে সে তার আগে আগে পাহাড়ে উঠতে দেখেছিল। মাটিতে জমাট বেঁধে রয়েছে কালচে রক্ত, তার ওপরে থিকথিক করে উড়ছে জুঁই বোলতার ঝাঁক। কিছু দূরে ছড়িয়ে পড়ে রয়েছে কোনও মাটির পাত্রের টুকরো আর পোড়া তেল।

মন্দিরের সামনে কী হয়েছিল তা দাঁড়িয়ে বোঝার চেষ্টাও করে না। পেছন ফিরে দৌড় লাগায় পাহাড়ি পথ ধরে। জায়গাটা আর মোটেই নিরাপদ নয়।

তা ছাড়া তাকে রজতকে যে করে হোক বোঝাতে হবে। সে যদি বাড়ি ফিরে গিয়ে থাকে তাহলে রিমা সেখানেই তার সঙ্গে দেখা করবে।

তরতর করে কালভৈরব পাসের রাস্তা ধরে হোমিগঞ্জের দিকে নামতে থাকে রিমা।

১১

কালভৈরব পাস থেকে নেমে দু-একটা কাজ সেরে যখন রজত বাড়ি ফেরে তখন দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়েছে। বাড়ির আঙিনায় ঢুকতেই সে বুঝতে পারে, তার বাড়িতে না-থাকার সময় কিছু একটা ঘটে গেছে। বাড়ির লোকজন ব্যস্ত হয়ে এদিক-সেদিক ছোটাছুটি করছে। সবাই কেমন উত্তেজিত।

গ্রিবিনের লাগামটা একজনের হাতে ধরিয়ে দিয়ে তাকে রজত প্রশ্ন করে, "কী হয়েছে? সবাই এমন দৌড়োদৌড়ি করছে কেন?"

মুখ কাঁচুমাচু হয়ে আসে কর্মচারীটির, "চুরি হয়ে গেছে, ছোটেসাব। আপনি যখন বাইরে ছিলেন, বাড়িতে চোর পড়েছিল।"

জ্বলন্ত চোখে তার দিকে তাকায় রজত, "দিনদুপুরে চোর পড়ল, আর তোরা এতগুলো লোক কী করছিলি?"

রজতের দৃষ্টির সামনে লোকটা কেমন কুঁকড়ে যায়, "একটা ফেরিওয়ালার মতো দেখতে লোক বাড়ির আশপাশে ঘোরাফেরা করছিল। আমরা ভেবেছিলাম, কিছু বিক্রি করতে এসেছে। এখন মনে হচ্ছে, সে-ই চুরি করেছে।"

ফেরিওয়ালা! কালভৈরব পাসে দেখা লোকটার কথা মনে পড়ে যায় রজতের। আর সঙ্গে সঙ্গে রাগটা নিজের ওপরেই গিয়ে পড়ে তার। তলোয়ার না চালিয়ে মুখ চালানোটাই তার ভুল হয়েছে। একটা লম্বা শ্বাস টেনে ভয়ে জড়সড়ো কর্মচারীকে প্রশ্ন করে, "কী চুরি হয়েছে?"

"রান্নাঘরের কিছু বাসনকোশন আর অফিসের রোজখরচের টাকা।"

"বেশি কিছু নয় তাহলে।"

"না, ছোটেসাব।"

"যা যাবার গেছে। হইচই বন্ধ করে সবাইকে নিজের কাজে যেতে বল।"

"জি, ছোটেসাব।" স্বস্তি পেয়ে লোকটা খবর দিতে ছোটে।

নিজের ঘরে এসে তলোয়ারটা পরম যত্নে ন্যাকড়া দিয়ে আস্তে আস্তে পরিষ্কার করে রজত। অনেকদিন বাদে তার মনোমতো একটা হাতিয়ার পেয়েছে সে। তলোয়ারে অলংকরণ নেই, অহেতুক সাজসজ্জা নেই। আছে কেবল মারণক্ষমতা।

হাতের পাঁচটা আঙুল তলোয়ারের হাতলে আলতো মুঠোয় জড়িয়ে দেয় রজত। হাতের তালুতে কেমন একটা উষ্ণ স্পর্শ লাগে তার, মুঠোয় টের পায় একটা ধীর মৃদু স্পন্দন। যেন তলোয়ারটা কোনও জড়বস্তু নয়, সাময়িক নিদ্রাচ্ছন্ন কোনও চেতন প্রাণী।

শ্বাসপ্রশ্বাসের লয় বাড়ে রজতের। তলোয়ারের স্পর্শ প্রেমিকার শরীরের স্পর্শের মতোই মনে হয় তার। তার হাতের আঙুল যেন জড়িয়ে রেখেছে তলোয়ারের হাতল নয়, প্রেমিকার স্তন।

"ছোটেসাব!"

রজতের আত্মরতিতে বাধা পড়ে। দরজায় একজন গৃহভৃত্য এসে দাঁড়িয়েছে।

তলোয়ারের আঘাতে লোকটার গলাটা দু-ফাঁক করে দেওয়ার অদম্য ইচ্ছেটাকে কোনওমতে বাগে আনে রজত। নিশ্বাস যত দূর সম্ভব স্বাভাবিক করে কর্কশ স্বরে প্রশ্ন করে, "কী হয়েছে?"

"আপনার সঙ্গে একজন ভদ্রমহিলা দেখা করতে এসেছেন, ছোটেসাব।"

আশ্চর্য হয় রজত, "ভদ্রমহিলা! কে ভদ্রমহিলা?"

"বলছেন, বিজনের বাড়ি থেকে এসেছেন।"

বিজনের বাড়ি! ব্যঙ্গের হাসিতে বেঁকে যায় রজতের মুখ। শালা হিজড়ে বিজন। উদয়ভানকে দিয়ে বলে পাঠিয়ে হয়নি, আবার বাড়ির মেয়েছেলেকে পাঠিয়েছে।

রজত প্রথমে ভাবে, দেখা না করেই যে এসেছে, তাকে বিদায় করে দেবে। কিন্তু তারপর ঠিক করে, সে নিজেই গিয়ে মুখের ওপর না করে দেবে। বিজন তো হারবেই। কিন্তু তাকে হারানোর আনন্দটা যদি একবারের বেশি পাওয়া যায়, মন্দ কী!

তলোয়ারটা সযত্নে নামিয়ে রাখে রজত, "বসতে বল। আসছি।"

১২

বহুকাল আগে যে ঘরটাতে উটিয়া বাঁদরের সঙ্গে অরূপরতনের মরণপণ লড়াই হয়েছিল, সেই ঘরে আর-এক নতুন নাটকের পর্দা ওঠে। অম্বালিকার তৃণপ্রান্তরে দুটো নকশি বাঘ যেমন দূর থেকে পরস্পরের ক্ষমতার পরিমাপ করে, ঘরের দুই প্রান্ত থেকে রজত আর রিমাও শিকারির দৃষ্টিতে পরস্পরকে জরিপ করে।

রজত দ্যাখে একজন সম্ভ্রান্ত ঘরের সুন্দরী তরুণী মহিলা। পরনে হালকা রঙের দামি রেশমের পোশাক, হাত দুটো একটা অসহায়তার ভঙ্গিতে হাঁটুর ওপর জড়ো করা। আবছা প্রসাধন করা মুখেও পড়েছে সেই অসহায়তার ছাপ। কিন্তু সেই আপাত অসহায় ভাবের পেছনে তার দুই চোখে ধূর্তামি আর উচ্চাকাঙ্ক্ষার ঝিলিক রজতের নজর এড়ায় না।

রিমা দ্যাখে একজন ছিপছিপে চেহারার তরুণ। পরনের পোশাক অতি সাধারণ। পরিষ্কার করে কামানো মুখের চেহারা নিরুত্তেজ, নিরুত্তাপ। অথচ সেই মুখের দিকে

তাকিয়ে রিমা টের পায়, তার দু-চোখের পেছনে উঁকি দিচ্ছে এক আদিম উন্মত্ততা। রজতের আপাত নিস্পৃহতা যেন এক সর্বনাশা প্রলয়ের পথ আটকে-রাখা এক দুর্বল বাঁধ, যা ধসে পড়তে পারে সামান্য প্ররোচনাতেই।

শিউরে উঠে ভাবটাকে সামলে নিয়ে, গলায় অসহায়তার ভাবটাকে যথাসম্ভব ফুটিয়ে তুলে চোখ নামিয়ে রিমা বলে, "আমার নাম রিমা, আমি বিজনের— বিজনের বোন। আপনাকে একটা অনুরোধ করতে এসেছি।"

একটা বাঁকা হাসি খেলা করে রজতের মুখে, "বিজনের বোন আছে তো জানতাম না, স্ত্রী আছে জানি। তা যা-ই হোক, কী করতে পারি বলুন।''

মাথা নিচু করে রিমা বলে, "দেখুন, আমাদের খেতখামার ভালো চলছে না। এই চাকরিটা আমাদের খুব দরকার। জমানো পুঁজি যা ছিল, সব এই চাকরির উমেদারিতে খরচ হয়ে গেছে। এখন বিজন যদি চাকরিটা না পায়—!''

আরও বেঁকে যায় রজতের মুখের হাসিটা, "মানে আমাকে বিজনের কাছে হেরে যেতে হবে, এই তো?!''

হাঁটুর ওপর রাখা আঙুলগুলো কচলায় রিমা, "হ্যাঁ। জানি এটা অন্যায় উপরোধ। কিন্তু কী করব! আমাদের মাথায় এত বড় বিপদ না থাকলে আপনার কাছে এভাবে আসতাম না।"

ব্যঙ্গের হাসিতে আরও কুৎসিত হয়ে ওঠে রজতের মুখের চেহারাটা, "দেখুন রিমা, তলোয়ারবাজকে ইচ্ছে করে হেরে যেতে বলা, আর কোনও মহিলার কাছে তার শরীর চাওয়া— দুটোই একরকম। আপনি যখন আমার কাছে এত বড় একটা স্বার্থত্যাগ চাইছেন, আমিও তাহলে তার প্রতিদানে একই মাপের কিছু চাইতে পারি?"

দু-চোখ বিস্ফারিত হয়ে ওঠে রিমার। তাকে যে রজত ফাঁদে ফেলতে চাইছে, বুঝতে তার অসুবিধে হয় না। কিন্তু তখন আর তার পেছোনোর উপায় নেই। অসহায়তার মুখোশটা যথাসম্ভব আটকে রেখে শুষ্ক কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে, "বলুন, আমায় কী করতে হবে?"

কদর্য হাসি হাসে রজত, "ওই যা বললাম! আমি ইচ্ছে করে হেরে যেতে রাজি আছি। যদি আপনি আমার সঙ্গে শুতে রাজি থাকেন।"

মুখোশটা শেষ পর্যন্ত আর ধরে রাখতে পারে না রিমা। রক্তবর্ণ মুখে দু-হাত মুঠো করে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকায় রজতের দিকে, "আপনাকে আমি ভদ্রলোক ভেবেছিলাম, তাই

বিপদে পড়ে আপনার কাছে ছুটে এসেছিলাম। কিন্তু আমার অসহায়তার সুযোগ নিয়ে আপনি—!''

হাত তুলে থাকে থামিয়ে দেয় রজত, "দেখুন, এত কথার প্রয়োজন নেই। আপনাকে আমার শর্তের কথা বলে দিলাম। রাজি থাকলে ঝরনার ধারে আমাদের চালকলে গিয়ে অপেক্ষা করুন। আর রাজি না থাকলে বাড়ি চলে যান।"

ফুঁসতে ফুঁসতে বেরিয়ে আসে রিমা। কী ভেবেছে তাকে রজত? বাজারি মেয়েছেলে? বেশ্যা? প্রয়োজন আছে বলেই রজত কি ভেবেছে, তার বিনিময়ে সে শরীর বিলিয়ে দেবে? রাগে একরকম অন্ধ হয়েই পথ হাঁটে সে।

কিন্তু কিছুক্ষণ বাদে তার রাগের গনগনে প্রাচীরের পেছন থেকে কয়েকটা বিপরীত চিন্তা মাথা তোলে। মনের এককোণে কে যেন ফিশফিশ করে বলে ওঠে, 'এত রাগার কী আছে? কয়েক ঘণ্টার তো ব্যাপার! আর জানতেই বা পারছে কে? বিজন চাকরিটা পেয়ে গেলে হোমিগঞ্জের পাটই তো উঠে যাবে। রজতের মুখও আর এ জীবনে দেখতে হবে না।'

চেষ্টা করেও চিন্তাগুলোকে দাবিয়ে রাখতে পারে না রিমা, উত্তরোত্তর আরও সরব হয়ে ওঠে তারা। যুক্তিগুলো ক্রমশ আরও ধারালো হয়ে উঠে রিমার মনের আপত্তিগুলো সব একে একে নস্যাৎ করে দিতে থাকে।

একসময়ে রিমা খেয়াল করে যে সে অন্যমনস্ক হয়ে পথ চলতে চলতে বাড়ির রাস্তা ছেড়ে রজতদের চালকলের কাছে এসে পড়েছে। তার রাগের আগুনের ছাইটুকু অবশিষ্ট আছে কেবল। আর স্বার্থসিদ্ধি আর চরিত্র রক্ষার মাঝের মানসিক দ্বন্দ্বের পাঁচিলটাও দুর্বল হয়ে এসেছে অনেকটাই।

১৩

চালকলটা হোমিগঞ্জের বাইরে, পাহাড়ের গায়ে। পাহাড় থেকে ঝরনার জল লাফিয়ে পড়ে একটা গভীর কূপের মতো ফাটলে। ফাটলের ওপর বসিয়ে দেওয়া টারবাইন ঘোরে জলের শক্তিতে। চালকল চলে টারবাইনের শক্তিতে।

কাঠের তক্তায় তৈরি বাড়ির দরজাটা বন্ধ। ঝরনার জল পড়ার শব্দ আর চালকল চলার যান্ত্রিক শব্দ ছাপিয়ে তার পেছন থেকে ভেসে আসে মোটা গলায় গাওয়া বেসুরো গানের

আওয়াজ।

দ্বিধাগ্রস্ত কাঁপা-কাঁপা হাতে চালকলের দরজায় টোকা দেয় রিমা। বন্ধ হয়ে যায় গান। সশব্দে কাঠের পাল্লা খুলে মুখ বাড়ায় মন্টু।

"রজত—'', কথাটা শুরু করে থেমে যায় রিমা।

মন্টুর অবশ্য বুঝতে অসুবিধে হয় না। একগাল হেসে সে বলে, "ছোটেসাব? তাঁরে তো বাড়িতে পাবেন। এখানে কোথায়?"

"না। উনি আমায় এখানে অপেক্ষা করতে বললেন।'' কুণ্ঠিতভাবে উত্তর দেয় রিমা।

"এখানে?'' বিস্মিত কণ্ঠে প্রশ্ন করে মন্টু, "আচ্ছা, আসুন।"

চালকলের ভেতরটা গরম, তুষের গুঁড়োর ওড়াউড়িতে হাওয়া ভারী হয়ে আছে। কাঠের তক্তার ফাঁক দিয়ে বিকেলের আলো বর্শার মতো তির্যক রেখায় মেঝেতে এসে পড়ে। ছাদে ঝোলানো লণ্ঠনের নীলচে আলোয় দেখা যায়, ঘরের একদিকে সার-দেওয়া কাঠের ঢেঁকির মাথাগুলো একসঙ্গে শব্দ করে উঠছে-নামছে। ঘরের অন্যদিকে চালের বস্তার স্তূপ আর একটা বাঁকাচোরা বেঞ্চ। বেঞ্চের একপাশে মাটিতে একটা খড়ের বিছানা।

"বসুন!'' বেঞ্চিটা দেখিয়ে দিয়ে নিজের কাজে মন দেয় মন্টু। চালকলের ঢেঁকির ওঠানামার শব্দ ফের ছাপিয়ে তার গলার বেসুরো গান। বেঞ্চিতে জড়সড়ো হয়ে বসে থাকে রিমা।

ঘন আঠা যেভাবে গড়ায়, সেইভাবে মন্থর গতিতে পেরিয়ে যায় কিছুটা সময়। চালকলের ভেতরে অন্ধকারটা আরও গাঢ় হয়, মাটিতে এসে-পড়া আলোর রেখাগুলোতে লালচে রং ধরে। তারপর একসময়ে চালকলের বন্ধ দরজায় ঠকঠক করে শব্দ হয়।

গান থামিয়ে দরজা খুলে দিয়ে হাসে মন্টু, "ওঃ, ছোটেসাব! আপনার জন্যে কেউ—"

কথাটা শেষ না করেই রিমার দিকে তাকায় মন্টু।

দরজা দিয়ে মাথা গলিয়ে একবার রিমাকে দেখে নেয় রজত। তারপর মন্টুর দিকে তাকায়, "এই! তুই এবার এখান থেকে যা।''

রজতের মুখের দিকে অবাক হয়ে তাকায় মন্টু। আবার তাড়া দেয় রজত, "বললাম না, যা! ঘণ্টাখানেকের আগে ফিরবি না। ফোট!''

বিস্মিত দৃষ্টিতে দুজনের দিকে তাকিয়ে রজতের পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে যায় মন্টু।

দরজা বন্ধ করে রিমার সামনে এসে দাঁড়ায় রজত। মুঠো-করা দুই হাত শরীরের দু-পাশে চেপে ধরে সোজা হয়ে দাঁড়ায় রিমা।

বাঁ হাতের আঙুলে রিমার চিবুকটা তুলে ধরে রজত, "আমি হেরে যেতে রাজি আছি। আমি যা চাই, তুমি দিতে রাজি তো?''

কথা বলে না রিমা, তার শরীরের দু-দিকের হাতের মুঠো দুটো আরও শক্ত হয় আসে।

রজতের অন্য হাতটা রিমার জামার মধ্যে দিয়ে প্রবেশ করে স্পর্শ করে তার স্তন, "কী, রাজি তো?"

রজতের চোখের দিকে তাকায় রিমা। তার চাহনির পেছন থেকে যেন উঁকি মারে এক সীমাহীন বুভুক্ষা। সে ক্ষুধার সামনে রিমার সমস্ত সংযমের বাঁধন মুহূর্তের মধ্যে খসে পড়ে। কে যেন তার মাথার মধ্যে বলে ওঠে, 'শহরের বাইরে এই আধা অন্ধকার ঘরে তুমি কার সঙ্গে কী করছ, কে জানতে যাচ্ছে? জানলেই বা কী যায় আসে?'

প্রতিবাদ করে না রিমা। সেই আগ্রাসী ক্ষুধার কাছে স্বেচ্ছায় সঁপে দেয় নিজেকে, দুই হাতে রজতের মুখ নামিয়ে আনে তার নিজের ঠোঁটের ওপর। তার মুখের ভেতর রজতের জিভের স্পর্শে আবার তার সর্বশরীরে ছড়িয়ে পড়ে ভিন্নর বাঙ্কারে অনুভব করা সেই অদ্ভুত শিরশিরানি। মন, বুদ্ধি, অহঙের অস্তিত্ববিহীন সেই নিখাদ ক্ষুধার হাহাকারে যেন বিলীন হয়ে যেতে চায় তার সমস্ত সত্তা। অজানা, অচেনা নানান শরীরী বাসনা যেন সর্বাঙ্গে অসংখ্য বীথি-উপবীথি বিস্তার করে ছড়িয়ে পড়ে। তাদের তন্তুজালের কঠিন বাঁধনে বন্দি হয়ে পড়ে রমণেচ্ছা ছাড়া রিমার প্রতিটি অন্য বোধ।

কয়েক মুহূর্তের জন্যে একে অপরের থেকে ছিটকে সরে যায় রজত আর রিমা। অধীর ব্যস্ততায় পোশাক খুলে ছুড়ে ফ্যালে চারপাশে। তারপরে দুটো শরীর আবার পরস্পরের সঙ্গে জড়িয়ে যায় সর্পিল ভঙ্গিমায়।

রিমার শরীর হাতড়ায় রজতের দুই হাত। স্তন থেকে নেমে আসে নিতম্বে। নিতম্ব থেকে সরে আসে ঊরুসন্ধিতে। ঊরুসন্ধি থেকে উঠে আসে নাভিতে।

রজতের শরীর বেড় দিয়ে তার পিঠে উঠে আসে রিমার দুই হাত। তার দাঁত বসে যায় রজতের কাঁধে। তার মনে হয়, তার ধমনিতে বইছে ফুটন্ত লাভার স্রোত।

রিমাকে জড়িয়ে রজত গড়িয়ে পড়ে মেঝেয় পাতা খড়ের বিছানায়। চিত হয়ে তাকে তুলে নেয় নিজের শরীরের ওপর।

রজতকে নিজের শরীরে প্রবিষ্ট করিয়ে দুই ঊরুতে তার কোমর চেপে ধরে সোজা হয়ে বসে রিমা। তার মাথা হেলে যায় পিঠের পেছনে, বিস্ফারিত দুই চোখের দৃষ্টি হারিয়ে যায় শূন্যে। চালকলের ঢেঁকির ওঠাপড়ার সঙ্গে তাল রেখে তার শরীরটা ওঠানামা করতে থাকে রজতের দেহের ওপর।

১৪

একবার রিমার শরীর ভোগ করার বিনিময়েই রজত হেরে যাওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। তার কাছে দ্বিতীয়বার না এলেও হত। কিন্তু যা ছিল বিজনের জয়ের মূল্যমাত্র, তাই যেন রিমার কাছে আসক্তি হয়ে দাঁড়ায়। তাই সে এরপর থেকে প্রতিদিনই আসতে থাকে।

প্রাণ সৃষ্টির প্রারম্ভে আদিম জৈবিক দ্রবণে ভেসে থাকত যে সমস্ত মৃদু চেতন, শুধুমাত্র জননেচ্ছায় তাড়িত জীবেরা, তাদের মতোই সেই প্রায়ান্ধকার জঠরের মতো ঘরের উষ্ণ গাঢ় বাতাসে ডুব দিয়ে রোজই রিমার আর রজতের শরীর এক কালহীন, সীমাহীন বুভুক্ষার পরিতৃপ্তি খুঁজতে থাকে। ভিন্নর বাঙ্কারে আঁকা অম্বালিকার আদি বাসিন্দাদের বিকৃত কামনার ছবি তাদের দুজনের শরীরকে আশ্রয় করে লোকচক্ষুর অন্তরালে যেন নতুন জীবন ফিরে পায়।

প্রতিযোগিতার আগের দিনও আসে রিমা। বরং বলা যেতে পারে যে সে না এসে থাকতে পারে না। বুভুক্ষার তুফান পার হয়ে সে আর রজত ঘর্মাক্ত, ক্লেদাক্ত শরীরে চিত হয়ে শুয়ে থাকে খড়ের বিছানায়।

রিমার যোনিপথে আলতো করে আঙুল রাখে রজত, “তাহলে আজই আমাদের শেষ সন্ধে?”

ছাদ থেকে ঝোলানো লণ্ঠনের নীল আলোর দিকে তাকায় রিমা, “হোমিগঞ্জে শেষ। কালকে কম্পিটিশন শেষ হয়ে গেলেই আমাদের রুসোগঞ্জ যাওয়ার কথা। কিন্তু তোমাকে রুসোগঞ্জ আসতে আটকাচ্ছে কে?”

ভ্রূ কপালে তোলে রজত, “বিজন বুঝতে পারবে না?”

“ফুঃ!” একটা ব্যঙ্গের আওয়াজ করে রিমা, “বিজনকে আমি যা বোঝাব তা-ই বুঝবে!”

রিমার শরীরের কিছুটা ভেতরে প্রবেশ করে রজতের আঙুল, "তাহলে আরও কিছুক্ষণ থেকে যাও। বিজনকে না হয় কিছু একটা বুঝিয়ে দিয়ো।''

চমকে শ্বাস নেয় রিমা, সরিয়ে দেয় রজতের হাত, "আজ নয়। কালকের কম্পিটিশন নিয়ে বিজন এমনিতেই চিন্তায় আছে, দেরি হলে খুঁজতে লোক পাঠাবে।"

বিছানা থেকে উঠে পোশাক পরে রজত, মুখে তার বাঁকা হাসি, "বিজনকে বলে দিয়ো অত চিন্তা না করতে। তার জেতার দাম অন্য কেউ চুকিয়ে দিয়েছে।"

পোশাক পরতে পরতে থমকে যায় রিমা। অনাবৃত ঊর্ধ্বাঙ্গ নিয়েই জ্বলন্ত চোখে তাকায় রজতের দিকে, "বিজনকে কী বলতে হবে, সে আমি বুঝে নেব। তুমি তোমায় কাল কী করতে হবে, সে কথা ভুলে যেয়ো না।"

"ভুলব না। নিশ্চিন্ত থাকতে পারো।" উত্তর দিতে গিয়ে মুখ বিকৃত হয়ে যায় রজতের।

আর কোনও কথা না বলে না রিমা। পোশাক পরা শেষ করে রজতের দিকে দ্বিতীয়বার না তাকিয়েই বেরিয়ে যায় ঘর থেকে।

রিমাকে কিছুটা এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ দেয় রজত, তারপর কিছুক্ষণ বাদে তলোয়ারটা কোমরে গুঁজে নিয়ে সে-ও পা রাখে ঘরের বাইরে।

বাইরে অন্ধকার নেমে এসেছে। চালকলের দরজার দু-পাশে বসানো দেওয়ালগিরি দুটো জ্বলে উঠেছে, তাদের নীল আলো বৃত্তের আকারে ছড়িয়ে পড়েছে পাথর বাঁধানো পথের ওপর। বাতাসে ঝরনা থেকে উড়ে-আসা জলকণার সঙ্গে মিশেছে পাহাড়ি কলকে ফুলের মাদক গন্ধ।

ফেরার আগে রজত দরজাটা বন্ধ করছে, টারবাইনের দিক থেকে একটা মৃদু নড়াচড়ার আওয়াজ আসে। চিন্তা করার জন্যে দাঁড়ায় না রজত। তলোয়ারের হাতলে হাত রেখে লম্বা কয়েকটা কদমে পেরিয়ে যায় দরজা আর টারবাইনের মধ্যের দূরত্ব।

টারবাইনের কাছে একটা লোক রজতকে দেখে কলকবজার আড়ালে লুকোনোর চেষ্টা করে। আবছা আলোতেও তাকে চিনতে অসুবিধে হয় না রজতের। লোকটা বিজনদের এস্টেটের কর্মচারী, এর আগে দু-তিনবার রজত তাকে দেখেছে।

লোকটার সঙ্গে কথা বলার চেষ্টাও করে না রজত। সে কী করছে, জানতেও চায় না। বিনা বাক্যে নিমেষের মধ্যে খাপ থেকে তলোয়ার বের করে তার গলায় চালিয়ে দেয়।

লোকটা আর্তনাদ করার সুযোগও পায় না। তার টলতে-থাকা শরীরটাকে রজত ঘাড় ধরে টেনে নিয়ে এসে ঝরনার ফাটলে ফেলে দেয়।

প্রশ্ন করা মানে সময় নষ্ট। দিনকয়েক আগেই কালভৈরব পাসে রজতের সে অভিজ্ঞতা হয়ে গেছে।

১৫

লম্বা আয়নায় নিজের চেহারাটা একবার ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখে গভীর আত্মপ্রসাদ অনুভব করে রিমা। লোকে তাকে সুন্দরী মনে করে। কিন্তু তার ওই সৌন্দর্য যে ক্ষুরধার বুদ্ধিকে আড়াল করে রেখেছে, তার খবর কেউ রাখে না। ওই বুদ্ধিই তাকে এশারগাঁও থেকে নিয়ে এসেছে হোমিগঞ্জ অবধি। এবার তার জোরেই সে পৌঁছে যাবে হকিন্সাবাদ, আর কিছু সময়ের অপেক্ষামাত্র। আর তারপর? তারপর অনন্ত ভবিষ্যৎ। যার রাস্তা হয়তো গিয়ে থেমেছে চ্যান্সেলরের দরবারে। অথবা প্রেসিডেন্টের প্রাসাদে। সংসারে যতদিন পুরুষমানুষ আছে, তার গন্তব্যে পৌঁছোতে কোনও অসুবিধে হবে না।

মুখে প্রসাধনের একটা হালকা ছোঁয়া লাগিয়ে উপচে-পড়া আত্মবিশ্বাস নিয়ে বিজনের ঘরের দিকে পা বাড়ায় রিমা। লড়াইয়ের আগে বিজনের মনের জোর বাড়িয়ে তুলতে হবে। হোমিগঞ্জে এটাই তার শেষ কাজ।

পিঠ সোজা করে, ঘাড়টা পেছনদিকে সামান্য বেঁকিয়ে বিজনের অফিসঘরে পা রাখে, মুখে ফুটিয়ে রাখে একটা হালকা তাচ্ছিল্যের ভাব। চিরকাল এই শরীরী ভঙ্গিতেই বিজনকে দাবিয়ে রেখে এসেছে রিমা।

অফিসঘরের টেবিলে মাথা গুঁজে কী একটা কাগজে দ্যাখে বিজন, টেবিলের পাশের জানলা দিয়ে আসা আলোয় তার মুখের চেহারা কেমন ফ্যাক্যাশে দেখায়। সামান্য বিরক্ত হয় রিমা, পুরুষমানুষের এত আত্মবিশ্বাস কম হলে চলে? সব ঝামেলা কি তাকেই একাই ঘাড়ে নিতে হবে?

দরজার কপাটে আলতো টোকা দেয় রিমা, "'চলো, দেরি হয়ে যাবে।"

রিমা কিছু বলার সঙ্গে সঙ্গেই অন্যসময় বিজন যেমন তার ইচ্ছেপূরণের জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়ে, আজ তার মধ্যে সেই তাগাদা দেখা যায় না। কাগজটা পড়া শেষ করে তবেই উঠে

দাঁড়ায় বিজন, তার ঈষৎ স্থূল মুখে চোখ দুটো যেন আজ একটু বেশিই ফোলা লাগে।

"থাক। তোমায় যেতে হবে না।" শীতল কণ্ঠে বলে বিজন।

"মানে?" যে লোকটাকে এতকাল সে নিজের অঙ্গুলিহেলনে চালিয়ে এসেছে, তার হঠাৎ এমন ব্যবহারে কিছুটা হকচকিয়ে যায় রিমা।

"আমার যে-কোনও মূল্যে জেতাটা কি এতই দরকারি ছিল? আজকে জিতলে লোকে কী বলবে জানো? এ লোকটা বউয়ের ভেড়ুয়া। জেতার জন্যে বউকে ব্যবহার করে। এর চাইতে হেরে যাওয়া অনেক সম্মানজনক হত।"

রিমার কেমন মনে হয়, যেসব অদৃশ্য সুতোয় সে এতকাল বিজনকে পুতুলের মতো নাচিয়ে এসেছে, সেগুলো একে একে পটপট করে ছিঁড়ে যাচ্ছে। তবুও মুখের অবজ্ঞার ভাবটা বজায় রেখে কঠিন স্বরে বলে, "তুমি কী বলছ, বুঝতে পারছি না!"

"তুমি রজতের কাছে যাওনি?"

একটু আশ্চর্য হয় রিমা, বিজনের কানে খবরটা তুলল কে? কিন্তু কণ্ঠস্বরে তার আভাস লাগতে না দিয়ে স্বাভাবিক স্বরেই বলে, "হ্যাঁ, গিয়েছিলাম একবার রজতের বাড়ি। তাকে বোঝাতে। কিন্তু সে রাজি হয়নি।"

চোখ দুটো জ্বলে ওঠে বিজনের— "রজতের বাড়ি নয়। রজতদের চালকলে।"

ক্রুদ্ধ কণ্ঠে প্রতিবাদ করে রিমা, "বাজে কথা! কে বলেছে এসব কথা? ডাকো তাকে!"

চোখের কোণ থেকে এক ফোঁটা জল মুছে টেবিলে রাখা একটা লণ্ঠনে হাত রাখে বিজন, "রেশমকুঠির গোমস্তা পরেশের ছেলে ফোটোস্কোপ নিয়ে হোমিগঞ্জের বাইরের ঝরনার ছবি তুলছিল। তার ফোটো ক্রিস্টালে এই ছবিটা ধরা পড়ে।"

দেওয়ালের গায়ে একটা নীলচে ছবি ফুটে ওঠে। দূর থেকে তোলা ছবি, কিছুটা ঝাপসা। চালকল থেকে বেরিয়ে আসছে রিমা, তার পেছনে চালকলের দরজায় দাঁড়িয়ে রজত।

শূন্যদৃষ্টিতে রিমার দিকে তাকায় বিজন, "কাল সুবলকে তোমার খোঁজে পাঠিয়েছিলাম। তাকেও আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।"

পাংশু মুখে দাঁড়িয়ে থাকে রিমা। তার পিঠ বেয়ে ঘামের স্রোত নামে, গলা শুকনো লাগে, জিবটাও মনে হয় আটকে গেছে। নিজের ভেতরে হাতড়ায় রিমা, কিন্তু বহুকাল ধরে সযত্নে লালিত আত্মবিশ্বাসের প্রাচীরটাকে আর খুঁজে পায় না। এই বিপদের মুহূর্তেই সেটা যেন কোথায় মিলিয়ে গেছে।

একটু আগে যে কাগজটা সে দেখছিল, টেবিল থেকে সেটা তুলে নিয়ে রিমার দিকে বাড়িয়ে ধরে বিজন, "আমার হার বা জিতে আর কিছু আসে-যায় না। চিরকাল আমি উপহাসের পাত্র হয়েই থাকব। লোকে আমার দিকে আঙুল তুলে বলবে, 'এই লোকটা নিজের স্ত্রী-র শরীরের বিনিময়ে জিততে চেয়েছিল।' আমার সামনে এখন একটিমাত্র রাস্তাই খোলা আছে।"

কাঁপা-কাঁপা হাতে বিজনের বাড়ানো কাগজটা নেয় রিমা, "এটা কী?"

আর-একবার চোখের জল মোছে বিজন, "তালাকনামা[৪]। আমি তোমাকে আমার থেকে মুক্তি দিলাম। এর এক কপি কাছারিতে জমা দেওয়া হয়ে গেছে। এখন তুমি সম্পূর্ণ স্বাধীন।"

রিমার মনে হয়, তার পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যাচ্ছে। তার মনের মধ্যে এতদিন ধরে সযত্নে উচ্চাকাঙ্ক্ষার রঙিন প্রাসাদগুলো একের পর ধসে পড়ছে। ভাঙা গলায় কোনওমতে সে বলার চেষ্টা করে, "তুমি আমাকে এভাবে—"

হাত তুলে রিমাকে থামিয়ে দেয় বিজন, তার মুখে একটা ম্লান হাসি, "বিচ্ছেদ দিতে পারি না? হ্যাঁ পারি। বিয়ের আগে তুমিই করারনামার[৫] জন্যে জোর করেছিলে, মনে নেই? চাইলেই যখন ইচ্ছে আমরা পরস্পরকে বিচ্ছেদ দিতে পারি।"

চোখে কেমন অন্ধকার দ্যাখে রিমা। বিজন ভুল বলেনি, প্রয়োজন পড়লে তার সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করার একটা রাস্তা খোলা রাখার জন্যে বিয়ের আগে রিমাই চাপ দিয়েছিল করারনামায় সই করার। কিন্তু তার আঙুলের ইশারায় সর্বদা পুতুলনাচ নাচতে-থাকা বিজন যে তার অস্ত্র তারই বিরুদ্ধে প্রয়োগ করবে, সে কথা এক মুহূর্ত আগে পর্যন্ত সে কল্পনাতেও আনতে পারেনি।

রিমাকে আর কিছু বলাই সুযোগ দেয় না বিজন, তার পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে যায় ঘর থেকে।

টাল সামলাতে না পেরে মাটিতে বসে পড়ে রিমা, মুঠোয় ধরা কাগজটার দিকে তাকিয়ে থাকে শূন্যদৃষ্টিতে। বহু আকাঙ্ক্ষিত বিজয়ের ঠিক আগেই তার সমস্ত জীবন যে তার চারপাশে এভাবে গুঁড়িয়ে ধূলিসাৎ হয়ে যাবে, সে কথা সে কখনও অতি বড় দুঃস্বপ্নেও ভাবেনি।

এখন কী করবে সে? ফিরে যাবে মা-বাপের কাছে এশারগাঁওয়ে? এই বৈভব ফেলে আবার ফেরত যাবে রেশমচাষির অনাড়ম্বর, কায়িক পরিশ্রমের জীবনে। না, মরে গেলেও রিমা তা পারবে না। অনেক পরিকল্পনা, অনেক কূটবুদ্ধি খাটিয়ে এত অবধি সে যা অর্জন করেছে, তাকে সে এত সহজে হাতছাড়া হতে দেবে না।

না। রিমা বিজনকে যা হোক করে রাজি করাবে এই তালাকনামা প্রত্যাহার করে নিতে। জেতার পর বিজনের রাগ নিশ্চয়ই ঠান্ডা হয়ে আসবে, তখন রিমা একবার অনুনয়-বিনয় করবে, দরকার হলে হাতে-পায়ে ধরে ক্ষমা চেয়ে নেবে। প্রয়োজন হলে সব দোষ রজতের ঘাড়ে চাপিয়ে দেবে।

বাড়ি থেকে বেরিয়ে হোমিগঞ্জের স্টেডিয়ামের দিকে হাঁটা দেয় রিমা।

১৬

রজতও সেই সময়ে স্টেডিয়ামের পথ ধরেছে। কালভৈরব পাস দিয়ে কিছুটা উঠেই ডানদিকে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে একটা সরু পায়ে-চলা পথ চলে গেছে। একটা-দুটো চড়াই-উতরাই পেরিয়ে সেই পথে এসে থেমেছে একটা পাহাড়ের নীচে। পথের শেষে একটা পাথরে বাঁধানো তোরণ, তার স্থাপত্য দেখে স্পষ্টই বোঝা যায় সেটা ভিন্নরদের হাতে গড়া। তোরণের একপাশে টেবিল পেতে বসে-থাকা চৌকিদারের কাছে তলোয়ার জমা দিয়ে তোরণ পার হয় রজত, ভেতরে হাতিয়ার নিয়ে যাওয়ার নিয়ম নেই।

তোরণের পর একটা আলো-আঁধারি লম্বা সুড়ঙ্গ ঢালু হয়ে উঠে গেছে ওপরের দিকে। তার দু-পাশের দেওয়ালে সারি দিয়ে বসানো ক্রিস্টালের বাতি নীলচে আলোর বৃত্ত ফেলে মেঝেতে।

সুড়ঙ্গ থেকে বেরিয়ে স্টেডিয়ামের ভেতরে পা রেখে মাথা তুলে চারপাশটা একবার দ্যাখে রজত। ভিন্নরদের ফেলে-দেওয়া এই অদ্ভুত স্থাপত্যকে মানুষ স্টেডিয়াম হিসেবে ব্যবহার করে বটে, কিন্তু এর আদত কাজ কী ছিল, তা কেউ জানে না।

স্টেডিয়ামটা অনেকটা ক্রেটারের মতন। যেন পাহাড়ের মাথাটা অনেকটা গর্ত করে তুলে বাদ দেওয়া হয়েছে। ক্রেটারের দেওয়াল বেয়ে উঠে গেছে অগুনতি সরু সরু র‍্যাম্প। ক্রেটারের তলদেশ থেকে শুরু হয়ে সেগুলো ক্রেটারটা বেড় দিয়ে ত্যারচাভাবে উঠে গেছে

ওপরের দিকে। নীচ থেকে তাকালে মনে হয় যেন হঠাৎ জমে-যাওয়া কোনও সাইক্লোন। নীচের দিকে র‍্যাম্পগুলোর সামনের দিকে কাঠের বেড়া দিয়ে দেওয়া হয়েছে, সেখানে দর্শকরা সার দিয়ে দাঁড়িয়ে প্রতিযোগিতা শুরুর অপেক্ষা করে।

স্টেডিয়ামের ঠিক মাঝখানে খাটো পাথরের থাম দিয়ে ঘেরা একটা চতুষ্কোণ বাঁধানো জায়গা, তাদের চারপাশে জড়ানো দড়ির বাঁধন। এইটা লড়াইয়ের রিং। রিং-এর একপাশে জড়ো করে রাখা কাঠের তলোয়ার।

স্টেডিয়ামের দেওয়াল ঘেঁষে মাটিতে বসে বিভিন্ন আখড়ার নবিশ, ওস্তাদ আর নামজাদা তলোয়ারবাজরা। একদিকের দেওয়ালে একটা স্কোরবোর্ড টাঙানো, তার নীচে বসে রেফারি আর জুরিরা।

চিরাগ আখড়ার তলোয়ারবাজদের মধ্যে বিজনকে দেখতে পায় রজত। সে তার থেকে দূরত্ব বজায় রেখে আর-এক জায়গায় ভিড়ের আড়ালে গিয়ে বসে।

স্কোরবোর্ডের নীচ টাঙানো ঘণ্টা বেজে ওঠে। শুরু হয়ে যায় প্রতিযোগিতা, দড়ির বেড়া টপকে রিং-এর মধ্যে এসে দাঁড়ায় রেফারি।

জুরিদের সারি থেকে প্রথম দুই প্রতিযোগীর নাম ঘোষণা করা হয়। এবার ভিড় থেকে উঠে এসে দুই তলোয়ারবাজ স্তূপ থেকে কাঠের তলোয়ার বেছে নিয়ে পা রাখে রিং-এর মধ্যে।

রিং-এর একটা খাটো থামের মাথায় চাপ দেয় রেফারি। একটা মৃদু গুঞ্জন তুলে ভিন্নর প্রযুক্তিতে গড়া বাঁধানো জায়গাটা মাটি থেকে তিন-চার হাত ওপরে উঠে ভাসতে থাকে হাওয়ায়।

রিমাও এই সময়ে স্টেডিয়ামে এসে পৌঁছোয়। কিন্তু সে স্টেডিয়ামের ভেতরে যাওয়ার ঝুঁকি নেয় না। বিজন যদি তাকে দেখে ফ্যালে তাহলে কী করে বসবে, বলা যায় না। স্টেডিয়ামে ঢোকার সুড়ঙ্গটা এড়িয়ে গিয়ে সে পাহাড়ের গা বেয়ে উঠে আসে ক্রেটারের কিনারায়। সেখানে একটা গাছের আড়াল থেকে মাথা বাড়িয়ে সে নীচের লড়াই দেখতে থাকে।

রিং-এর ভেতর লম্বা হাতে একটা ঝালর-বসানো হাতপাখা বাড়িয়ে ধরে রেফারি। পরস্পরকে মাথা ঝুঁকিয়ে সম্মান জানিয়ে তার দুইদিকে কাঠের তলোয়ার হাতে পজিশন

নেয় দুই প্রতিযোগী।

"লড়ো!" চিৎকার করে হুকুমটা দিয়েই হাতপাখা সরিয়ে নেয় রেফারি। লড়াই শুরু হয়ে যায় দুই প্রতিপক্ষের, চিৎকার করে একে অপরকে আক্রমণ করতে থাকে তারা। স্টেডিয়ামে ছড়িয়ে যায় কাঠের তলোয়ারের ঠোকাঠুকির আওয়াজ।

কিছুক্ষণ বাদে রেফারি লাফিয়ে উঠে তার পাখা-ধরা হাতটা বাড়িয়ে ধরে দুজনের মধ্যে, "মোহন, গেম!"

দুই প্রতিযোগী লড়াই থামিয়ে সরে যায় রিং-এর দুই কোণে, তাদের একজনের মুখে হতাশার ছাপ স্পষ্ট। স্টেডিয়ামের ভিড়ের মধ্যে হাততালি ছড়িয়ে যায়, জুরির সারির পেছনে কেউ একজন স্কোরবোর্ডে নম্বর লেখে।

থামের ওপর রেফারির হাতের চাপে রিং নেমে আসে স্টেডিয়ামের মাটিতে। দুই প্রতিপক্ষ ফের এক অপরকে মাথা ঝুঁকিয়ে কুর্নিশ করে বিদায় নেয় রিং থেকে।

"মোহন জিতে গেল?'' রজতের পাশ থেকে কেউ মন্তব্য করে, "আমি ভাবলাম, ড্র হবে!"

আড়চোখে তাকিয়ে দ্যাখে রজত। বক্তার পরনে দামি পোশাক, চুল পরিপাটি করে পেছনে টেনে আঁচড়ানো। টিকালো নাক, চওড়া কপাল। দেখলেই বোঝা যায় শহুরে মানুষ। হয়তো হকিঙ্গাবাদ বা দৌলতনগরের কোনও মিলিশিয়ার অফিসার।

"না, মোহনই জিতেছে। কোনও ভুল নেই।" প্রথম ব্যক্তির পেছনে বসা আর-একজন উত্তর দেয়, "শংকরের তলোয়ার মোহনের শরীরের দু-ইঞ্চি দূর দিয়ে বেরিয়ে গেছে, কিন্তু মোহনের তলোয়ার পৌঁছে গিয়েছিল শংকরের কাঁধের প্রায় আধ ইঞ্চি কাছাকাছি।"

দ্বিতীয় বক্তার পোশাক আটপৌরে হলেও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। চওড়া চিবুক, ভারী নাক। পিঠ সোজা করে ধরে রাখার ভঙ্গিতে ফৌজি ছাপ সুস্পষ্ট।

হেসে কপালে ভ্রূ তোলে প্রথম বক্তা, "আপনার চোখের তো সাংঘাতিক জোর দেখছি! যাক, তলোয়ারবাজি দেখতে এসে আপনার মতো একজনের দেখা পাওয়া গেল। আমার নাম অতীন, এককালে প্রজাতন্ত্রী পার্টিতে ছিলাম।"

ভ্রূ কপালে তুলে তার দিকে এক অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকায় দ্বিতীয় বক্তা।

আবার হেসে তাকে আশ্বস্ত করে অতীন, "তবে সেসব অনেককাল আগের কথা। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের চিন্তাধারাও পালটে যায়। এখন আমাদের মূলমন্ত্র হল

চ্যান্সেলরের হাত শক্ত করা। এ কাজে আপনাদের মতো তলোয়ারবাজদের পাশে পেলে আমরা খুশি হব। ওহো, আপনার পরিচয়টা যে জানা হল না!"

"আমি সোমনাথ। ইউলারগঞ্জ থেকে আসছি।"

আবার একজোড়া প্রতিযোগীর নাম ঘোষণা করা হয়, দুই বক্তাকে ভুলে রিং-এর লড়াইয়ের দিকে মন দেয় রজত।

বেলা বাড়ে, রেফারির চিৎকার ছড়িয়ে যায় স্টেডিয়ামে, একের পর এক প্রতিযোগিতা শেষ হয়, প্রতিযোগীদের কেউ বিজয়ীর হাসি হেসে তার দলের মধ্যে গিয়ে বসে, কেউ মুখ চুন করে নেমে আসে রিং থেকে।

অবশেষে পালা আসে বিজন আর রজতের।

"বিজন! চিরাগ আখড়া!'' জুরিদের সারি থেকে ভেসে আসে চিৎকার।

ভিড়ের মধ্যে থেকে উঠে রিং-এর দিকে ভারী পা ফেলে এগিয়ে আসে বিজন। তার চোয়াল শক্ত। দু-চোখ জ্বলে ক্রোধের আগুনে। কাঠের তলোয়ারের স্তূপ থেকে একটা বেছে নিয়ে রিং-এর ভেতরে এসে দাঁড়ায় সে।

"রজত! চিরাগ আখড়ার প্রাক্তনী!" আর-একবার ঘোষণা শোনা যায় জুরিদের সারি থেকে।

উঠে দাঁড়ায় রজত, তার মুখ ভাবলেশহীন, দৃষ্টি যেন হারিয়ে গেছে শূন্যে। পায়চারি করার মতো ধীর কদমে এগিয়ে যায় রিং-এর দিকে। স্তূপ থেকে কাঠের তলোয়ার তুলে নিয়ে সে-ও এসে দাঁড়ায় রিং-এর ভেতরে।

চোখে জিজ্ঞাসা নিয়ে তার সেই নিস্পৃহ শরীরভঙ্গির দিকে তাকায় অতীন আর সোমনাথ।

দড়ির বেড়া টপকে রিং-এর মধ্যে এসে দাঁড়ান রেফারি। তাঁর চিৎকার ছড়িয়ে যায় স্টেডিয়ামের চারপাশে।

"রজত! বিজন! এটা ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, লড়াই নয়। তাই আপনাদের জিজ্ঞাসা করছি। আপনাদের মধ্যে কোনও শত্রুতা নেই তো? পরস্পরের প্রতি কোনও আক্রোশ নেই তো?"

কয়েক মুহূর্ত ইতস্তত করে দু-পাশে মাথা নাড়ে বিজন। তার চোয়াল আগের মতোই শক্ত।

ঈষৎ মাথা নাড়ে রজতও। তার মুখ আগের মতোই ভাবলেশহীন।

থামের ওপর রেফারির হাতের ছোঁয়ায় মাটি থেকে ভেসে ওঠে রিং।

ভিড়ের দিকে ফিরে মাথা ঝুঁকিয়ে কুর্নিশ করেন রেফারি। তাঁকে অনুসরণ করে রজত আর বিজনও।

একে অপরের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে পরস্পরের দিকে মাথা ঝোঁকায় রজত আর বিজন।

এক অদ্ভুত নিস্তব্ধতা নেমে আসে স্টেডিয়ামে। নীরব হয়ে যায় ভিড়ের গুঞ্জন, থেমে যায় টুকরো কথাবার্তা। এমনকী কিছুক্ষণ আগেও যে চিল-বেড়ালটা থেকে থেকে গাছের পেছন থেকে চিৎকার করছিল, সেটাও চুপ করে যায়। সমস্ত স্টেডিয়াম যেন রুদ্ধশ্বাসে এই লড়াইয়ের প্রতীক্ষা করে।

আর স্টেডিয়ামের বাইরে, ক্রেটারের কানায় একই রকম শ্বাসরুদ্ধ অবস্থায় প্রতীক্ষা করে রিমাও।

কাঠের তলোয়ার তুলে ধরে দুজনে। বিজনের নাকের পাটা দুটো উঁচু, শক্ত চোয়াল, চোখ দিয়ে যেন আগুন ঝরে। রজতের চাহনি নিরুত্তাপ, ঠোঁটের কোণে হালকা ব্যঙ্গের হাসি।

দুজনের মধ্যে ঝালর-দেওয়া পাখা বাড়িয়ে ধরেন রেফারি, "প্রতিযোগিতা হোক সুস্থ, সাবলীল। পূর্ণ হোক আপনাদের প্রয়াস।"

নিথর, নীরব ভিড় চোখ তুলে তাকিয়ে থাকে রিং-এর দিকে।

এক ঝটকায় পাখা সরিয়ে নেন রেফারি, "লড়ো!"

ফটক পজিশন নেয় দুজনেই। ডান পা বাঁ পায়ের এক কদম আগে। পা একটু বেঁকানো, শরীরের ওজন রাখা পায়ের মাঝামাঝি জায়গায়। তলোয়ারের ডগা প্রতিপক্ষের বাঁদিকে চোখের দিকে তাক করা। মাথা সোজা, চিবুক ভেতরে টেনে আনা।

বেশ কিছুক্ষণ কেউ নড়ে না। যেন কোনও কারণে জমে পাথর হয়ে গেছে দুজনেই।

তারপর রজতের উঁচু-করা তলোয়ার ধীরে ধীরে নেমে আসতে থাকে নীচের দিকে।

বিজন তার দিকে তাকিয়ে থাকে, কিন্তু আক্রমণ করে না।

আস্তে আস্তে রজতের তলোয়ারের ডগা নেমে আসে মাটির কাছাকাছি। তারপর তার শরীরটা ঝুঁকতে শুরু করে সামনের দিকে।

ভিড়ের মধ্যে থেকে বিস্মিত দৃষ্টিতে তার এই অদ্ভুত তলোয়ারবাজির দিকে তাকিয়ে থাকে অতীন আর সোমনাথ।

স্টেডিয়ামের আর-একদিক থেকে বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে থাকেন ওস্তাদ উদয়ভান। কী হচ্ছে, কিছুটা বোধহয় আন্দাজ করতে পারেন তিনি।

মন্থর গতিতে রজত ডান পা টেনে পেছনে নিয়ে আসে বাঁ পায়ের কাছে, তার কাঠের তলোয়ার সরে যায় শরীরের ডানদিকে। তার উন্মুক্ত শরীর যেন প্রতিপক্ষকে আহ্বান জানায় তাকে আক্রমণ করার। কিন্তু তবু বিজন আক্রমণ করে না।

আস্তে আস্তে পা ঘষে ঘষে বাঁদিকে অল্প অল্প করে সরে রজত। তার দিকে চোখ রেখে বিজন ধীরে ধীরে সরে বাঁদিকে। তার তলোয়ার আগের মতোই ফটক তরিকায় উঁচিয়ে ধরা।

দুই পা আরও কাছাকাছি টেনে আনে রজত, তার দুই হাঁটু আরও বেঁকে যায়, কোমর থেকে শরীর ঝুঁকে যায় সামনের দিকে। ডান হাঁটুর ওপর আড়াআড়ি করে ধরা তলোয়ারটা কেমন ঝুলতে থাকে শিথিলভাবে। তাকে দেখলে যে কেউ মনে করবে যে সে প্রায় ঘুমিয়ে পড়েছে।

কিন্তু কেউ কাউকে তবু আক্রমণ করে না। ফের আগের মতোই পাথরের মতোই নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে দুজনে। কেবল বিজনের গলায় তার কণ্ঠমণির উৎকণ্ঠার ওঠানামা ছাড়া আর কোনও নড়াচড়া রেফারির চোখে পড়ে না।

ঘাড় সোজা করে চোখের কোণ দিয়ে পালা করে দুজনের দিকে তাকান রেফারি। ভাবলেশহীন মুখে, শিথিল শরীরে তাকিয়ে থাকে রজত। শব্দ তুলে শ্বাস নেয় বিজন। কিন্তু এ ছাড়া দুজনেই কেউ কোনওরকম নড়াচড়া করে না।

উৎকণ্ঠিত দৃষ্টিতে দুই প্রতিযোগীর দিকে তাকিয়ে থাকেন উদয়ভান, লড়াইয়ের গতিপ্রকৃতি তাঁর অভিজ্ঞ দৃষ্টিতে ভালো ঠ্যাকে না।

আর সেই চিত্রপটের মতো নিশ্চল, অদ্ভুত লড়াইয়ের দিকে তাকিয়ে বিস্মিত কণ্ঠে অতীন বলে, "এ তো সাধারণ কোনও ম্যাচ নয়! এ তো ডুয়েল!"

নিশ্চল, নিথর দুই প্রতিপক্ষের দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে রেফারি আড়চোখে তাকান উদয়ভানের দিকে। মাথাটা সামনের দিকে ঈষৎ ঝোঁকান উদয়ভান।

"ড্র!" দুই প্রতিপক্ষের মাঝখানে পাখাটা বাড়িয়ে ধরে উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করেন রেফারি।

আর সেই মুহূর্তেই হুংকার তুলে রজতকে লক্ষ্য করে লাফ দেয় বিজন।

রজত আর বিজনের সংঘর্ষে ঠিক কী ঘটে, দেখা যায় না। কেবল বিজনের শরীরটা রজতকে পার করে খাটো থামের রেলিং টপকে রিং-এর প্ল্যাটফর্ম থেকে নীচে ভিড়ের মধ্যে এসে পড়ে। দেখা যায়, তলোয়ার উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে রজত।

আর-একবার শোনা যায় রেফারির গলা, "কেউ জেতেনি। ম্যাচ ড্র!"

তলোয়ার নামায় রজত। রেফারির দিকে ফিরে হিমশীতল কণ্ঠে বলে, "আপনি একে ড্র বলেন?"

থামে হাত রেখে রিং নামিয়ে আনেন রেফারি। ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলেন, "হ্যাঁ, ঠিকই বলেছি। ড্র। দুজনের কেউ জেতেনি।"

"হুঁঃ!" তিক্ততা চুইয়ে পড়ে রজতের গলায়, "বুড়ো হয়ে গেছেন, তাই চোখে ভালো দেখতে পান না বোধহয়!"

"কী বললে?" রজতের এমন অপমানজনক মন্তব্যে চমকে ওঠেন রেফারি।

"আপনি ড্র বলার সঙ্গে সঙ্গেই বিজন আমার দিকে পুরো বেআইনি একটা খোঁচা মেরেছিল। আমি আটকে দিয়ে ওর মাথায় পালটা দিয়েছি!" স্টেডিয়ামের ভিড়ের দিকে একবার তাকিয়ে রেফারির চোখে চোখ রাখে রজত, "যান, ভালো করে দেখে আসুন!"

তলোয়ারটা ছুড়ে ফেলে দিয়ে নিঃশব্দ, নিশ্চুপ স্টেডিয়াম থেকে বেরিয়ে যায় রজত। বিস্মিত চোখে সবাই তাকিয়ে থাকে তার দিকে, কেবল একটা হালকা, ধূর্ত হাসি ফুটে ওঠে অতীনের মুখে।

স্টেডিয়ামের ওপর থেকে হতভম্ব হয়ে দ্যাখে রিমাও। কী হল, সে ঠিক বুঝতে পারে না। ম্যাচ ড্র হল, সে দেখেছে। কিন্তু বিজন অমন হুমড়ি খেয়ে পড়ল কেন? আর পড়ে যাওয়ার পর উঠছে না কেন?"

হঠাৎ নীচের ভিড় থেকে কান্না-জড়ানো কয়েকটা আর্তনাদ ভেসে আসে, "বিজন মরে গেছে!"

"কানের ওপর খুলি ফাটিয়ে দিয়েছে ওই হারামজাদা রজত!"

"ডাক্তার। ডাক্তার ডাক!"

"ডাক্তার? ডাক্তার আর কী করবে? দেখছিস না, মাথার ঘিলু বেরিয়ে এসেছে?"

রিমার মনে হয়, তার চারপাশের দুনিয়াটা কোন অতল অন্ধকারে তলিয়ে যাচ্ছে। বিজন মারা গেছে! সকালেই বিজন তাকে বিচ্ছেদ দিয়েছে, তার বিধবা স্ত্রী হিসেবেও আর তার

কোনও স্বীকৃতি নেই! এবার সে কোথায় গিয়ে ওঠে?! তিলতিল করে গড়ে-তোলা তার জীবন, তার সামাজিক পরিচয়, তার বৈভব, মাত্র কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে তার চারপাশে গুঁড়িয়ে ধুলো হয়ে গেছে।

নীচ থেকে আবার চিৎকার ভেসে আসে।

"এই হারামজাদা রজত ইচ্ছে করে খুন করেছে বিজনকে। মেরে ফেল শালাকে!"

"খুঁজে দেখ, কোথায় গেল খানকির ছেলেটা।"

কেউ একজন স্টেডিয়ামের বাইরে ছুটে গিয়ে খবর নিয়ে আসে।

"কালভৈরব পাস ধরে ওপরে গেছে!''

"বাঞ্চোতকে ওখানেই কেটে ফেলে দেব। চল চল, তলোয়ার ওঠা।"

স্টেডিয়াম থেকে হুড়মুড় করে বেরিয়ে আসে চিরাগ আখড়ার তলোয়ারবাজরা আর বিজনের বন্ধুরা। তলোয়ার নিয়ে দৌড় লাগায় কালভৈরব পাসের দিকে।

প্রথমে কেমন একটা পৈশাচিক আনন্দ অনুভব করে রিমা। মরুক রজত, তার এই অবস্থার জন্যে সে-ই দায়ী। কিন্তু পরক্ষণেই তার বহুদিনের শান-দেওয়া বুদ্ধিটা যুক্তি দিয়ে দাবিয়ে দেয় আবেগকে।

রজত। রজতই এখন তার একমাত্র আশ্রয়। রজত মরে গেলে বিজনের বন্ধুরা তাকে হোমিগঞ্জের চৌরাস্তার মোড়ে ফাঁসিতে টাঙিয়ে দিতে দু-মিনিটও দেরি করবে না। তাকে বাঁচাতে পারে একমাত্র রজত। তাকে সাবধান করে দিতে হবে। বিজনের বন্ধুরা রজতকে ধরে ফেলার আগেই তাকে তার কাছে পৌঁছোতে হবে।

রাস্তা ধরলে দেরি হবে। বনবাদাড় ভেঙে পাহাড়ের ওপর দিয়েই রজতের উদ্দেশে দৌড়োতে থাকে রিমা।

১৭

ঠান্ডা পড়েছে, এত বেলাতেও কালভৈরব পাসের গাছের ফাঁকে ফাঁকে কুয়াশা জমে আছে। কোথাও গাছের পাতা থেকে টুপটাপ করে ঝরে পড়ে জল। গাছের আড়াল থেকে মাঝেমধ্যে ভেসে আসে চিল-বেড়ালের তীক্ষ্ণ চিৎকার আর কলকে ফুলের তীব্র গন্ধ।

আস্তে আস্তে ওপরে ওঠে রজত। তার মাথার মধ্যে গনগনে করে জ্বলে রাগের আগুন। এই হোমিগঞ্জের লোক সবাই সমান। যতই সে চেষ্টা করুক-না কেন, তার প্রাপ্য সম্মানটুকু দিতে এদের সবার গায়ে লাগে। সে তার নিজের বাপ হোক, কি আখড়ার ওস্তাদ, কি কম্পিটিশনের রেফারি। সবাই চেষ্টা করে তাকে ছোট করতে, নীচে টেনে নামাতে।

হঠাৎ পাতার ওপর দিয়ে দৌড়োনোর শব্দ হয়। কুয়াশা ভেদ করে গাছের পেছন থেকে হুড়মুড় করে রজতের সামনে এসে পড়ে রিমা। চমকে উঠে তলোয়ারের হাতলে হাত রাখে রজত।

এক হাত তুলে রজতকে নিরস্ত করে, অন্য হাতে যেখান দিয়ে রজত উঠে এসেছে, সেইদিকের রাস্তাটা দেখায় রিমা। হাঁপাতে হাঁপাতে বলে, "রজত, ওরা তোমাকে মারতে আসছে।"

তলোয়ারের হাতল থেকে হাত সরিয়ে নেয় রজত, "কারা?"

"চিরাগ আখড়ার ছেলেরা। বিজনের বদলা নিতে।"

"বদলা! কেন?'' কপাল কুঁচকোয় রজত।

"তুমি— তুমি বিজনকে মেরে ফেলেছ!'' বিজনকে কোনওদিন সমাজে ওঠার সিঁড়ির বেশি কিছু ভাবেনি রিমা। কিন্তু তার মৃত্যুর কথাটা বলতে গিয়ে তার গলাটা কেমন ধরে আসে।

"বিজন! মারা গেছে? আচ্ছা!" পেছন ফিরে রজত হোমিগঞ্জের দিকে নামতে শুরু করে।

তার পেছনে ছুটে আসে রিমা, "কোথায় যাচ্ছ? বললাম না, তোমাকে ওরা মারতে আসছে? কম করে দশ-পনেরোজন আছে দলে।''

পাহাড়ি পথ ধরে নামতে নামতে রজত বলে, "থাকুক। আমি ইচ্ছে করে বিজনকে মারিনি। মনে দুশমনি নিয়ে আমি বিজনের মুখোমুখি হইনি।"

"ওরা সেসব কথা মানতে চাইবে না। সংখ্যায় ওরা অনেক ভারী, রজত।"

রিমার দিকে ফেরে রজত, "বুঝলাম। কিন্তু তুমি আমায় এসব বলতে এলে কেন বলো তো?"

"রজত, বিজন মারা গেছে। আমাদের দুজনের কথা জানতে পেরে আজ সকালে কম্পিটিশনের আগে আমাকে ডিভোর্স দিয়েছে।''

চুপ করে রিমার মুখের দিয়ে তাকিয়ে থাকে রজত। চোখ মুছে তার সামনে এসে দাঁড়ায় রিমা, তার জামাটা খামচে ধরে দু-হাতে, "তুমি ছাড়া আমার আর কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই, রজত। আমাকে তোমার সঙ্গে নিয়ে চলো। হোমিগঞ্জ নয়, অন্য কোথাও চলো পালিয়ে যাই! তাড়াতাড়ি! ওরা এসে পড়ার আগে!"

সামনে গাছের কুয়াশা-ঢাকা ছায়ায় পায়ের শব্দ ওঠে। রিমাকে সজোরে একপাশে ঠেলে দেয় রজত। পথের একধারে মাটির ওপর ছিটকে পড়ে রিমা।

রিমাকে ফেলে কয়েক কদম সামনের দিকে এগিয়ে যায় রজত। খাপের তলোয়ারে হাত রেখে গাছের আড়াল থেকে একের পর এক বেরিয়ে আসে চিরাগ আখড়ার তলোয়ারবাজরা। ভ্রূক্ষেপ না করে তাদের দিকে নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে এগিয়ে যায় রজত।

দুজন পথ আটকায় তার।

"এই বাঞ্চোত, যাচ্ছিস কোথায়?"

"ভেবেছিস, বিজনের মৃত্যুর বদলা না নিয়ে তোকে ছেড়ে দেব?"

হাঁটা বন্ধ করে না রজত, এগোতে থাকে পথ ধরে, "আমাকে মেরে বদলা নিতে চাস?"

চারপাশ থেকে তাকে ঘিরে ফ্যালে চিরাগ আখড়ার তলোয়ারবাজরা।

"কেন মৃত্যু তোর প্রাপ্য নয়?'' প্রশ্ন করে একজন।

"একদমই না।" হাঁটতে হাঁটতেই হিমশীতল কণ্ঠে উত্তর দেয় রজত।

"কী বললি?'' একের পর এক খাপ থেকে বেরিয়ে আসে তলোয়ার।

তবুও দাঁড়ায় না রজত। হাঁটতে হাঁটতে চলে আসে তলোয়ারবাজদের আরও কাছে, "বিজন ন্যায়সংগত লড়াইতে মারা গেছে। তার জন্যে তোদের কোনও ক্ষোভ বা আক্রোশ থাকা উচিত নয়।"

কথা শেষ হতে-না হতেই রজতের খাপ থেকে লাফিয়ে ওঠে এক হাতে ধরা তলোয়ার। যে একদম কাছে দাঁড়িয়ে ছিল, তলোয়ার আড়াআড়ি তার পেটের ওপর দিয়ে ছুটে গিয়ে উঠে যায় আকাশের দিকে। দু-হাতে পেট চেপে সে আর্তনাদ করে লুটিয়ে পড়ে মাটিতে, তার আঙুলের ফাঁক দিয়ে নেমে আসে রক্তের ধারা।

দু-হাতে মাথার ওপর তলোয়ার তুলে পেছন থেকে চিৎকার করে রজতের ঘাড়ের ওপর এসে পড়ে একজন। লাট্টুর মতো পাক খেয়ে ঘুরে যায় রজত। তার তলোয়ার-ধরা ডান

হাতের মুঠো কানের কাছে। তলোয়ারের ফলা শরীরের সঙ্গে সমান্তরাল, ডগা ফেরানো মাটির দিকে, ধার বাইরের দিকে।

ছুটে-আসা তলোয়ারবাজের সামনে থেকে শরীরটা সরিয়ে নেয় রজত। তার নিজের তলোয়ারের ধার শত্রুর শরীরের নীচ থেকে কোনাকুনি উঠে যায় ওপরে। রজতের পাশ দিয়ে হুড়মুড় করে ছুটে গিয়ে মাটিতে গড়িয়ে পড়ে তলোয়ারবাজ।

তলোয়ারের হাতল বেয়ে কেমন একটা অদ্ভুত অনুভূতি উঠে আসে রজতের শরীরে। যেন একটা তৃষ্ণার্ত পশু মহা আনন্দে তার পিপাসা মেটাচ্ছে।

নিস্তব্ধ অরণ্যে কেবল গাছের পাতা থেকে টুপটাপ জল পড়ার শব্দ হয়। মাটিতে লুটিয়ে-থাকা কুয়াশার চাদর আঙুল জড়িয়ে দেয় পায়ে। কয়েকটা রামধনু ফিঙে চিপচিপ আওয়াজ করে গাছের ডাল থেকে ডালে উড়ে যায়।

আর-একবার পাক খেয়ে ঘুরে যায় রজত। কয়েক পা এগিয়ে যায় সামনের দিকে। এবার তার তলোয়ার ডান হাতে কোনাকুনি করে ধরা শরীরের ডানদিকে। হাতলের প্রান্ত কোমরের কাছে, ডগা ওপরদিকে।

তার চারপাশে তলোয়ার উঁচিয়ে-থাকা চিরাগ আখড়ার তলোয়ারবাজরা পিছু হটে সরে যায় তার থেকে দূরে।

অরণ্যের কুয়াশা-ঢাকা গভীরতা থেকে ভেসে আসে ডিমকি হায়েনার বুক্কন। তাতে সাড়া দিয়ে চিৎকার করে ওঠে একটা চিল-বেড়াল।

রজতের ভেতরের বুভুক্ষাটা আরও যাতনা, আরও ক্লেশ, আরও মৃত্যু চেয়ে হাহাকার করে।

তলোয়ার নামিয়ে নেয় রজত। শিথিল ভঙ্গিতে তলোয়ার তার ডান হাত থেকে ঝোলে শরীরের একপাশে। তলোয়ার বাড়িয়ে তাকে লক্ষ্য করতে থাকে তলোয়ারবাজরা।

পায়ে কুয়াশা জড়িয়ে ধীর কদমে হাঁটে রজত, যেন বেড়াতে বেরিয়েছে, কোনও তাড়াহুড়ো নেই।

আলো-আঁধারির আলপনা-বোনা অরণ্যপথে মৃত্যুপথযাত্রীর কাতর আর্তনাদের সঙ্গে মিলে যায় দূর থেকে ভেসে-আসা ডিমকি হায়েনার চিৎকার।

এবার তিনদিক থেকে তিনজনে আক্রমণ করে তাকে একসঙ্গে। বাঁদিকে বিদ্যুৎবেগে ঘুরে যায় রজত, তার তলোয়ার-ধরা হাত উঠে আসে মাথার ওপর।

বাঁদিকের তলোয়ারবাজ তখন তাকে সর্বশক্তি দিয়ে আক্রমণ করতে আসছে। তার তলোয়ার-ধরা দুই মুঠো মাথার পেছনে, তলোয়ারের ফলা প্রায় পিঠের সঙ্গে সমান্তরাল।

কিন্তু সে তলোয়ার নামিয়ে আনার আগেই রজতের তলোয়ারের ডগা তার বাঁদিকের কাঁধ থেকে ডানদিকের কোমর অবধি একটিমাত্র মসৃণ টানে চিরে দেয়।

ঘোরা থামে না রজতের। তার হাঁটু ভাঁজ করা, শরীর কোমর থেকে সামনের দিকে সামান্য ঝুঁকে। তার বাঁ হাতও চলে আসে তলোয়ারের হাতলে, তলোয়ার উঠে আসে ওপরে। ডান হাতের কনুই মাথার কাছে, বাঁ হাতের কনুই পাঁজরের কাছে। তলোয়ার আকাশের দিকে তাক করে কোনাকুনি করে ধরা।

দ্বিতীয় আক্রমণকারীও তখন মাথার ওপর তলোয়ার তুলেছে। কিন্তু সে রজতকে আঘাত করা সুযোগ পায় না। রজতের তলোয়ার বাতাসে পাক খেয়ে ওপর থেকে নেমে আসে তার বাঁদিকের পাঁজরে। পাঁজর, পেট, মেরুদণ্ডের খানিকটা কেটে তার শরীরটাকে প্রায় দু-টুকরো করে দেয়। হাওয়ায় ছড়িয়ে যায় আর্তনাদ আর রক্তের ফোয়ারা।

প্রথম আক্রমণকারীর দেহটা তখনও মাটিতে পড়েনি।

দ্বিতীয় আক্রমণকারীর শরীরের সামনে থেকে সরে যায় রজত। তলোয়ারের হাতল থেকে তার বাঁ হাত উঠে আসে, তলোয়ারের ফলা সমান্তরাল হয়ে যায় মাটির সঙ্গে। তার ডান পা সামনের দিকে অনেকখানি বাড়ানো, বাঁ হাঁটু ভাঁজ করা, শরীরটা কিছুটা পেছনে হেলানো।

পেছন থেকে তৃতীয় আক্রমণকারী তখন মাথার ওপর তলোয়ার তুলে দৌড়ে আসছে।

বাঁ পায়ে ভর দিয়ে ডানদিকে ঘুরে সরে যায় রজত, তলোয়ার ধরে-রাখা ডান হাতটা উঠে আসে ওপরে। তৃতীয় আক্রমণকারী তার দৌড় থামাতে পারে না, রজতের শরীর পার করে চলে যায় সামনের দিকে।

তার পিঠে এবার ওপর থেকে নেমে আসে রজতের তলোয়ার, ডানদিকের কাঁধ থেকে আরম্ভ করে মেরুদণ্ড দু-ফাঁক করে দিয়ে থামে এসে বাঁদিকের কোমরে।

ঘোরা শেষ হয় রজতের। আর তার পরেই তিনটে দেহ কয়েক সেকেন্ডের ব্যবধানে আছড়ে পড়ে মাটিতে।

কোনও অজানা শ্বাপদের পিপাসা মেটার তৃপ্তির অনুভূতি উঠে আসে তলোয়ার থেকে রজতের হাতে।

জঙ্গলের ভেতর থেকে আবার ভেসে-আসা চিল বেড়ালের চিৎকার মেশে জখমি মানুষের বেদনাতুর আর্তনাদে। রক্তের তামাটে গন্ধে হারিয়ে যায় পাহাড়ি পথের মাটির সোঁদা গন্ধ।

আর-একবার সামনের দিকে মন্থরগতিতে হাঁটে রজত। আবার তার ডান হাত থেকে শিথিলভাবে ঝোলে তলোয়ার। আবার তার ভেতরে এক চির অতৃপ্ত ক্ষুধা হাহাকার করে রক্তের নজরানা দাবি করে।

পায়ে পায়ে কুয়াশার বিনুনি জড়িয়ে আবার তিনজন একসঙ্গে আক্রমণ করে তাকে। চিল-বেড়ালের তীক্ষ্ণ চিৎকার যেন তাদের উৎসাহ জোগায়।

প্রথমজন চিৎকার করে মাথার ওপর তলোয়ার তুলে তেড়ে আসে। রজতের তলোয়ার বিদ্যুতের গতিতে ডানদিকে উঠেই নীচে নেমে আসে, তার পেট ফেঁড়ে দিয়ে ফের উঠে যায় বাঁদিকে। বাঁদিকে আবার নেমে আসে তলোয়ার, তার ঊরু চিরে দিয়েই উঠে যায় ওপরে।

রজতের রক্ত-মাখা তলোয়ার এখন মাথার ওপর ডানদিকে। তলোয়ারের ডগা আকাশের দিকে, ফলা মাটির সঙ্গে কোনাকুনি করে উঁচিয়ে ধরা। বাঁ পা পেছনে, মাটির সঙ্গে প্রায় সমান্তরাল। ডান পা সামনে, হাঁটু ভাঁজ করা।

গাছের পাতা থেকে ঝরে-পড়া জলের বিন্দুর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তলোয়ার থেকে ঝরে পড়ে রক্তের ফোঁটা।

দ্বিতীয় আক্রমণকারী রজতের ডানদিক থেকে ছুটে এসে তাকে লক্ষ্য করে দু-হাতে তলোয়ার চালায়। শরীরটা পেছনদিকে হেলিয়ে অনায়াসে তার তলোয়ারের কোপ এড়িয়ে যায় রজত। তারপর সে যখন টাল সামলাতে না পেরে রজতের সামনে দিয়ে দৌড়ে যাচ্ছে, রজতের উঁচু করে ধরা তলোয়ার নেমে এসে আড়াআড়ি বয়ে যায় তার পিঠের মাঝখান দিয়ে।

রজতের তলোয়ার নীচ থেকে আবার উঠে যায় ওপরে। ডান হাতের মুঠো বাঁ কাঁধের কাছে, তলোয়ারের ডগা তাক করা আকাশের দিকে।

রজতের হাতের তালুতে তলোয়ার বেয়ে নেমে আসে রক্তের ধারা। যেন কোন এক অসীম হিংস্রতার অধীর পিপাসা মেটায়।

তৃতীয়জন তলোয়ার তুলে ছুটে আসে সামনে থেকে। রজতের ডান হাতের মুঠো চলে যায় বাঁ কাঁধের পেছনে, পিঠের পেছনে ধরা তলোয়ারের ডগা স্পর্শ করে ডানদিকের

কোমর, ভাঁজ হয়ে যায় দুই হাঁটু। তারপর তৃতীয় আক্রমণকারী যখন তার নাগালে এসে পড়েছে, তার তলোয়ার পিঠের পেছন থেকে উঠে এসে চিরে দেয় তার পেট।

তিনটে দেহ একের পর এক আছড়ে পড়ে মাটিতে। একটা ক্রূর উল্লাস যেন তলোয়ার থেকে উঠে এসে রতিসুখের মতো টগবগিয়ে ছুটে যায় রজতের প্রতিটি শিরা আর ধমনি দিয়ে।

পেছন থেকে আর-একজন তলোয়ারবাজ লক্ষ্য করে রজতকে। সে তেড়ে আসে না, বাকিদের দেখে তার শিক্ষা হয়ে গেছে। তলোয়ার উঁচিয়ে কিছুটা দূরত্ব রেখে হাঁটে।

জামার আস্তিনে ঠোঁটে লেগে-থাকা রক্তের লবণাক্ত স্বাদ মোছে রজত। তলোয়ার নামিয়ে হাঁটতে থাকে কুয়াশায় গোড়ালি ডুবিয়ে।

পেছনের তলোয়ারবাজ আচমকাই দৌড়ে আসে মাথার ওপর তলোয়ার তুলে।

রজতের ভেতরে একটা অন্তহীন নির্বোধ ক্ষুধা অধীর প্রত্যাশা নিয়ে যেন রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করে।

দুটো হাঁটু ভাঁজ করে শরীর ঝুঁকিয়ে ঘুরে যায় রজত। তার তলোয়ার বাঁদিকে উঠেই নেমে আসে ঘূর্ণির মতো, পেট ফাঁক করে দেয় আক্রমণকারীর। ফের যেন একটা তৃপ্তির বোধ রজতের তলোয়ার থেকে ছড়িয়ে যায় তার শরীরের বিন্দুতে বিন্দুতে।

জীবন আর মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে কলরব তুলে আকাশের দিকে উঠে যায় কয়েকটা রামধনু ফিঙে। তাদের ডানার ঝাপটায় ফুলের পাপড়ি ছড়িয়ে পড়ে গাছের ডাল থেকে, রজতের আস্তিনে রেখে যায় তাদের বুনো সুগন্ধের স্মৃতি।

শেষ হয় লড়াই। নিস্তব্ধ বনপথে শোনা যায় কেবল পাতার মর্মরধ্বনি আর রামধনু ফিঙের ডাক। গাছের আড়াল চিল-বেড়ালটা তীক্ষ্ণস্বরে ডাকতে থাকে বিরামহীনভাবে।

কুয়াশার চাদর জড়িয়ে নির্জন অরণ্যের মাটিতে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে থাকে কয়েকটা বাতিল রক্তাক্ত লাশ।

একটা গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে আসে রিমা। ভয়ার্ত দৃষ্টিতে সেই বধ্যভূমির দিকে তাকিয়ে তার সমস্ত শরীর কাঁপে থরথর করে। যেন পথ হারিয়ে কোনও অজানা এক ভয়ানক মৃত্যুপুরীতে এসে পড়েছে সে।

তলোয়ারের রক্ত একটা লাশের জামায় মুছে কালভৈরব পাসের রাস্তাটা দিয়ে হোমিগঞ্জের দিকে নামতে থাকে রজত।

ভয় ছাপিয়ে রিমার টিকে থাকার প্রবৃত্তি আবার প্রবল হয়ে ওঠে। দৌড়ে গিয়ে সে রজতের পথ রোধ করে দাঁড়ায়, “ওদিকে না, রজত। ওদিক থেকে আরও লোক আসছে।”

উল্লাসে ঝকঝক করে ওঠে রজতের চোখ, যেন সে ভোজসভার নিমন্ত্রণ পেয়েছে, “আসতে দাও! আসুক, আরও আসুক!”

দু-হাত রজতের বুকের ওপর রেখে রিমা অনুনয়ের সুরে বলে, “একবার ভেবে দ্যাখো রজত। বিজন ছাড়া আরও এতগুলো লোক মারা গেছে তোমার হাতে। আমার আর তোমার সম্পর্কের কথাও এতক্ষণে চাউর হয়ে গেছে। হোমিগঞ্জের লোক ভাববে, আমার জন্যেই তুমি এতগুলো মানুষ মেরেছ। আমাদের ধরতে পারলে দুজনকেই সঙ্গে সঙ্গে ফাঁসিতে লটকে দেবে। একটা পুরো শহরের সঙ্গে লড়াই করা তোমার পক্ষেও সম্ভব নয়।”

উত্তরদিকে রাস্তার দিকে তাকায় রজত। না, একা তার পক্ষে পুরো হোমিগঞ্জের সঙ্গে লড়া সম্ভব নয়। ও রাস্তা তার জন্যে আপাতত বন্ধ।

দক্ষিণদিকে তাকায় রজত। ওই রাস্তা রুসোগঞ্জ হয়ে হকিন্সাবাদ গেছে। রজত সেখানেই যাবে। স্টেডিয়ামে তার পেছনে হকিন্সাবাদের যে তলোয়ারবাজ বসে ছিল, অতীন না কী যেন নাম, সে বলছিল তাদের তলোয়ারবাজ দরকার। হকিন্সাবাদে গিয়ে তাকে খুঁজে বের করবে রজত।

একটা কথা মনে পড়তে রজতের মুখটা বিকৃত হয়ে যায় একটা কদর্য হাসিতে— রিমা হকিন্সাবাদ যেতে চেয়েছিল!

হকিন্সাবাদ



রিক্ত হস্তে দুনিয়াতে আসা
বিদায় নগ্নপদে
দুটি সাধারণ ঘটনার ব্যবধানে সমাধি অগুনতি স্বপ্নের



যাওয়ার আগে পরিষ্কার করেছি আয়না
আমার হৃদয়ের। এতে এখন প্রতিফলিত
অম্বালিকার আকাশ




হকিমাবাদ
কাঁসরপাড়া
পল্টনবাজার
খুঁটিপাড়া



১

রুসোগঞ্জ আর হোমিগঞ্জের মধ্যে দূরত্ব খুব একটা বেশি না হলেও, দুটো শহরের চরিত্র সম্পূর্ণ আলাদা। হোমিগঞ্জ কৃষিপণ্যনির্ভর। শহরের আদি বাসিন্দাদের কারও চালকল আছে, কারও রেশমকুঠি, কারও ফলের আড়ত। এই শহরে রাস্তাঘাট চওড়া, বাড়িগুলো খোলামেলা, উঠোন দালানে ঘেরা।

রুসোগঞ্জ যোধবণিকদের প্রধান কেন্দ্র। ঘিঞ্জি রাস্তার ওপরে এদের দুর্গের মতো দোতলা পাথরের বাড়িগুলোর একতলায় গুদোম আর আস্তাবল, দোতলায় বাসস্থান। বাড়ির জানলাগুলো ছোট ছোট, ভারী কাঠের তৈরি সদর দরজাগুলো পেছনে হেলানো, তাদের ওপর ইস্পাত কাচের ধারালো গজাল বসানো। গ্রিবিন আর নীলকান্ত মহিষের শরীর আর বিষ্ঠার গন্ধে এখানে বাতাস প্রায় সবসময়েই ভারী হয়ে থাকে, রাস্তায় জড়ো-করা মালের বস্তা আর মহিষ গাড়ির পাশ দিয়ে সাবধানে হাঁটতে হয়।

বণিকদের মহল্লার পাশে বাজার। এখানে ঘিঞ্জি রাস্তার ওপর বাড়িগুলো পাথরের বদলে কাঠ আর মাটিতে তৈরি। বাড়িগুলোর একতলায় নানা সামগ্রীর দোকান, দোতলায় ছোট ছোট খুপরি ঘরে মানুষের বাস।

এমনই একটা খুপরি ঘরে কাঠের আগুনে একটা কালি-পড়া হাঁড়িতে রান্না করে মিতা। ঘরের এককোণে মেঝেয় চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে থাকে রবি। ঘরের একটিমাত্র জানলা দিয়ে সকালের রোদ এসে পড়ে তার গায়ে।

“কাল রাতে কোথায় গিয়েছিলে কাকা?” হাঁড়িতে খুন্তি নাড়তে নাড়তে প্রশ্ন করে রিমা।

কাকা, অর্থাৎ রবি, মাথাটা সামান্য তোলে বিছানা থেকে, “কাল রাতে? কই, কোথাও যাইনি তো!”

উনুনের একটা কাঠ সামান্য নেড়ে দেয় মিতা, “সে কী! কাল মাঝরাতে ঘুম ভেঙে যে দেখলাম তোমার বিছানা খালি!”

চোখ ওপরে তুলে কী যেন মনে করার চেষ্টা করে রবি, “ওহো! হ্যাঁ! কাল রাতে মনে হল, বৃষ্টি আসবে। তাই জঙ্গল থেকে শুকনো কাঠ কুড়িয়ে আনতে গিয়েছিলাম। কাঠ ভিজে গেলে তো আবার তোমার রান্না হবে না।”

“ওঃ, আচ্ছা!” রবির নিশাকালীন অন্তর্ধান নিয়ে মিতার মনে আর কোনও প্রশ্ন আছে বলে মনে হল না। সে অন্য প্রসঙ্গ উত্থাপন করে, “আচ্ছা কাকা, আমরা হকিঙ্গাবাদ কবে যাচ্ছি?”

উত্তর দেয় না রবি, অন্যমনস্ক হয়ে কী চিন্তা করে। তাকে ঘাঁটায় না মিতা। এই অজানা বিদেশে সে একা, অসহায়। প্রায় সম্পূর্ণ অপরিচিত একজন লোকের ওপর নির্ভরশীল। কয়েকদিন হল, হকিঙ্গাবাদের কথা জিজ্ঞেস করলেই রবি কেমন এড়িয়ে যাচ্ছে, কিন্তু তা-ও মিতা তাকে চটাতে চায় না। ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করা ছাড়া তার আর কোনও উপায় নেই।

ঘরের কোণের দিকে চোখ যায় মিতার। সেখানে একটা থালার ওপর তার দাদুর ছবি কয়েকটা ফুল দিয়ে সাজিয়ে রেখেছে সে। তার সামনে সকালে যে ধূপ জ্বালিয়ে দিয়েছিল সে, তার থেকে কুণ্ডলী পাকিয়ে ধোঁয়া ওঠে। প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে সে যে দাদুর সৎকার পর্যন্ত করতে পারেনি, দাদুর দেহটা জঙ্গলের মধ্যে রেখেই পালিয়ে এসেছে, সে দুঃখ মিতা এখনও ভুলতে পারেনি।

ছবিটার দিকে তাকিয়ে হাত জোড় করে সে নিজের মনেই বিড়বিড় করে, “তুমি যেখানেই থাকো, ভালো থেকো দাদু। জয় মহাকাল, আমার দাদুকে ভালো রেখো তুমি। আর চিন্তা কোরো না দাদু, একদিন না একদিন আমি ঠিক তোমার মৃত্যুর বদলা নেব।”

“মিতা, শোনো।” বিছানায় উঠে বসে ডাক দেয় রবি, তার গলায় কেমন একটা অসন্তুষ্টির ছাপ।

চোখ মুছে রবির সামনে গিয়ে বসে মিতা।

“দ্যাখো মিতা, তুমি যে এই রোজ বলো, ‘বদলা নেব, বদলা নেব’, এটা বলা ঠিক না। বদলা, প্রতিশোধ— এসব কথা বড় মানুষ, তলোয়ারবাজ— এদের মানায়। তুমি মহাকালের কাছে দাদুর জন্যে প্রার্থনা করো, তাহলেই হবে।”

"বদলার কথা না বললে আমি শান্তি পাই না যে!" মুখ ফিরিয়ে আবার চোখের জল মোছে মিতা।

একটা ভারী শ্বাস নেয় রবি, "কিন্তু তোমার এইসব কথায় তোমার দাদুর আত্মার মুক্তি পেতে অসুবিধে হবে যে, মিতা। যাক গে, শোনো। তুমি আমাকে হকিঙ্গাবাদ যাওয়ার কথা জিজ্ঞেস করছিলে না? আমি তোমায় নিয়ে আজকালের মধ্যেই হকিঙ্গাবাদের জন্যে রওনা দিতাম। কিন্তু আমার একটু চোট লেগেছে।''

"চোট লেগেছে? সে কী গো! কী করে? ডাক্তার দেখিয়েছ?" উদ্‌বিগ্ন কণ্ঠে প্রশ্ন করে মিতা।

"আরে না না, তেমন কিছু নয়।" আশ্বস্ত করে রবি, "কাল রাতে কাঠ আনতে গিয়ে একটা গাছের শেকড়ে হোঁচট খেয়ে পড়ে গিয়েছিলাম। কোমরে একটু লেগেছে। দু-একদিনের মধ্যে ঠিক হয়ে গেলেই বাঁধাছাঁদা করে হকিঙ্গাবাদের রাস্তা ধরব।"

"তুমি ব্যস্ত হোয়ো না কাকা। সেরে ওঠো আগে। দু-চার দিন দেরি হলে তেমন কিছু ক্ষতি হবে না।" তাড়াতাড়ি বলে ওঠে মিতা।

"তোমার মনটা খুব নরম। আমার সেরকম কিছু হয়নি গো। সত্যি! দু-একদিন একটু জিরোলেই ঠিক হয়ে যাবে। ওহো, ভুলেই গিয়েছিলাম, তোমায় একটা জিনিস দেওয়ার ছিল। দাঁড়াও।"

বিছানার তলা হাতড়ে একটা খাপে ঢোকানো ছোরা বের করে আনে রবি, "এইটা তোমার কাছে রেখে দাও। পোশাকের মধ্যে লুকিয়ে রেখো, কেউ টের না পায়। দিনকাল ভালো নয়, সঙ্গে একটা হাতিয়ার থাকা ভালো।"

মাথা নাড়ে মিতা, "আচ্ছা। একটা রশিতে বেঁধে গলায় ঝুলিয়ে রাখব। রান্না হয়ে গেছে, খাবে কাকা?"

তাক থেকে দুটো থালা নামিয়ে আনে রবি, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, দাও। খুব খিদে পেয়ে গেছে।"

ভাত, সামান্য দু-একটা সবজি, উনুনের সামনে বসে মিতার সঙ্গে তা-ই পরিতৃপ্তি করে খায় রবি।

"ওঃ, দারুণ রেঁধেছ মিতা! তুমি দেখছি, আমার অভ্যেস খারাপ করে দিচ্ছ। দু-দিন বাদে তুমি চলে যাবে, তখন এইরকম রান্না আর কোথায় পাব বলো তো?"

হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে মিতার মুখটা। সে কিছু একটা বলতে যাবে, নীচ থেকে কে ডাক দেয়, "ও রবি! রবি আছ?"

দরজার দিকে মাথা বাড়ায় রবি, "আছি? কে?"

"আমি বিষ্টু। একবার শুনে যাও!"

সরু সিঁড়ি দিয়ে একতলায় নেমে আসে রবি। সাদামাটা পোশাকে তারই বয়সি একজন রাস্তায় দাঁড়িয়ে।

"কী হয়েছে, বিষ্টু?''

"রবি, আমরা দশ-পনেরোজন মিলে কোতোয়ালি যাচ্ছি, তুমি আমাদের সঙ্গে আসতে পারবে?"

"কোতোয়ালি! কেন?" আশ্চর্য কণ্ঠে প্রশ্ন করে রবি।

"আর বোলো না। অনর্থক ঝুটঝামেলা। নির্মলকে চেনো তো, যার ওই মোড়ের মাথায় যন্ত্রপাতির দোকান? তাকে পুলিশে ধরে নিয়ে গেছে।"

"সে কী গো? কী হয়েছিল?"

"কিচ্ছু হয়নি।" বিরক্ত গলায় বলে বিষ্টু, "বণিক মহল্লায় একজনের বাড়িতে চোর পড়েছিল। বেশি কিছু নিতে পারেনি, পাহারাদার দেখে ফেলাতে, ছাদ থেকে লাফ দিয়ে পালায়। আজ সকালে পুলিশ এসে তল্লাশি করার সময়ে ছাদে নির্মলের দোকানের একটা রসিদ কুড়িয়ে পায়। তারপর আর কী! সোজা ওর দোকানে এসে ওকে ধরে নিয়ে গেছে।"

"রসিদ!'' কেমন যেন চমকে ওঠে রবি। অন্যমনস্কভাবে হাত ঢোকায় পকেটে।

"হ্যাঁ, রসিদ।" গলার স্বরে বিরক্তি কাটে না বিষ্টুর, "কোথায় যে চুরি করেছে, তাকে খুঁজে বের করবে, না নির্মলের দোকানের রসিদ পাওয়া গেছে বলে তাকেই তুলে নিয়ে গেল। আমরা তাই সবাই দল বেঁধে যাচ্ছি, দরকার হলে মুচলেকা দিয়ে কি জামিন দিয়ে ছাড়িয়ে আনব। তুমি আসবে আমাদের সঙ্গে?"

"যেতাম গো। ইশ্‌শ, খামোখা নিরীহ লোকটাকে ধরে নিয়ে গেছে গো!" সহানুভূতির সুরে বলে রবি, "কিন্তু একদম হাঁটতে পারছি না, কাল রাতে নামতে গিয়ে সিঁড়ি থেকে খুব জোর পড়ে গিয়েছি। তোমরা এবার যাও। পরের বার দরকার হলে আমি অবশ্যই যাব।"

বিরসবদনে বিষ্টু বিদায় নিতেই রবি ছটফটিয়ে চারপাশে চায়, যেন কী করবে, মনস্থির করতে পারছে না।

হঠাৎ তার চোখ যায় আকাশের দিকে। সেখানে একটা ব্লিম্প মন্থরগতিতে ভেসে যাচ্ছে রুসোগঞ্জের মাঝখানে উঁচু ব্লিম্প টাওয়ারটার দিকে।

এক মুহূর্ত কী চিন্তা করে রবি লম্বা পায়ে দৌড় লাগায় সেইদিকে। রাস্তার লোক অবাক হয়ে তাকে তাকিয়ে দ্যাখে। মাঝবয়সি একটা লোকে যে অত জোরে দৌড়োতে পারে, তাকে না দেখলে কেউ বিশ্বাস করত না।

আধ ঘণ্টা বাদেই যেমন গিয়েছিল, তেমনি ছুটতে ছুটতে ফেরত আসে রবি। তরতর করে সিঁড়ি দিয়ে উঠে ঘরে মাথা গলিয়েই বলে, "মিতা, তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নাও। এখনই হকিন্সাবাদের জন্যে বেরিয়ে পড়তে হবে।"

"এখনই!'' অবাক হয় মিতা, "তুমি যে বললে, চোট লেগেছে, দু-তিন দিন বাদে বেরোবে?"

"হ্যাঁ, তা বলেছিলাম,'' ওপর-নীচে মাথা দোলায় রবি, "কিন্তু আমাদের আর রাস্তা দিয়ে যেতে হবে না। আরাম করে বসে বসে যাব।"

রবির কথা বুঝতে না পেরে তার মুখের দিকে নীরবে তাকিয়ে থাকে মিতা।

"বুঝতে পারলে না?" একটু অধৈর্য হয়ে হাতের মুঠো খোলে রবি— "এই দ্যাখো!"

ঝুঁকে পড়ে দ্যাখে মিতা, কিন্তু বুঝতে পারে না, ''কী এটা?"

"ব্লিম্পের টিকিট!" বিজয়ীর ভঙ্গিতে বলে রবি, "এক ঘণ্টার মধ্যে একটা ব্লিম্প ছাড়বে, আমরা তাতে চড়ে যাব।"

"ব্লিম্প!" বিস্ফারিত হয়ে ওঠে মিতার দু-চোখ— "মানে হাওয়া জাহাজ! তাতে তো বড়লোকরা চড়ে। আমরা ওতে করে যাব কী করে?"

"আরে, এটা সেরকম ব্লিম্প নয়, যাতে বড়লোকরা চড়ে বেড়াতে বেরোয়।'' মিতাকে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করে রবি, ''এতে করে মাল যায়, যাত্রীদের জন্যে পাঁচ-দশটা সিট থাকে।"

তবু সংশয় কাটে না মিতার, "তা-ও, এর টিকিটের নিশ্চয়ই অনেক টাকা দাম হবে! তুমি এত খরচা করবে?"

"আরে দুর! আমি টাকা দিয়ে টিকিট কেটেছি নাকি! যারা মাল পাঠায়, তাদেরই একজন দুটো টিকিট আমাকে জোগাড় করে দিয়েছে। নাও, নাও, চলো। দেরি হয়ে যাবে।"

মিনিট দশেকের মধ্যেই রবি পিঠে ফেরিওয়ালার বাক্স বেঁধে মিতাকে নিয়ে হাঁটা দেয় ব্লিম্প টাওয়ারের দিকে।

২

রবি বানিয়ে বলেনি, পাশবালিশের মতো বিশাল বেলুনের নীচে ঝোলানো কেবিনটা সত্যিই মালে ঠাসা। মালের পেটির মাঝখানে এদিকে-ওদিকে কয়েকটা তক্তা-মারা চেয়ার, তাতে পা গুটিয়ে কোনওমতে বসা যায়।

ব্লিম্প ছাড়া অবধি রবি কেমন একটু চঞ্চল ছিল, যেন কিছু একটা দুশ্চিন্তার মধ্যে রয়েছে, কিন্তু ব্লিম্প টাওয়ারের বাঁধন খুলে হাওয়ায় উঠতেই সে সেই অস্বাচ্ছন্দ্যকর চেয়ারেই বেশ আয়েশ করে ঠেস দিয়ে বসে।

"মিতা, হকিঙ্গাবাদ খুব বড় শহর। তুমি যার কাছে যাচ্ছ, তার ঠিকানা জানো তো?"

একটু ইতস্তত করে মিতা, "ঠিকানা তো সেরকম কিছু জানি না, তবে দাদু বলেছিল পলটনবাজারে দর্জির দোকান।"

"পলটনবাজারে তো অনেক দোকান আছে। ঠিক কোথায় জানো?"

"দাদু বলেছিল বাজারের বড়রাস্তায়। মুসাফিরখানার কাছাকাছি। খুঁজে পেতে অসুবিধে হবে?" উৎকণ্ঠার ছোঁয়া লাগে মিতার কণ্ঠস্বরে।

"আরে না না। তুমি চিন্তা কোরো না। ও আমি ঠিক খুঁজে বের করে নেব। দোকানে কার কাছে যাবে তুমি?"

"ওই দোকানেই যাব। ওটা আমার মাসির দোকান।" বেশ গর্বের সঙ্গে বলে মিতা।

"মাসি? মানে তোমার মায়ের বোন?''

"না, বোন নয়,'' একটু থতোমতো খায় মিতা, "আমাদের গ্রামের মেয়ে তো, আমি তাই মাসি বলি।''

"ওঃ আচ্ছা।" কেমন একটু চিন্তিত দেখায় রবিকে— "তোমার সঙ্গে যোগাযোগ আছে?"

আবার একটু ইতস্তত করে মিতা, "হ্যাঁ, ওই বছরখানেক আগে গ্রামে এসেছিল। তখনই তো দাদুকে বলেছিল, 'হকিঙ্গাবাদে পলটনবাজারে দর্জির দোকান দিয়েছি। মেয়েটা একটু বড় হলে নিয়ে যেয়ো, কাজে লাগিয়ে দেব'।"

"বাঃ, তাহলে তো ভালোই। মাসির দোকানে দর্জির কাজ শিখে নিলে তোমার আর চিন্তা থাকে না।''

এরপর আর বিশেষ কথা হয় না, কেবিনের একচিলতে জানলা দিয়ে মিতা নীচের শোভা দেখতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। রবিও কোনও গভীর চিন্তায় ডুবে যায়।

৩

হকিঙ্গাবাদ এককালে ভিন্নরদের ফেলে-যাওয়া শহর। মানুষ অম্বালিকায় আসার পর শহরের ঝোপজঙ্গল সাফ করে, জন্তুজানোয়ার তাড়িয়ে এখানে বসবাস শুরু করে। শুধু মাথা গোঁজার আস্তানা নয়, ভিন্নরদের ফেলে-যাওয়া নানা প্রযুক্তিও তারা নিজের মতো করে কাজে লাগাতে শুরু করে।

যেমন প্রয়োজন, যন্ত্রকে তেমন রূপ দেয় মানুষ, তাতে সংযোজন করে কুড়িয়ে-পাওয়া প্রযুক্তির ক্রিয়া। নতুন প্রযুক্তির ব্যবহারের অসম্পূর্ণ জ্ঞান আর অচেনা গ্রহে জীবন শুরু করতে চাওয়া মরিয়া তাগিদ— এই দুইয়ের সংমিশ্রণ হকিঙ্গাবাদে জন্ম দেয় নানা অদ্ভুত যন্ত্রের, যাদের মধ্যে অতি আধুনিক আর অতি প্রাচীন পরস্পরের সঙ্গে জুড়ে যায় আস্তাকুঁড়ে ছুড়ে-ফেলা জরাসন্ধর দুই টুকরোর মতো।



ব্লিম্প টাওয়ার থেকে নেমে বিস্ফারিত নেত্রে সেইসব বিচিত্র যন্ত্র দেখতে থাকে মিতা।

পাখির পায়ের আদলে গড়া ধাতব দুই পায়ে হেঁটে যায় পালকি। পালকির আগে আগে তার রশি ধরে হাঁটে বেহারা, ভেতরে তাকিয়ায় ঠেসান দিয়ে বসে থাকে সুবেশ নারী-পুরুষরা। মাথার ওপরের ট্রামলাইন দিয়ে ঘড়ঘড় শব্দ তুলে ক্রিস্টালের নীল দ্যুতি-মাখা কাচের তালের মতো ইঞ্জিন টেনে নিয়ে যায় ট্রামের কাঠের কামরা। রাস্তার ধারে বসানো ধাতুর ছাতা তাদের খুঁটির চারপাশে মাটিতে ফোটোক্রিস্টালের আলো ফেলে দেখায় নানা পণ্যের বিজ্ঞাপন। তাদের সামনে দিয়ে কালো ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে অজস্র ছোট ছোট

পায়ে হেঁটে যায় মালের কন্টেনার। কন্টেনারের মাথায় বসানো ছোটবড় লিভারে হাত রেখে তাদের চালিয়ে নিয়ে যায় চালকরা।

আজন্ম পাড়াগাঁয়ে লালিত মিতা অবাক দৃষ্টিতে চারপাশে তাকাতে তাকাতে রবির সঙ্গে পথ হাঁটে।

মানুষ যখন হকিন্সাবাদে আসে, তখন শহরের একদম কেন্দ্রে ভিন্নরদের ফেলে-যাওয়া মহল, অলিন্দ, সোপান, রাজপথ, তোরণ, ফোয়ারা প্রায় অক্ষতই ছিল। ব্যবহারের আগে এই এলাকাটা যৎসামান্যই পরিবর্তন করে প্রায় আগের মতোই রেখে দেওয়া হয়। প্রধান পথের দু-পাশে কাঁসরপাতা গাছের সারির জন্যে এ অঞ্চলের নাম কাঁসরপাড়া। এখানেই প্রেসিডেন্টের প্রাসাদ, চ্যান্সেলরের দরবার, সেনেট আর আদালত। এখানে কেবল তারাই বাস করে, যারা হকিন্সাবাদের রাজনৈতিক ক্ষমতার শীর্ষে। কাঁসরপাড়া ঘিরেই গড়ে উঠেছে হকিন্সাবাদের বাকি সব অঞ্চল, যার একটি অংশের নাম পলটনবাজার। জনশ্রুতি, পৃথিবীর প্রথম অভিযাত্রীদলের সঙ্গে যে পলটন এসেছিল, তাদের প্রয়োজনেই গড়ে ওঠে এই বাজার।

হকিন্সাবাদে রবি এর আগেও এসেছে, রাস্তাঘাট তার চেনা, পলটনবাজার চিনে আসতে তার অসুবিধে হয় না, বড়রাস্তায় মুসাফিরখানার কাছে দর্জির দোকান খুঁজে পেতেও বড় একটা বেগ পেতে হয় না। ব্লিম্প থেকে নামার আধ ঘণ্টার মধ্যেই সে দর্জির দোকানে পৌঁছে যায় মিতাকে নিয়ে।

দর্জির দোকানে জানলা নেই। বদ্ধ ঘরটার বাতাস কাপড়, মাড় আর ঘামের গন্ধে কেমন থমথমে হয়ে আছে। আলো-আঁধারি এককোণে ক্রিস্টাল লণ্ঠনের নীলচে আলোয় তিন-চারজন মেয়ে কাপড়ে নকশা তোলে, বোতাম বসায়। আর একদিকে ধবধবে ফরাশের ওপর কাপড়ের বান্ডিল আর প্যাকেটের মধ্যে বসে একজন মাঝবয়সি লোক জামাকাপড় ভাঁজ করে।

দোকানে পা রেখে রবি ফরাশে বসা লোকটাকে উদ্দেশ করে কিছু বলতে যাবে, আর-একজন দোকানে এসে ঢোকে। রবির পেছন থেকে জোরালো নারীকণ্ঠ ভেসে আসে, "বিশু, আমার জামাটা হল?"

ফরাশে বসা লোকটা ব্যস্ত হয়ে ওঠে, "শুভা হুজরাইন! আপনি নিজে এলেন! আপনার কাজের মেয়েটাকে পাঠিয়ে দিলেই তো হত!"

"সে দিনকতক হল কাজ ছেড়ে চলে গেছে!" রবির পাশ কাটিয়ে এগিয়ে আসেন শুভা।

আড়চোখে তাকিয়ে দ্যাখে রবি। মহিলার বয়স চল্লিশ ছাড়িয়েছে, দামি পোশাক, পরিপাটি চুল, মুখে হালকা প্রসাধন। ব্যক্তিত্বে আভিজাত্যের ছাপ স্পষ্ট।

"আপনি খবর দিলেন না কেন? আমি কারও হাত দিয়ে পাঠিয়ে দিতাম। আপনি শুধু কষ্ট করে এত দূর এলেন।" বিশুর কণ্ঠে বিনয় ঝরে পড়ে।

"তোমার ভণিতা রাখো তো!" ধমক দেন শুভা। স্পষ্টই বোঝা যায়, বিশুর মিষ্টি কথায় চিঁড়ে ভেজেনি। "জামাটা হয়েছে কি না বলো।"

"হ্যাঁ হ্যাঁ, হয়ে গেছে, খালি কয়েকটা বোতাম বসানো বাকি।" ঢোঁক গিলে বোতাম বসাতে-থাকা মেয়েটাকে তাগাদা দেয় বিশু, "নে নে, তাড়াতাড়ি হাত চালা, দেখছিস না, হুজরাইন দাঁড়িয়ে আছেন।"

"উফফ!" একটা বিরক্তি ছড়িয়ে পড়ে শুভার মুখে, "কোনও একটা জামা আজ পর্যন্ত তুমি সময়মতো দিলে না বিশু। আমি ফুল কিনতে যাচ্ছি, তার মধ্যে কাজটা শেষ করো।"

শুভা বেরিয়ে যেতে যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচে বিশু, রুমাল দিয়ে কপালের ঘাম মোছে।

"কে ভাই ইনি?" সহানুভূতির স্বরে জিজ্ঞাসা করে রবি, "কোনও বড় ঘরের কেউ?"

"তা বলতে পারেন। সেনেটর সুখেন্দুর নাম শুনেছেন তো? বছরখানেক আগে মারা গেছেন। জীবদ্দশায় চ্যান্সেলরের ডান হাত ছিলেন। একেবারে গলায় গলায় বন্ধু। এই শুভা হুজরাইন তাঁর হাউসকিপার ছিলেন।"

"হাউসকিপার?" ভ্রূ কপালে তোলে রবি।

একটা অর্থবহ হাসি খেলে যায় বিশুর মুখে, "ওই আর কী! বড় মানুষের ব্যাপার, বুঝতেই পারছেন। যাক, কী চাই বলুন।"

গলাখাঁকারি দেয় রবি, "আপনাদের মালকিনের সঙ্গে একটু দরকার ছিল।"

বিশুর মুখের হাসি মিলিয়ে যায়, "মালকিন? মানে দিদি? কেন, কী দরকার বলুন তো?"

মিতাকে এগিয়ে দেয় রবি, "গোডেলগাঁও থেকে ওঁর এই বোনঝি এসেছে। ওঁর সঙ্গে দেখা করবে।"

বিরক্তিতে ঢেকে যায় বিশুর মুখ, "দেখুন ভাই, এটা হকিঙ্গাবাদ। ওইসব বোনপো-বোনঝির গপ্প অনেকবার শুনেছি। আমাকে উজবুক ভেবেছেন নাকি? যান, যান, বেরোন দোকান থেকে!"

মিতার দিকে আড়চোখে তাকায় রবি। বিশুর এই অপ্রত্যাশিত অভদ্র ব্যবহারে তার মুখ পাংশু হয়ে গেছে, চোখের কোণে জল চিকচিক করছে।

পকেট থেকে কয়েকটা টাকার নোট বের করে বিশুর হাতের মুঠোয় গুঁজে দেয় রবি, "আরে ভাই, রাগ করছেন কেন? একটু গিয়ে খবর দিন-না। যদি দেখা না করতে চান, চলে যাব।"

হাতের মুঠোর দিকে তাকিয়ে রাগ পড়ে আসে বিশুর, সেলাই করতে থাকা একটা মেয়ের দিকে তাকিয়ে বলে, "যা, দিদিকে খবর দিয়ে আয়। বল, গোডেলগাঁও থেকে কে বোনঝি দেখা করতে এসেছে।"

সেলাই ফেলে মেয়েটা দোকানের পেছনের একটা দরজা দিয়ে ভেতরে কোথাও চলে যায়। রবি আর মিতা দাঁড়িয়ে থাকে, বিশু তাদের বসতে বলার প্রয়োজন মনে করে না।

মেয়েটা যাওয়ার কয়েক মিনিট বাদেই দোকানে ফেরত আসেন শুভা, "বিশু, হল?"

পাশে বসা মেয়েটার থেকে একটা জামা নিয়ে প্যাক করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে বিশু, "হ্যাঁ, ম্যাডাম, হয়ে গেছে। বসুন, দিয়ে দিচ্ছি।"

ফরাশে বসে শুভা দাম মেটাচ্ছেন, এমন সময়ে ভেতরে যে মেয়েটা গিয়েছিল, সে ফেরত আসে। নিরাসক্ত গলায় বলে, "দিদি বলল, দিদির কোনও বোনঝি নেই। গোডেলগাঁওয়ে দিদি কাউকে চেনে না।"

মিতার চোখের কোণে যে জলটা এতক্ষণ জমা ছিল, সেটা এবার তার গাল বেয়ে নেমে আসে। কান্না-জড়ানো গলায় সে বলে, "কেন মাসি এমন কথা বলল? মাসি বোধহয় ঠিক বুঝতে পারেনি। একবার মাসিকে নিজে আসতে বলো-না! আমাকে দেখলে মাসি ঠিক চিনতে পারবে!"

অন্য সময় হলে হয়তো বিশু দুজনকেই ঘাড়ধাক্কা দিত। কিন্তু শুভার মতো দামি খদ্দেরের সামনে এমন অহেতুক ঝামেলায় সে বিব্রত হয়ে পড়ে। সেলাই-করা মেয়েটাকে বলে, "আর-একবার যা। দিদিকে আসতে বল। আমি সামলাতে পারছি না।"

আবার ভেতরে অদৃশ্য হয়ে যায় মেয়েটা। মিতার মুখের দিকে একটা তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে জামার প্যাকেট নিয়ে বেরিয়ে যান শুভাও।

কিছুক্ষণ বাদে দোকানের পেছন থেকে এক বৃদ্ধা বেরিয়ে আসেন। কাঁচাপাকা চুল, চোখে মোটা কাচের চশমা।

“কে গো তোমরা? কাজের সময় অশান্তি করছ?’’

মিতার দিকে আড়চোখে তাকায় রবি। তার মুখের হতভম্ব চেহারা থেকেই পরিষ্কার, সে এই মহিলাকে আগে কখনও দেখেনি।

“এই দোকানটা কি আপনার?” আমতা আমতা করে প্রশ্ন করে রবি।

“হ্যাঁ! কেন বলো তো?” কপাল কুঁচকে উত্তর দেন বৃদ্ধা।

“আমরা তাহলে বোধহয় ভুল দোকানে এসে পড়েছি।” মিতার দিকে চোখ তুলে ইঙ্গিত করে রবি, “আমরা ভেবেছিলাম এটা ওর মাসির দোকান।”

“তোমার মাসি!” চশমার ফাঁক দিয়ে মিতার দিকে তাকান বৃদ্ধা, “কী নাম বলো তো তোমার মাসির?”

“মলি!’’ ভয়ে ভয়ে উত্তর দেয় মিতা।

“ওঃ মলি! মলি আমার কাছে কাজ করত। কিন্তু সে তো বছরখানেক হল, কাজ ছেড়ে দিয়ে চলে গেছে।”

অদ্ভুত দৃষ্টিতে বৃদ্ধার দিকে তাকিয়ে থাকে মিতা। যেন সে নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছে না।

“কোথায় গেছে, বলতে পারবেন?” মিতার কান্না-ভেজা মুখের দিকে একবার তাকিয়ে প্রশ্ন করে রবি।

“না গো! খবর রাখিনি। তবে শুনেছি, বেশি রোজগারের আশায় দর্জির কাজ ছেড়ে দিয়েছে। ছেলেমানুষের সামনে এর বেশি আর কী বলি বলো!”

বৃদ্ধার কথাগুলো শুনে কেমন যেন পাথরের মূর্তির মতো হয়ে যায় মিতা। তাকে কোনওমতে হাত ধরে দোকানের বাইরের নিয়ে আসে রবি।

রাস্তায় এসে আবার কান্নায় ভেঙে পড়ে মিতা, “কাকা, আমি কোথায় যাব এবার? আমার তো কেউ নেই! কী হবে আমার?’’

তার পিঠে একটা হাত রেখে তাকে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করে রবি, “কেঁদো না, কেঁদো না। কিছু একটা ব্যবস্থা নিশ্চয়ই হয়ে যাবে।”

সান্ত্বনা দেয় বটে রবি মিতাকে, কিন্তু তার নিজের মুখের চেহারা দেখেই বোঝা যায় যে সে এবার কী করবে, সে ব্যাপারে তার নিজেরও কোনও সুস্পষ্ট ধারণা নেই।

“ফেরিওয়ালা, ও ফেরিওয়ালা! এই যে এদিকে!”

একটা চেনা গলার আওয়াজে মাথা ঘোরায় রবি। রাস্তার ধারে দাঁড় করানো একটা পালকিতে বসে হাতছানি দিয়ে তাকে ডাকেন শুভা।

কাছে গিয়ে মাথা ঝোঁকায় রবি, “ডাকছেন হুজরাইন?”

মিতার দিকে চোখ তুলে ইঙ্গিত করেন শুভা, “কে হয় তোমার?”

“দূর সম্পর্কের ভাইঝি, হুজরাইন।”

মাথা নাড়েন শুভা, “শহরে বোধহয় কাজ খুঁজতে এসেছিলে, না?”

“হ্যাঁ, হুজরাইন। কিন্তু—”

হাত তুলে বাধা দেন শুভা, “বলতে হবে না। বুঝতে পেরেছি। আমার একটা ফুলের দোকান আছে। দোকানে যে মেয়েটা কাজ করত, সে কাজ ছেড়ে দিয়ে চলে গেছে। চাও তো তোমার ভাইঝিকে আমি তার জায়গায় রাখতে পারি।”

ইতস্তত করে রবি। হকিঙ্গাবাদে কোনও অজানা লোকের কাছে একটা বাচ্চা মেয়েকে সঁপে দেওয়ার মধ্যে যে কী বিপদ আছে, তার চাইতে ভালো কেউ জানে না।

রবির মুখের চেহারা দেখে তার মনের কথাটা বোধহয় বুঝতে পারেন শুভা, “তোমাকে এখনই হ্যাঁ-না কিছু বলতে হবে না। আমার সঙ্গে এসো, আমার বাড়ি দেখে যাও, তারপর না হয় ঠিক কোরো।”

নিরুপায় হয়ে তা-ই করে রবি। রশি ধরে পালকি হাঁটিয়ে নিয়ে যায় বেহারা, আর তার পেছনে হাঁটে রবি আর মিতা। পলটনবাজারের পর আরও দু-একটা অঞ্চল পার হয়ে পালকি এসে পড়ে কাঁসরপাড়ার কাছাকাছি একটা অভিজাত পল্লিতে। তার রাস্তার দু-পাশের বাড়িগুলো দেখলেই বোঝা যায় সেটা পয়সাওয়ালা মানুষের এলাকা।

বড় একটা ফটক-দেওয়া বাড়ির সামনে পালকি থেকে নামেন শুভা। বাড়ির একতলায় একটা ফুলের দোকান, দোকানের জানলায় সাজানো নানা বর্ণের আর আকারের ফুলের তোড়া।

দোকানটা দেখে আশ্বস্ত হয় রবি। দর্জির দোকান না হলেও ফুলের দোকান। মিতার গ্রাসাচ্ছাদনের একটা বন্দোবস্ত হয়ে যাবে।

মিতার দিকে তাকান শুভা, “আমার কাছে ফুল সাজানো শিখবে আর এই দোকান সামলাবে। কী? করবে কাজ?”

নীরবে ঘাড় নেড়ে সায় দেয় মিতা।

ব্যবস্থা পাকা করে মিতার কাছে বিদায় নেয় রবি, "যাক, এইবার আমি নিশ্চিন্ত! তোমার একটা কাজের বন্দোবস্ত হল। একবার এই হুজরাইনের কাছে কাজ শিখে নিলে তুমিও একদিন একটা দোকান দিয়ে ফেলবে।"

"তোমার সঙ্গে আর দেখা হবে না, কাকা?'' ব্যথিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করে মিতা।

"সে কী! অবশ্যই হবে। আমি কাজের ফাঁকে ফাঁকে তোমাকে এসে দেখে যাব?''

"তুমি কি এখন রুসোগঞ্জ ফেরত যাবে?''

"রুসোগঞ্জ!'' কেমন আঁতকে ওঠে রবি, "না, না, রুসোগঞ্জ যাব না। হকিন্সাবাদ, দৌলতনগর, এর কাছাকাছি কোথাও থাকব। না হলে তোমাকে দেখতে আসব কী করে?"

ফটকের একটা কপাট ধরে দাঁড়িয়ে থাকে মিতা। বিকেলের পড়ন্ত রোদ পড়ে তার মুখে। তাকে পেছনে ফেলে এগিয়ে যায় রবি।

কিছুটা যাওয়ার পর তার চোখটা কেমন জ্বালা করে ওঠে। নিশ্চয়ই বালি পড়ে থাকবে, মনে মনে ভাবে সে।

জামার হাতায় চোখ মুছে আবার পথ চলে রবি।

৪

সময় থেমে থাকে না। দিন গড়িয়ে সপ্তাহ, সপ্তাহ গড়িয়ে মাস, মাস গড়িয়ে বছর হয়। বছরের পর আরও একটা বছর চলে যায়। হকিন্সাবাদের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ঘোরালো হয়ে ওঠে। সেনেটর সুখেন্দুর পর আরও দু-তিনজন বয়স্ক সেনেটর দেহ রাখার পর সেনেটের দখল পুরোপুরি চলে যায় চ্যান্সেলর-বিরোধীদের হাতে। সেনেট আর চ্যান্সেলরপন্থীদের মধ্যের বিরোধ ক্রমে কথা কাটাকাটি থেকে গালাগালি, গালাগালি থেকে হাতাহাতি, এবং হাতাহাতি থেকে খুনোখুনিতে এসে দাঁড়ায়।

এরপর শুরু হয় যথেচ্ছাচার। ক্ষমতা দখলের জন্য মরিয়া দু-পক্ষই তাদের লড়াই রাজপথে নামিয়ে আনে। চ্যান্সেলরের কওমি পলটন আর সেনেটের আজাদ মিলিশিয়ার মধ্যে মারামারি, দাঙ্গাহাঙ্গামা নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। এর সঙ্গে যোগ হয় রাজনৈতিক খুন আর গুপ্তহত্যা। দুই পক্ষই পরস্পরের সমর্থকদের দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিতে বিন্দুমাত্র কসুর করে না। হকিন্সাবাদের রাস্তায় তাজা রক্তে ভেজা নরমুণ্ড গড়াগড়ি যেতে দেখাটা মানুষের গা-সওয়া হয়ে দাঁড়ায়। ঘোলা জলে মাছ ধরতে দৌলতাবাদের গভর্নর থেকে পিণ্ডারির দল অবধি অনেকেই নেমে পড়ে।

এই অরাজকতার মধ্যেই একদিন অম্বালিকা দিবস আসে। মানুষ বছরের এই দিনটাতেই অম্বালিকায় প্রথম পা রেখেছিল। বাড়িতে বাড়িতে পতাকা ওড়ে, রাস্তা পতাকার মালায় সেজে ওঠে, ছোট ছোট ছেলেমেয়ে পতাকা হাতে দৌড়ে বেড়ায়। বাজারে, দোকানে খদ্দেরের ভিড়, চারপাশে উৎসবের আমেজ। এর দু-দিন আগেই কামানিয়া ফটকের কাছে চার-পাঁচজন সেনেটপন্থী আমলা খুন হয়েছে, কিন্তু মানুষের হুল্লোড় দেখে সে নিয়ে কারও বিন্দুমাত্র মাথাব্যথা আছে বলে বোঝা যায় না।

হকিন্সাবাদের পশ্চিম প্রান্তের একটা অঞ্চল খুঁটিপাড়া। এখানে এলে দেখতে পাওয়া যায় ছ-সাতটা পঁচিশ-তিরিশ ফুট উঁচু কোনও অজানা ধাতুর খুঁটি মাটি থেকে স্ক্রুয়ের প্যাঁচের মতো আকাশের দিকে উঁচিয়ে আছে বল্লমের মতো। এগুলোর ব্যবহার কী, আজ অবধি জানা যায়নি, তবে এদের থেকেই এই এলাকার নাম খুঁটিপাড়া হয়ে গেছে।

এই খুঁটির সারির পেছনে এককালে একটা বিস্তৃত ভিন্নর ইমারতের ধ্বংসস্তূপ ছিল। এটারই ধসে-পড়া ছাদ আর দেওয়াল সরিয়ে ফেলে তারপর অবশিষ্ট থাম আর বরগাগুলোর ওপর কাঠের তক্তা বসিয়ে মানুষ অম্বালিকায় পৌঁছে তাদের প্রথম বাসস্থান নির্মাণ করে।

তবে সে অনেককাল আগের কথা। এই হতশ্রী অঞ্চলের কুৎসিত আস্তানাগুলোতে আজকাল বাস শুধু দরিদ্র আর হতভাগাদের। আর তাদের, যারা কোনও কারণে সমাজের দৃষ্টির বাইরে থাকতে চায়।

এখানেই ঠররার গ্লাস হাতে এমনই একটা আস্তানার দরজায় বসে থাকে তলোয়ারবাজ অতীন। মুখে তার খুশির ছাপ।

খুঁটিপাড়ার খুঁটির মাথায় উড়তে-থাকা রংবেরঙের পতাকার দিকে তাকিয়ে গ্লাসে চুমুক দেয় অতীন, “মাত্র দু-বছর হয়েছে। কিন্তু তার মধ্যেই এত ওঠাপড়ার মধ্যে দিয়ে গিয়েছি যে মনে হচ্ছে একটা যুগ কেটে গেছে। তবে এত দিনের আশা-নিরাশা, হার-জিত পার হয়ে এইবারে মনে হচ্ছে, একটা শক্ত জমিতে এসে দাঁড়িয়েছি।”

ঘরের ভেতরে মাথাটা বাড়িয়ে দেয় অতীন, “তবে রাজেন, তুমি না থাকলে এতটা দূর আসা সম্ভব হত না। তোমার কাছে আমি আজীবন ঋণী থাকব।”

রাজেন, যাকে উদ্দেশ করে অতীনের কথাগুলো বলা, সে আর অন্য কেউ নয়, হোমিগঞ্জের রজত।

কাঠের দেওয়ালে হেলান দিয়ে বসে থাকে রজত। তার হাতেও ঠররার গ্লাস। ছড়ানো পায়ের পাশে একটা ঠররার বোতল।

একটা মৃদু হাসি খেলে যায় রজতের ঠোঁটে। কিন্তু সে কিছু বলে না।

কোথা থেকে একঝলক গানবাজনার শব্দ ভেসে আসে। গলার স্বর নামিয়ে আনে অতীন, “তোমায় একটা কথা জানিয়ে রাখি, রাজেন। আজ রাতে যদি সব প্ল্যানমাফিক ঠিকঠাক যায়, তাহলে আরও ক্ষমতা আমার হাতের মুঠোয়। ব্রিগেডিয়ার উজ্জ্বলের সঙ্গে আমার কথা হয়ে আছে।”

শব্দ করে ঠররার গ্লাসে চুমুক দেয় রজত। কোটরাগত, কালি-পড়া চোখ তুলে তাকায় অতীনের দিকে, “কাকে খুন করতে হবে?”

মাথা নিচু করে রজতের দিকে সরে আসে অতীন, "বিভূতি। হারামিটা কালকে কামানিয়া ফটকে আমাদের হাত ফসকে পালিয়েছে। আর পারলে অম্বরিষ। খানকির ছেলে পেছন থেকে আমাদের বিরুদ্ধে কলকাঠি নাড়ছে।"

ঠোঁটে ঠররার গ্লাস ঠেকিয়ে ওপর-নীচে মৃদু মাথা নাড়ে রজত। আরও নিচু হয়ে আসে অতীনের গলা, "অম্বরিষ কলম-পেষা আমলা। যত প্যাঁচপয়জার মাথায়, হাতিয়ার চালাতে জানে না। ওর জান নেওয়াটা খুব একটা কঠিন হবে না। কিন্তু বিভূতি পুরোনো ফৌজি, তলোয়ারবাজ বলে নাম আছে। ওকে মারাটা সহজ হবে না।''

জ্বলন্ত চোখে অতীনের দিকে তাকায় রজত। কিন্তু কিছু বলে না।

রজতের চোখের আগুন অতীনের নজরে পড়ে না, সে নিজের কথা বলে যায়, "ভেবেছিলাম, সোমনাথ আর বিপুলকে সঙ্গে নেব। তারপর ভেবে দেখলাম, তুমি থাকলে আর ওই গাঁওয়ার দুটোর দরকার পড়বে না।''

দরজার সামনের গলিটা দিয়ে নোংরা জামাকাপড়-পরা চার-পাঁচটা বাচ্চা পতাকা হাতে নিয়ে হইহই করতে করতে দৌড়ে যায়।

রজতের একেবারে কানের কাছে মুখ নিয়ে আসে অতীন, "সন্ধে ছ-টা, জলুষচকের ট্রাম টার্মিনাসে। দেরি কোরো না।"

আস্তানার পেছনদিকে আর-একটা ঘর। অন্ধকার, ঘুপচি। সেখানে মেঝেয় বসে একটা ছেঁড়া জামা সেলাই করে রিমা। তার পরনের পোশাক অপরিচ্ছন্ন, চোখ-মুখ বসে গেছে, কপালে দুশ্চিন্তার রেখা। তার সামনে কাঁথায় শুয়ে হাত-পা ছোড়ে একটা বাচ্চা ছেলে, তার সরু হাতে-পায়ে অপুষ্টির ছাপ স্পষ্ট বোঝা যায়।

ঘরের পাতলা কাঠের দেওয়ালে অন্যদিকের শব্দ আটকায় না। সুতরাং অতীন যত আস্তেই বলুক, তার সব কথাই রিমার কানে যায়।

খানিক বাদে অতীন চলে যাওয়ার শব্দ পায় রিমা। ঠররার গ্লাস আর বোতল হাতে ঘরে এসে ঢোকে রজত, মাটিতে বসে গ্লাসে চুমুক দেয়।

অপ্রসন্ন দৃষ্টিতে তার দিকে তাকায় রিমা, "সামান্য ক-টা পয়সার জন্যে তুমি একের পর এক মানুষ মেরে চলেছ।"

উত্তর দেয় না রজত। শব্দ করে গ্লাসে চুমুক দেয় কেবল।

হাতের কাপড়টা নামিয়ে রাখে রিমা, "প্রতিদিন তুমি কেমন আরও নির্দয়, আরও নির্মম হয়ে উঠছ।"

তা-ও কোনও উত্তর আসে না রজতের কাছ থেকে।

ঘরের একমাত্র জানলাটার কাছে গিয়ে দাঁড়ায় রিমা, "ভেবেছিলাম, তোমার নিজের একটা আখড়া হবে। তলোয়ারবাজি শিখিয়ে যা আয় হবে, তাতে অন্তত সচ্ছলভাবে থাকা যাবে।''

উত্তর না দিয়ে গ্লাসে ঠররা ঢেলে খালি বোতলটা একদিকে ছুড়ে ফ্যালে রজত। বোতলের আওয়াজে চমকে উঠে ছেলেটা কাঁদতে শুরু করে।

নিচু হয়ে ছেলেটাকে কোলে তুলে নেয় রিমা, "আমরা না হয় সমাজের আবর্জনা, কিন্তু এই বাচ্চাটা কী দোষ করেছে? আমার যা হয় হোক, কিন্তু এর কষ্ট দেখতে পারব না।"

ভাবলেশহীন কণ্ঠে রজত বলে, "তোমার কি আমার সঙ্গে থাকা পোষাচ্ছে না?"

"কী?" জ্বলন্ত দৃষ্টিতে রিমা তাকায় রজতের দিকে।

"আমাকে আবর্জনা বলছ যে!"

রজতের হিমশীতল কণ্ঠস্বরে রিমার শিরদাঁড়া দিয়ে কেমন একটা ঠান্ডা স্রোত বয়ে যায়। তার মনে পড়ে যায় যে তার থেকে দু-ফুট দূরে যে বসে আছে, সে একজন মায়ামমতাহীন খুনি। মানুষের প্রাণ নেওয়া আর একটা গাছের পাতা ছেঁড়ার মধ্যে তার কাছে বিশেষ পার্থক্য নেই। কয়েক বছর আগে কালভৈরব পাসের ছবিটা মনে পড়ে যায় রিমার। ছড়ানো-ছেটানো লাশের মাঝখানে রক্ত-ঝরা তলোয়ার হাতে দাঁড়িয়ে আছে রজত, মুখ তার বিকৃত এক অদ্ভুত হাসিতে।

সেদিন রিমা কালভৈরব পাসে কেবল নিজের পুরোনো জীবনই ফেলে আসেনি। মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করার, তাকে ব্যবহার করার তার যে স্বাভাবিক ক্ষমতা, সেটাও যেন সেইদিন সে কালভৈরব পাসেই রেখে এসেছে।

অথবা সে তার ক্ষমতা হারায়নি। মানুষের যেসব চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের ওপর সে নিজের ক্ষমতা প্রয়োগ করত— ভালোবাসা, দয়া, করুণা, মানবতা— রজতের মধ্যে তার সব ক-টাই অনুপস্থিত। একসময়ে এগুলোকে সে বিজনের দুর্বলতা ভাবত। আজ রজতের চোখের পেছনের উন্মত্ত শূন্যতার সামনে সেগুলোকেই বিজনের গুণ বলে মনে হয় তার।

ছেলেটাকে বুকে চেপে ধরে রিমা। মাঝেমধ্যে তার মনে হয়, সে রজতকে ছেড়ে চলে যাবে। হোমিগঞ্জ এড়িয়ে এশারগাঁওয়ে ফেরত যাবে তার মা-বাপের কাছে। কিন্তু রিমা জানে, সে যেতে পারবে না। বিজন আর চিরাগ আখড়ার ছেলেদের মৃত্যুর বদলা যারা নিতে চাইবে, তাদের প্রতিহিংসার আগুন থেকে তাকে আর তার ছেলেকে রক্ষা করতে পারে একমাত্র রজতই।

ছেলেটা তখনও কেঁদে চলেছে। পিঠ চাপড়ে তাকে ভোলাতে চেষ্টা করে, "কাঁদিস না বাবু। আজ বচ্ছরকার দিন, কিন্তু আমার এমন অবস্থা যে তোকে একটা জামা পর্যন্ত কিনে দিতে পারিনি।"

ছেলেকে কোলে নিয়ে ঘরের কোণে একটা দেরাজ খোলে রিমা, "চল, মহাকালের নামে ধূপ দিই। কী করবি বাবু বল, কোন অশুভ লগ্নে তোর জন্ম কে জানে, তুই-আমি দুজনেই কষ্ট পাচ্ছি।"

কিন্তু দেরাজ হাতড়ে ধূপ পায় না রিমা। ছেলেকে আবার শুইয়ে দিয়ে হাতের শূন্যের দিকে তাকিয়ে আপশোশের স্বরে বলে, "মাঝেমধ্যে মনে হয়, এসব যদি কিছুই না হত! যেমন বিজনের সঙ্গে ছিলাম, তেমনি যদি থাকতে পারতাম!"

হাতের গ্লাসটা ছুড়ে ফেলে দেয় রজত, আবার একটা আওয়াজ হয়।

হাতের উলটো পিঠ দিয়ে চোখের কোণ থেকে এক বিন্দু জল মোছে রিমা, "বিজনের ঘর করলে এই দারিদ্র্য, এই মনের কষ্ট সহ্য করতে হত না।"

"হুঁঃ!" একটা ব্যঙ্গের আওয়াজ করে মেঝেতে শুয়ে পড়ে রজত, "সাধে কি আর বলে, মেয়েরা সব স্বার্থপর!"

"কথাটা বলতে লজ্জা করল না?" জ্বলে ওঠে রিমা, "আজকের এই অবস্থার জন্যে তুমিই দায়ী। তোমার মতো একটা বদ লোক না থাকলে বিজন আজ বেঁচে থাকত। আমিও সুখে থাকতাম!"

"ভুল, ভুল!" নেশা-জড়ানো গলায় উত্তর দেয় রজত, "এ সব কিছুর মূলে তুমিই!"

"কী বললে?" বিস্মিত কণ্ঠে প্রশ্ন করে রিমা।

কনুইয়ে ভর দিয়ে মাথা তোলে রজত, "বিজনের মৃত্যুর জন্যে তুমিই দায়ী। তোমার জন্যে বিজনও মরল, আর আমারও সর্বনাশ হয়ে গেল।"

বিস্ফারিত চোখে রিমা তাকিয়ে থাকে রজতের দিকে। সে যেন নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছে না।

একটা কদাকার ব্যঙ্গের হাসি খেলে যায় রজতের মুখে, "রিমা বলে একটা মেয়ের জন্যে সাদামাটা খেলার ম্যাচ পালটে গেল জীবন-মরণের ডুয়েলে।"

কিছু বলতে গিয়েও বলতে পারে না রিমা, পাংশু মুখে তাকিয়ে থাকে রজতের দিকে।

কুৎসিত হাসিটা আরও ছড়িয়ে পড়ে রজতের মুখে, "সেদিন প্রতিশোধস্পৃহায় বিজনের তলোয়ার যেন প্রাণ পেয়েছিল। আর আমার তলোয়ারেও যেন ভর করেছিল একটা স্বার্থপর মেয়ের অশুভ শক্তি।"

রজতের গলা থেকে বেরিয়ে আসে একটা ভয়ানক হাসি, "এ সব কিছুর মূলে রিমা বলে একটি বজ্জাত মেয়েছেলে!"

রজতের হাসিতে যেন কণ্ঠস্বর ফিরে পায় রিমা, দু-হাত মুঠো করে চেঁচিয়ে ওঠে, "কথাগুলো মুখে আটকাচ্ছে না?''

হাসি বন্ধ হয় না রজতের। ব্যঙ্গের স্বরে সে বলে, "তুমি একটা অপয়া, দুশ্চরিত্র মেয়েছেলে! একটা ডাইনি!"

ধৈর্যের বাঁধ ভাঙে যেন রিমার। হাতিয়ার র‍্যাক থেকে রজতের তলোয়ারটা তুলে নিয়ে সে দৌড়ে যায় শুয়ে-থাকা ছেলের দিকে, "ডাইনি! বেশ তা-ই সই! চল বাবু, তোকে মারি, মেরে নিজের গলায় ছুরি দিই। এই রোজের যন্ত্রণা আর সহ্য হয় না।"

লাফিয়ে উঠে রিমাকে এক হাত দিয়ে জাপটে ধরে রজত। অন্য হাতে তলোয়ার কেড়ে নিয়ে তাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয় দূরে, "তোমার এইসব ফালতু নৌটঙ্কি বন্ধ করো।"

তলোয়ার কোমরবন্ধে গোঁজে রজত। কর্কশ স্বরে বলে, "তুমি মরো কি বাঁচো, আমার কিছু যায় আসে না! বুঝলে?"

দুজনের ঝগড়ার শব্দে জেগে উঠে কাঁদতে আরম্ভ করে ছেলেটা।

সেদিকে না তাকিয়ে হনহন করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায় রজত।

ঝগড়া করে বেরিয়ে এলেও রিমার কয়েকটা কথা রজতের মনের মধ্যে বিঁধতে থাকে। গত দু-বছরে অতীনের কথায় সে হেন খুনখারাপি নেই, যা করেনি। মূলত তার ক্ষমতার ওপর ভর করেই কওমি পলটনে অতীনের উত্থান। কিন্তু তার বিনিময়ে তার আর্থিক লাভ হয়েছে যৎসামান্য। হোমিগঞ্জ ছাড়ার পর থেকে দারিদ্র্য আর অনটন তার নিত্যসঙ্গী হয়ে দাঁড়িয়েছে। রিমা ভুল বলেনি, একটা আখড়া খুলতে পারলে অন্তত সচ্ছল অবস্থায় তার দিন কাটতে পারে।

এলোমেলো ভাবতে ভাবতে পথ হাঁটতে হাঁটতে রজত খেয়াল করে, সে একটা অচেনা পাড়ার গলিতে এসে পড়েছে। এবার কোনদিকে যেতে হবে, সে ভাবছে, হঠাৎ তার কানে আসে একটা অতি পরিচিত শব্দ। কাঠের তলোয়ারের ঠোকাঠুকির আওয়াজ।

হৃৎপিণ্ডটা লাফিয়ে ওঠে রজতের। কাঠের তলোয়ার! তার মানে এখানে কোনও আখড়া আছে। আখড়ার ওস্তাদের সঙ্গে দু-হাত মহড়া নিলে যদি তার পছন্দ হয় তাহলে হয়তো তলোয়ারবাজি শিখিয়ে কিছু বাড়তি আয় হতে পারে।

গলি থেকে বেরোনোর কথা ভুলে গিয়ে আওয়াজ লক্ষ্য করে খুঁজে খুঁজে রজত অবশেষে একটা বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ায়। বাড়ির ফটকে ছোট ছোট অক্ষরে লেখা 'অনির্বাণ আখড়া'।

দরজার সামনে মোতায়েন দরোয়ানকে রজত বলে, "আমি একজন তলোয়ারবাজ। তোমাদের ওস্তাদকে বলো, আমি একটা ম্যাচ খেলতে চাই।"

বাড়ির ভেতরে ঢুকে কিছুক্ষণ বাদে ফেরত আসে লোকটা, "আপনাকে ভেতরে ডাকছে।"

আখড়ার ভেতরে এসে দাঁড়ায় রজত। একটা বড় হলঘর, দেওয়ালের মাথায় বসানো জানলা দিয়ে আলো এসে পড়ে কাঠের মেঝেতে। ঘরে সার দিয়ে বসে নবিশের দল। এক প্রান্তে একটা ছোট উঁচু প্ল্যাটফর্ম, তার ওপর হাঁটু মুড়ে বসে আখড়ার ওস্তাদে। তাঁর কামানো মাথা, হাতের মালা আর বসার ভঙ্গি দেখে তাঁকে তলোয়ারবাজের বদলে ভিক্ষু মনে হয়।

ঘরের কোণে জালার মতন বিশাল ফুলদানি। তার ফুলের মিষ্টি সুগন্ধের সঙ্গে মেশে ধূপের হালকা সুবাস। দেওয়ালের গায়ে বসানো একটা জলের গামলায় শামুক বাঁশের নল থেকে শব্দ করে জল পড়ে।

রজতের মনে হয়, আখড়ার বদলে সে ভুল করে কোনও মঠে ঢুকে পড়েছে।

জানুর ওপর দুই হাত রেখে মাথা নিচু করে সম্ভ্রম জানান আখড়ার ওস্তাদ, "আমি কিষেনপ্রতাপ। বলুন কী চান!"

মাথা ঝোঁকায় রজতও। "আমার নাম রাজেন, ছোটখাটো তলোয়ারবাজের কাজ করি। পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম, আপনার আখড়াটা চোখে পড়ল। অনেকদিন কোনও আখড়ায় যাই না, ভাবলাম, যদি আপনার সঙ্গে দু-একটা ম্যাচ খেলা যায়।"

সামান্য হাসেন কিষেনপ্রতাপ, "দেখুন, কিছু মনে করবেন না। আমাদের এখানে নিয়মকানুন একটু কড়া। আমার সঙ্গে লড়ার আগে আপনাকে আমার কোনও শাগির্দের সঙ্গে একবার লড়তে হবে।"

মাথা ঝোঁকায় রজত, "অবশ্যই! বলুন, কার সঙ্গে লড়তে হবে।"

বসে-থাকা নবিশদের সারির দিকে তাকান কিষেনপ্রতাপ, "বৈজু!"

একজন উঠে আসে। বছর উনিশ-কুড়ি বয়স, একটু খাটো গড়ন, মুখে একটা সরল ছেলেমানুষি ভাব।

অপ্রসন্ন দৃষ্টিতে রজত তার দিকে তাকায়।

রজতের মুখের চেহারাটা কিষেনপ্রতাপের নজর এড়ায় না। মৃদু হেসে তিনি বলেন, "বয়স হয়তো কম, কিন্তু বৈজু আখড়ার পহেলা শাগির্দ। আমার ডান হাত বলতে পারেন।''

মাথা ঝোঁকায় রজত, তার মুখে একটা হালকা ব্যঙ্গের হাসি, "আমার সৌভাগ্য!"

কাঠের তলোয়ার হাতে মুখোমুখি দাঁড়ায় বৈজু আর রজত। মাথা ঝুঁকিয়ে পরস্পরকে সম্মান জানিয়েই ফটক তরিকায় পজিশন নেয় দুজনেই। ডান পা সামনে, বাঁ পা পেছনে, তলোয়ার দু-হাতে বাড়ানো, তলোয়ারের ডগা প্রতিপক্ষের চোখের দিকে তাক করা।

বৈজু প্রথমে কিছুটা ইতস্তত করে। তার তলোয়ারের ডগাটা এদিক-ওদিক নড়ে, যেন সে মনস্থির করতে পারছে না, ঠিক কীভাবে আক্রমণ করবে।

তার দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে দ্যাখে রজত। তারপর সে তার শরীর ঢিলে করে দেয়। তার তলোয়ারের ডগা মেঝের কাছে নেমে আসে, কাঁধ দুটো ঝুঁকে পড়ে, মাথাটা সামনের দিকে নুয়ে পড়ে।

ওস্তাদ কিষেনপ্রসাদের মুখে একটা বিস্ময়ের ছাপ ফুটে উঠেই মিলিয়ে যায়। তাঁর কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়ে।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে রজতের দিকে তাকিয়ে তলোয়ার তুলে ধীরে ধীরে এগোয় বৈজু। রজত তাকে আক্রমণ করার চেষ্টাও করে না, সে-ও ধীরে ধীরে পেছোতে থাকে।

কয়েক কদম এগিয়ে পেছোতে আরম্ভ করে বৈজু, তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে বুঝতে চেষ্টা করে রজতের কায়দাটা। কয়েক পা এগিয়ে আবার দাঁড়িয়ে পড়ে রজত। তার শরীরটা আরও শিথিল হয়, কাঁধ দুটো আরও ঝুঁকে পড়ে। তার তলোয়ারের হাতল-ধরা বাঁ হাতের মুঠোটা উঠে আসে বাঁদিকে পাঁজরের কাছে, তলোয়ারের ফলা ডানদিকের হাঁটুর ওপর দিয়ে বেঁকে থাকে ডানদিকে।

কপালের ভাঁজগুলো আরও গভীর হয় কিষেনপ্রসাদের।

নিস্তব্ধ ঘরে শোনা যায় কেবল জল পড়ার আওয়াজ। চোখ সরু করে রজতের তলোয়ারবাজির কায়দাটা বোঝার চেষ্টা করে বৈজু। তার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটে ওঠে।

কয়েক পা এগোয় বৈজু। তার সঙ্গে তাল রেখে পেছোয় রজত। কাঠের মেঝেতে পা ঘষার শব্দ শোনা যায় জলের আওয়াজ ছাপিয়ে।

আবার এগোয় বৈজু। পিছিয়ে যায় রজত।

তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে দুজনের দিকে তাকিয়ে থাকেন কিষেনপ্রতাপ।

প্রায় মিনিট দুয়েক পিছু হটা অব্যাহত থাকে রজতের। কিন্তু অবশেষে তার পিঠ ঠেকে যায় ঘরের একটা থামে। তার তলোয়ার-ধরা দুই মুঠো উঠে আসে বুকের কাছে। তলোয়ারের কাঠের ফলা ডানদিকে ফেরানো, মেঝের সঙ্গে সমান্তরাল করে ধরা।

সুযোগ পেয়ে আক্রমণ করে বৈজু। তার তলোয়ার কিছুটা ডানদিকে বেঁকে ছুটে আসে রজতের বাঁ কাঁধ লক্ষ্য করে।

মুহূর্তের মধ্যে রজতের তলোয়ারের ফলা হাতের মোচড়ে তার শরীরের ডানদিক থেকে উঠে আসে বাঁ কানের কাছে।

রজতের তলোয়ারে ধাক্কা খেয়ে প্রতিহত হয় বৈজুর তলোয়ারের গতি। কাঠে কাঠে টক্করের আওয়াজটা নিস্তব্ধ ঘরে বাজ পড়ার মতো ছড়িয়ে যায়।

বৈজুর তলোয়ারের মার আটকেই রজতের তলোয়ার নেমে আসে তার ডানদিকের পাঁজর লক্ষ্য করে। হাত বেঁকিয়ে কোনওমতে মারটা আটকায় বৈজু। আরও একবার কাঠের তলোয়ার ঠোকার আওয়াজ ওঠে।

"ম্যাচ! রাজেন জিতে গেছে!'' তলোয়ার ঠোকার আওয়াজ মেলাতে-না মেলাতেই ওস্তাদ কিষেনপ্রতাপের গলার আওয়াজ ছড়িয়ে যায় ঘরে।

রজতকে ফেলে লম্বা পায়ে বৈজু এগিয়ে আসে কিষেনপ্রতাপের দিকে। মুখে তার অপ্রসন্নতার ছাপ— "ওস্তাদ, আর-একবার সুযোগ দিন।"

"না!'' কঠিন দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে বলেন কিষেনপ্রতাপ, "কোনও প্রয়োজন নেই। ম্যাচ শেষ।"

চোয়াল শক্ত করে একপাশে বসে পড়ে বৈজু।

মৃদু হেসে রজতের দিকে তাকান কিষেনপ্রতাপ, "রাজেন, আপনার তলোয়ারবাজির কায়দা দেখছি একদম স্বতন্ত্র। কোথায় শিখেছেন?"

"আমার বাবার কাছে। এইটুকুই শিখেছি। এর চাইতে বেশি জানি না।" বেশি কথা না বাড়িয়ে কিষেনপ্রতাপের সামনে এসে দাঁড়ায় রজত, "আপনি যদি আমাকে শেখান তো ভালো হয়।"

উত্তর না দিয়ে চুপ করে থাকেন কিষেনপ্রতাপ। যেন কথাটা তিনি শুনতেই পাননি।

রজতের ঠোঁট বেঁকে যায়, "আপনার আখড়ার নিয়ম অনুযায়ী আপনার শাগির্দের সঙ্গে একহাত মহড়া নেওয়া হয়ে গেছে। এবার আপনার সঙ্গে একটা ম্যাচ খেলতে চাই।"

"তার কোনও প্রয়োজন নেই। তলোয়ারবাজিতে আমি আপনার সঙ্গে পেরে উঠব না।" সামান্য হেসে উত্তর দেন কিষেনপ্রতাপ, "তা ছাড়া আমার বয়স হয়েছে, ছেলেদের শেখানোর বাইরে তলোয়ারবাজি করা অনেকদিন ছেড়ে দিয়েছি।"

কিষেনপ্রতাপের চোখে চোখ রাখে রজত। তার কালি-পড়া চোখের পেছন থেকে এক ক্ষুধিত তুফান যেন প্রলয়ের শাসানি দেয়।

চোখ সরান না কিষেনপ্রতাপ। ইস্পাতশীতল দৃষ্টিতে তিনিও তাকিয়ে থাকেন রজতের চোখের দিকে।

সময় যেন থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। পরস্পরের দিকে চোখ রেখে পাথরের মূর্তির মতো জমে যায় দুটি মানুষ। যেন ইন্দ্রিয়ের অগোচর কোনও দুনিয়ায় এক অজানা দ্বৈরথে লিপ্ত দুজনেই। সাধারণের সেখানে প্রবেশাধিকার নেই।

বিস্মিত চোখে দুজনের দিকে তাকিয়ে থাকে বৈজু।

কিছুক্ষণ বাদে ধৈর্যের বাঁধ ভাঙে রজতের। ব্যঙ্গে মুখ বিকৃত করে কাঠের তলোয়ারটা ছুড়ে ফেলে দিয়ে সে বেরিয়ে যায় আখড়া থেকে।

৬

“আমি এক-পা এগোলাম, ও এক-পা পেছোল। আমি আবার এগোলাম, ও তলোয়ার নামিয়ে নিল। এটা কী ধরনের তলোয়ারবাজি?” কাপড়-মোড়া কাঠের তলোয়ার ঘাড়ে ফেলে আখড়া থেকে বাড়ির পথে হাঁটতে হাঁটতে নিজের মনেই বিড়বিড় করে বৈজু। গান গাইতে গাইতে পাশ দিয়ে একটা বিজয় উৎসবের মিছিল যায়, কিন্তু বৈজুর নজর সেদিকে যায় না। যে মাথা নিচু করে দুপুরের ম্যাচের কথা ভাবতে ভাবতে পতাকা আর ফুলে সাজানো পথ দিয়ে হাঁটে।

মাথার ওপর কড়কড় আওয়াজ করে মেঘ ডাকে। আর সঙ্গে সঙ্গেই অম্বালিকার নীলচে-সবুজ আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নেমে আসে। মুশলধার বৃষ্টির মধ্যে মিছিলটা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়, যে যেদিকে পারে, দৌড়ে পালায়।

বৃষ্টি থেকে বাঁচতে ছুট লাগায় বৈজুও, কিন্তু রাস্তায় বিজয় উৎসবের ভিড়। বড়রাস্তার কোনও বাড়ির নীচেই দাঁড়ানোর জায়গা নেই। ছুটতে ছুটতে একটা গলির মধ্যে ঢুকে একটা বাড়ির ফটকের ছাউনির নীচে কোনওমতে গুটিশুটি হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে সে। বাড়ির নীচে একটা ফুলের দোকান। তার জানলায় বসানো রংবেরঙের ফুলের টব আর সাজিগুলো বৃষ্টির জলে ভেজে। ফটকের পেছনের বাড়িটার দোতলার বারান্দায় বসে একটা রামধনু ফিঙে অনবরত ডেকে চলে।

ওপরে একটা শব্দ হয়। মাথা তুলে বৈজু দ্যাখে, একটা মেয়ে বারান্দাটার কাঠের কপাটগুলো বন্ধ করছে। আশ্রয়হারা হয়ে প্রতিবাদের কয়েকটা স্বর তুলে উড়ে গিয়ে ধোঁয়াটে বৃষ্টির মধ্যে হারিয়ে যায় রামধনু ফিঙেটা।

বৃষ্টি হঠাৎ আরও বেড়ে যায়। ফটকের ওপর ছাউনিতে আর বৃষ্টি আটকায় না, বৃষ্টির ছাট লেগে ভিজতে থাকে বৈজু।

ফটকটা হঠাৎ ফাঁক হয়ে যায়। একটা মেয়েলি গলায় কে বলে, “বাইরে দাঁড়িয়ে ভিজছেন কেন? আসুন, ভেতরে এসে বসুন।”

তাকিয়ে বৈজু দ্যাখে, একটু আগে সে যাকে বারান্দায় দেখেছিল, সেই মেয়েটা। টানা টানা চোখ, টোল-পড়া গাল, মিষ্টি মুখটাতে মাখানো একটা ততোধিক মিষ্টি হাসি। বয়সে তার চাইতে কয়েক বছরের ছোটই হবে।

সকালেই যে বৈজু তার ওস্তাদের একডাকে একজন অচেনা তলোয়ারবাজের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে পড়েছিল, সে হঠাৎ তার সমবয়সি একটা মেয়েকে দেখে এমন ঘাবড়ে যাবে, কে জানত! কুণ্ঠিত স্বরে সে বলে, "না, না, আমি ঠিক আছি। অসুবিধে হচ্ছে না।"

ফটকটা আরও খুলে দেয় মেয়েটা, "কোথায় ঠিক আছেন? ভিজে চান করে গেছেন, ঠান্ডা লাগবে তো। আসুন, ভেতরে আসুন।"

কী বলবে, বুঝতে পারে না বৈজু, সে যেন হঠাৎ কথা বলার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে। চুপচাপ মেয়েটার পেছন পেছন ভেতরে পা রাখে।

ফটকের পর একটা ছোট উঠোন পেরিয়ে বাড়িতে ঢোকে মেয়েটা। একটা কাঠের বেঞ্চি দেখিয়ে বলে, "বসুন।"

ইতস্তত করে বৈজু, "আমার জামাকাপড় সব ভিজে, আপনাদের ঘর নোংরা হয়ে যাবে।''

"ও কিছু হবে না। আমি মুছে দেব।" একটা তোয়ালে বাড়িয়ে ধরে মেয়েটা, "নিন, মাথা মুছে নিন।''

তলোয়ার ধরতে যার হাত কাঁপে না, তার তোয়ালেটা নিতে কেমন হাত কেঁপে যায়।

মেয়েটার নজর এড়ায় না। ''আপনার বেশ ঠান্ডা লেগেছে দেখছি। দাঁড়ান, একটু চা দিই আপনাকে।"

একটা টেবিলে রাখা পট থেকে কাপে চা ঢালে মেয়েটা। তাকে আড়চোখে তাকিয়ে দ্যাখে বৈজু। তার নিজের ব্যবহারে সে নিজেই আশ্চর্য হয়। আজ পর্যন্ত কোনও তলোয়ারবাজের সামনে দাঁড়াতে তাকে দুবার ভাবতে হয়নি, কিন্তু আজ এই মেয়েটার কাছে এসে তার হৃৎপিণ্ডটা এমন জোরে কেন ধুকপুক করছে, সে নিজেই বুঝতে পারে না।

চায়ে চুমুক দিচ্ছে বৈজু, বাড়ির দোতলা থেকে নারীকণ্ঠ ভেসে আসে, "কার সঙ্গে কথা বলছ মিতা?"

"কেউ না, হুজরাইন,'' মাথা তুলে উত্তর দেয় মিতা, "একজন বৃষ্টিতে আটকে পড়েছিল, তার সঙ্গে।"

"একবার ওপরে শুনে যেয়ো।"

"আসছি, হুজরাইন।'' উত্তর দিয়ে বৈজুর দিকে তাকায় মিতা। তার দৃষ্টিতে কিছুটা ভয় আর উদ্‌বেগ নজর এড়ায় না বৈজুর। চায়ের কাপটা মিতাকে ফেরত দেয় সে, "আমি আসি। বৃষ্টি ধরে এসেছে।"

বৃষ্টির মধ্যেই ভিজতে ভিজতে পথ হাঁটে বৈজু। তার মাথা থেকে তখন তলোয়ারবাজির প্যাঁচের সব চিন্তা বেমালুম উধাও হয়ে গেছে।

৭

একটা টেবিলের পেছনে একটা খাতায় কী লেখেন শুভা। টেবিলে অ্যাশট্রেতে রাখা একটা পাইপ থেকে কুণ্ডলী পাকিয়ে নীলচে ধোঁয়া ওঠে। তার কটু গন্ধ মেশে বাইরে থেকে আসা বৃষ্টির ভিজে গন্ধে।

মিতা এসে দাঁড়ায় সামনে, "হুজরাইন!"

"কার সঙ্গে কথা বলছিলে মিতা?" টেবিলে থেকে চোখ তুলে প্রশ্ন করেন শুভা।

ঢোঁক গেলে মিতা "চেনা কেউ না, হুজরাইন। বৃষ্টিতে ভিজছিল তাই ভেতরে আসতে বলেছিলাম।"

"জানলা দিয়ে দেখে মনে হল কোনও আখড়ার নবিশ।" গম্ভীর কণ্ঠে বলেন শুভা, "এবার থেকে এইসব নিম্নশ্রেণির লোকজনের সঙ্গে আর মিশো না। তোমার জন্যে আমি বড় ঘরে কাজের ব্যবস্থা করেছি।"

"আচ্ছা হুজরাইন!" মাথা নিচু করে বলে মিতা।

টেবিলে থেকে পাইপটা তুলে মুখে দেন শুভা, "হ্যাঁ। সেনেটর কৃষ্ণেন্দুর মহলে তোমার জন্যে একটা কাজ জোগাড় করেছি। এবার থেকে তুমি ওখানেই কাজ করবে। একবার যদি সেনেটরের নজরে পড়ে যাও তাহলে আর সারাজীবন কোনও দুঃখকষ্ট থাকবে না।"

"কিন্তু হুজরাইন, আমি এখানেই ভালো আছি। ওখানে যেতে মন চাইছে না।" ভয়ে ভয়ে বলে মিতা।

“মিতা!” মুখ থেকে পাইপ নামিয়ে বার দুয়েক সজোরে অ্যাশট্রেতে ঠোকেন শুভা, “মুখে মুখে তর্ক কোরো না। আজ দু-বছর হল তোমাকে কাজ শেখাচ্ছি। তুমি কি এখনও ছেলেমানুষ আছ? এবার তোমার নিজের পায়ে দাঁড়ানোর সময় এসেছে।”

ভয়ে কুঁকড়ে যায় মিতা। মুখ নামিয়ে তাকিয়ে থাকে মেঝের দিকে। তার চোখের কোণে জল চিকচিক করে।

মিতা হয়তো আর-একবার ধমক খেত, কিন্তু তার আগে বাড়ির এক বুড়ি কর্মচারী ঘরে এসে হাজির হয়।

“হুজরাইন, রবি এসেছে।”

“রবি!” বিরক্তি ঝরে পড়ে শুভার কণ্ঠে, “এ লোকটা ছ-মাসে, ন-মাসে একবার করে মুখ দেখাতে আসে কেন কে জানে! যাও, পাঠিয়ে দাও।”

“হুজরাইন, রবি নীচে রান্নাঘরে বসে আছে। বলল যে বৃষ্টিতে ভিজে গেছে, ওপরে এলে হুজরাইনের ঘর নোংরা হবে, তাই যদি মিতাকে নীচে পাঠিয়ে দেন, ভালো হয়। আর আপনার জন্যে এটা পাঠিয়ে দিল।”

একটা ছোট ভেলভেটের বটুয়া শুভার দিকে বাড়িয়ে ধরে বুড়ি কর্মচারী।

বটুয়াটা খোলেন শুভা। ভেতরে একটা রুপোর ফুল-তোলা ব্রোচ, দামি পাথর বসানো।

মুহূর্তের মধ্যে শুভার ব্যবহার পালটে যায়। একটা চওড়া হাসি খেলে যায় তাঁর মুখে, “হ্যাঁ হ্যাঁ, সেই ভালো কথা। অবেলায় ঘর ভিজলে আবার কাজ বাড়বে। মিতা, যাও। তোমার কাকা অনেকদিন বাদে এসেছে।”

শুভার কাছ থেকে ছাড়া পেয়ে তাড়াতাড়ি নীচে নেমে আসে মিতা।

রান্নাঘরে উনুনের পাশে বসে হাত স্যাঁকে রবি। একটা আংটায় ঝোলানো তার ভিজে জোব্বাটা থেকে টপটপ করে জল পড়ে।

আনন্দে মিতার মুখটা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, “ওঃ কাকা, তুমি একেবারে ভিজে গেছ!”

চওড়া একটা হাসি খেলে যায় রবির মুখেও, “ও কিছু না। আমি ফেরিওয়ালা মানুষ, রোদে পোড়া, জলে ভেজা, ও আমার খুব অভ্যেস আছে। বোসো বোসো মিতা।”

মিতা অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে বসে না, একটা তোয়ালে এনে রবির হাতে ধরিয়ে দেয়, “আগে মাথাটা মুছে নাও কাকা। ঠান্ডা লেগে যাবে।”

মাথা মুছতে মুছতে মিতার দিকে হাসিমুখে তাকায় রবি, "ওঃ! সেই আট মাস আগে তোমায় দেখেছি। তার মধ্যেই মনে হচ্ছে, তুমি কত বড় হয়ে গেছ। মাঝেমধ্যে ভাবি, তোমাকে আমার কাছে রাখি, কিন্তু রাস্তায় রাস্তায় মাল ফেরি করে বেড়াই, কী করে তোমার দেখাশোনা করব। সেইজন্যে—''

কথা শেষ না করেই উনুনের আগুনে একটা পাইপ ধরায় রবি, "তবে মিতা, যেখানেই থাকি-না কেন, তোমার চিন্তা সবসময়ে মাথায় থাকে।"

এদিক-ওদিক তাকিয়ে গলার স্বর নামিয়ে মিতা বলে, "কাকা, তোমায় একটা কথা বলার ছিল।"

পাইপ থেকে ধোঁয়া টানে রবি। কড়া তামাকের গন্ধ ছড়িয়ে যায় রান্নাঘরে, "হ্যাঁ, হ্যাঁ বলো। কী, কোনও সুন্দর দেখতে ছেলেকে মনে ধরেছে বুঝি?"

"না, না কাকা!'' কেমন যেন চমকে ওঠে মিতা, "ওসব কিছু না! বলছি কাকা, হুজরাইন আমাকে সেনেটর কৃষ্ণেন্দুর মহলে কাজে পাঠাচ্ছেন।"

"সেনেটর কৃষ্ণেন্দু!'' কী যেন চিন্তা করে রবি, "ওঃ আচ্ছা! সেনেটর সুখেন্দুর ছেলে! ওঃ, তিনি তো মস্ত বড় মানুষ। মহলে অনেক কাজের লোক। কাজ দেখাতে পারলে তো অনেক উন্নতি করতে পারবে।"

একটা হাসি খেলে যায় রবির মুখে, "আর এই হুজুরাইনের কাছে কে আর আসে? সেনেটরের মহলে কত লোকের যাওয়া-আসা। সেখানে হয়তো কোনও ছেলেকে তোমার ভালো লেগে গেল! বিয়েশাদিও তো একদিন করতে হবে, না কী?"

মুখ শুকিয়ে যায় মিতার। সে হয়তো রবির এইরকম প্রতিক্রিয়া আশা করেনি। মাথা নিচু করে বলে, "কিন্তু কাকা—''

হাসিমুখে রবি বলে, "কিন্তু কী, মিতা?"

মাথা নাড়ে মিতা, "না কাকা, কিছু না।"

বাড়ির অন্য কাজের লোকেদের মুখে সে বড় মানুষ সেনেটরদের সম্বন্ধে কানাঘুষো কিছু শুনেছে, কিন্তু সে কথা সে রবিকে মুখ ফুটে বলতে পারবে না।

রাত হয়ে গেছে। কিন্তু প্রবল গর্জন করে ঝরে চলে বৃষ্টি। ট্রাম টার্মিনাসের সামনের রাস্তা দিয়ে নদীর মতো বয়ে যায় জলস্রোত। মাথার ওপরে ট্রামলাইনের ওপর কাচের তালের মতো ইঞ্জিনটা গুঞ্জন তুলে কাঁপে। বৃষ্টির ধারায় তার নীল দ্যুতি দেখায় জ্যোতির্বলয়ের মতো। ইঞ্জিনের পেছনের অন্ধকার ফাঁকা কামরা দুটোর ছাদ থেকে জলপ্রপাতের মতো জল গড়িয়ে পড়ে।

ট্রামলাইনের ওঠার সিঁড়ির নীচে একটা ছোট গুমটিতে অপেক্ষা করে রজত। তার পায়ের কাছে ম্লান নীল আলো ফ্যালে একটা ক্রিস্টাল লণ্ঠন।

জলের ওপর দিয়ে দৌড়োনোর ছপছপ শব্দ ওঠে। একটু বাদেই ছাতা বন্ধ করতে করতে গুমটিতে এসে ঢোকে অতীন, "তৈরি থাকো। দুজনেই এদিকে আসছে। অম্বরিষ আর বিভূতি দুজনেই একসঙ্গে সেরেস্তা থেকে বেরিয়েছে। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই এসে পড়বে।"

উঠে দাঁড়ায় রজত।

"কোথায় যাচ্ছ?'' প্রশ্ন করে অতীন।

"আমি ওপরে প্ল্যাটফর্মে যাচ্ছি। তুমি নীচে একজনকে আটকে রেখো। ওপরের জন আমার।"

অন্ধকার জনহীন প্ল্যাটফর্মের একটা বেঞ্চে বসে খাপ থেকে তলোয়ার বের করে রজত। তলোয়ারের ডগা মাটিতে ঠেকিয়ে হাতল ধরে রাখে এক হাতের মুঠোয়। বিরামহীনভাবে বৃষ্টি পড়তে থাকে, ভিজতে থাকে রজত।

খানিক বাদে আবার জলের ওপর দিয়ে হাঁটার শব্দ হয়। বৃষ্টির ধারার মধ্যে দিয়ে দুজন হেঁটে আসে। লণ্ঠন নিভিয়ে দিয়ে গুমটির অন্ধকার থেকে লক্ষ রাখে অতীন।

বৃষ্টির শব্দ ছাপিয়ে ট্রামের ইঞ্জিন হুইস্‌ল শোনা যায়। ট্রাম ছাড়ার সময়ে হয়ে এসেছে। লোক দুজন হাঁটার গতি বাড়িয়ে দেয়, তবে তার মধ্যে একজন কিছুটা পিছিয়ে পড়ে।

হনহন করে হেঁটে একজন যখন সিঁড়ি দিয়ে উঠছে, অন্যজন তখনও গুমটির কাছে। গুমটির ভেতর থেকে মাথা বাড়িয়ে অতীন ডাক দেয়, "হুজুর! অম্বরিষ, হুজুর!"

থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে লোকটা, "কে?"

উত্তর দেয় না অতীন, গুমটি থেকে বেরিয়ে এসে দু-হাতে তার জামা ধরে হিড়হিড় করে তাকে টেনে ফেলে দেয় গুমটির ভেতরে মেঝেতে। তারপর অন্ধকারের মধ্যেই তার

ওপর তলোয়ারের কোপ মারতে থাকে এলোপাথাড়ি। অবিশ্রান্ত বৃষ্টির শব্দে তার আর্তনাদ দ্বিতীয় ব্যক্তির কানে পৌঁছোয় না।

দ্বিতীয়জন প্ল্যাটফর্মে উঠে ট্রামের কামরার দিকে যাচ্ছে, বেঞ্চে বসা রজত প্রশ্ন করে, "বিভূতি সাব, আপনি নাকি ফৌজে নামকরা তলোয়ারবাজ ছিলেন?"

উত্তর দেওয়ার বদলে রজতের দিকে ঘুরে খাপ থেকে তলোয়ার টেনে বের করার চেষ্টা করে দ্বিতীয় ব্যক্তি। কিন্তু তার আগেই লাফিয়ে ওঠে রজতের তলোয়ার, তার তলপেট থেকে বুক অবধি চিরে দেয়। প্ল্যাটফর্মে আছড়ে পড়ে বিভূতির দেহ, বৃষ্টির জলে মিশতে থাকে তার রক্ত।

নীচে নেমে আসে রজত। গুমটির ভেতর লণ্ঠনের নীল আলো জ্বলে। মেঝেয় জল, কাদা আর রক্তে মাখামাখি হয়ে পড়ে অম্বরিষের কোপানো দেহ, তার একদিকে দাঁড়িয়ে হাঁপায় অতীন। রজতকে দেখে জিজ্ঞাসার ভঙ্গিতে চোখ তোলে সে, "হয়ে গেছে?"

নীরবে ওপর-নীচে মাথা নাড়ে রজত।

লণ্ঠনটা তুলে ধরে অতীন, "চলো!"

লণ্ঠনের আলোতে হঠাৎ কিছু চোখে পড়ে রজতের। হাত তুলে অতীনকে নিরস্ত করে সে অম্বরিষের লাশের পায়ের দিকে ঝুঁকে দ্যাখে।

অতীনের তলোয়ারের কোপে অম্বরিষের একটা পায়ের পাতা প্রায় দু-টুকরো হয়ে গেছে। সেখান জুতো আর পায়ের পাতার ফাঁকে আঙুল ঢুকিয়ে কিছু একটা টেনে বের করে তুলে ধরে রজত।

কপালে ভাঁজ পড়ে অতীনের, "ফোটোক্রিস্টাল! জুতোর মধ্যে লুকোনো ছিল!"

লণ্ঠনের ক্রিস্টাল বের করে তার মধ্যে ফোটোক্রিস্টালটা ভরে দেয় অতীন। গুমটির দোয়ালের গায়ে একটা চতুষ্কোণ আলোর ছবি পড়ে। কয়েকটা চিঠির ছবি।

চিঠিগুলো পড়তে থাকে অতীন। বিস্ফারিত হয়ে ওঠে তার চোখ, মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে গালাগালি, "হারামির বাচ্চা উজ্জ্বল দু-দিকেই খেলছে!"

উত্তর না দিয়ে কপাল কোঁচকায় রজত, বৃষ্টির আওয়াজের মধ্যেও তার কানে অন্য একটা শব্দ এসেছে।

শব্দের কারণটা বুঝতে রজতের কয়েক সেকেন্ড লাগে। আচমকা সে অতীনের জামাটা মুঠো করে ধরে একটানে নিয়ে আসে গুমটির বাইরে, তারপর তাকে নিয়ে ঝাঁপ দেয়

জলকাদার মধ্যে।

পরের মুহূর্তে তার পেছনে গুমটিটা সশব্দে উড়ে যায় এক নীল বিস্ফোরণে।

"মিসাইল!" অতীনের কানের কাছে মুখ এনে রজত বলে।

মাথা নাড়ে অতীন, "কোথায়?"

আঙুল তোলে রজত। বেশ অনেকটা দূরে, যেখানে মাথার ওপর ট্রামলাইনটা বাঁক নিয়েছে, সেখানে ট্রামলাইনের একটা থামের কাছে বৃষ্টির ঝাপসা চাদরের পেছনে একটা ছায়ামূর্তি নজরে পড়ে।

কী করবে, বোঝার চেষ্টা করে রজত। মাথার ওপর আবার ইঞ্জিনের হুইস্‌ল শোনা যায়, সঙ্গে চাকার শব্দ। ট্রাম প্ল্যাটফর্ম ছেড়ে যাচ্ছে।

মনস্থির করে নেয় রজত। মিসাইল খুব একটা নির্ভুল হাতিয়ার নয়। একটা ফাঁপা শামুক বাঁশের নলের ডগায় কিছুটা ক্রিস্টালের গুঁড়ো ভরা থাকে, আর তার পেছনে ঠাসা থাকে বারুদ। লঞ্চারের ট্রিগার টিপলে বারুদে আগুন ধরে কাঠিটা হাউইয়ের মতো ছুটে আসে। ধাক্কা খেলে তার মাথার ক্রিস্টালের গুঁড়োয় বিস্ফোরণ হয়। ওই অস্ত্র দিয়ে কোনও ছুটন্ত মানুষকে নিশানা করা মুশকিল। সেই সুযোগ নিতে হবে।

গুমটির উলটোদিকে একটা পাথরের স্থাপত্য। মানুষের অম্বালিকায় আসার পর কোনও ঘটনার স্মারক। আঙুল তুলে তার দিকে অতীনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে রজত।

মাথা নাড়ে অতীন। লাফ দিয়ে উঠে দৌড় দেয় তার দিকে।

কয়েক সেকেন্ড অপেক্ষা করে রজত, তারপর সে-ও লাফিয়ে উঠে দৌড় দেয় উলটোদিকে, প্ল্যাটফর্মে ওঠার সিঁড়ির দিকে।

দূর থেকে অতীনকে লক্ষ্য করে বৃষ্টির মধ্যে দিয়ে ছুটে আসে একটা লালচে-হলুদ শিখা।

কয়েক লাফে সিঁড়ি পেরিয়ে প্ল্যাটফর্ম দিয়ে দৌড়োয় রজত, ট্রাম তখন প্ল্যাটফর্ম ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছে।

পাথরের স্থাপত্যের পেছনে ঝাঁপ দেয় অতীন। পরের মুহূর্তে ছুটে আসা শিখাটা স্পর্শ করে সেটাকে।

প্ল্যাটফর্মের শেষ প্রান্ত থেকে লাফ দেয় রজত। আঁকড়ে ধরে ট্রামের দরজার হাতল।

একট নীল বিস্ফোরণে উড়ে যায় স্থাপত্য, বৃষ্টির সঙ্গে এবার নেমে আসে পাথরের টুকরো আর ধুলো।

শরীরটাকে টেনে ট্রামের পাদানিতে নিয়ে আসে রজত। তলোয়ার বের করে তার ডগা নীচের দিকে করে ধরে। হাতলে বাঁ হাত রাখে ডান হাতের নীচে।

পাথরের স্তূপের নীচে মাথা গুঁজে শুয়ে থাকে অতীন, সে জানে, আততায়ী তার একটু নড়াচড়া দেখলেই ছুটে আসবে মিসাইল।

দুলতে দুলতে ঘড়ঘড় আওয়াজে ট্রাম পৌঁছোয় লাইনের বাঁকে। তলোয়ারের মুখ নীচের দিকে করে লাফ দেয় রজত।

নীচে আততায়ী তখন মিসাইল লঞ্চার তুলে বৃষ্টির পেছনে অতীনের সন্ধান করছে। মাথার ওপরে রজতের উপস্থিতি সে টের পাওয়ার আগেই রজতের তলোয়ার বর্শার মতো তার ঘাড় ফুঁড়ে মাটি স্পর্শ করে। এক মুহূর্ত বাদেই তার মুখ থুবড়ে-পড়া দেহের দু-পাশের মাটি স্পর্শ করে রজতের দুই পা। ছিটকে যায় জল আর রক্ত।

জলকাদা মাখামাখি হয়ে একটু বাদে অতীন এসে হাজির হয়। তার মাথা থেকে বৃষ্টির জলের সঙ্গে গড়িয়ে পড়ে রক্তের ধারা।

মাটিতে পড়ে-থাকা লাশটাকে একটা লাথি কষায় সে, "ব্রিগেডিয়ার উজ্জ্বল, শালা বেইমান, রেন্ডির বাচ্চা!"

৯

রাত আরও গভীর হয়েছে। খুঁটিপাড়ার আস্তানায় দেওয়ালে হেলান দিয়ে ঠররার গ্লাস হাতে বসে থাকে রজত। তার মুখে একটা অদ্ভুত হাসি, দৃষ্টি হারিয়ে গেছে কোন দূরে। তার থেকে একটু দূরে মেঝেয় বসে রিমা কাপড়ে রিফু করে। বাইরে থেকে ভেসে আসে বৃষ্টির আওয়াজ।

"রিমা, ঠররা আর আছে?'' নেশা-জড়ানো গলায় প্রশ্ন করে রজত।

"আছে অল্প।"

"দাও!"

একটা দেরাজ থেকে ঠররার বোতল বের করে রিমা। আর ঠিক তখনই বাইরে থেকে ভেসে আসে বাঁশিতে আওয়াজ। কোনও কালান্দর এই বর্ষাতেও বাঁশি বাজিয়ে হেঁটে যাচ্ছে পথ ধরে।

বাঁশির সুরটা রজতের চেনা। তার শব্দে তার মনে পড়ে যায় বহুকাল আগের আগের এক সন্ধের কথা। একটা ছোট ছেলে তার ছোট ছোট আঙুলে বাঁশিতে সুর তোলার ব্যর্থ চেষ্টা করছে।

নিজের অজান্তেই সুরটা গুনগুন করে বেরিয়ে আসে তার গলা দিয়ে।

কিছুক্ষণ বাদে রিমাও গেয়ে ওঠে সুরটা।

আশ্চর্য হয়ে রিমার দিকে তাকায় রজত, "তুমি সুরটা জানো?"

মাথা দোলায় রিমা, "হ্যাঁ, আমাদের গ্রামে এক বুড়ো কালান্দরকে এই সুরটা বাজাতে শুনেছি।"

বাঁশির সুরটা আবার বাইরে কেঁদে কেঁদে ওঠে। রজতের মুখের কঠিন ভাবটা কেমন নমনীয় হয়ে আসে, "ছোটবেলায় আমার বাঁশি বাজাতে খুব ভালো লাগত। কিন্তু আমার বাবার পছন্দ ছিল না। বনেদি পরিবারের বিষয়ী মানুষ, পুরুষের ধর্ম বলতে বুঝত তলোয়ারের জোরে সম্পত্তি রক্ষা। আমার জন্মের সময় মা মারা যায়, তার জন্যে বাবা হয়তো মনে মনে আমাকেই দোষ দিত, আমার কোনও কাজই বোধহয় তাই বাবার পছন্দ হত না।"

হাতের খালি ঠররার গ্লাসটার দিকে তাকায় রজত, "যখন হোমিগঞ্জ থেকে চলে আসি, তখনই খুব অসুস্থ ছিল। এখনও বেঁচে আছে কি না কে জানে!"

একটা বোতল থেকে রজতের গ্লাসে ঠররা ঢেলে দেয় রিমা। গ্লাসে চুমুক দিয়ে রিমার মুখের দিকে তাকায় রজত। তার চোখের পেছনের সেই উন্মত্ততা যেন আজ ঘুমিয়ে পড়েছে, "রিমা, বাড়ি ফিরে যাবে?"

বিস্মিত দৃষ্টিতে রিমা রজতের দিকে তাকায়। যেন সে নতুন কাউকে দেখছে, "বাড়ি?"

"হ্যাঁ। তোমাদের গ্রামে। এশারগাঁও। হোমিগঞ্জ না। কালভৈরব পাস দিয়ে না, কাফিলা যাওয়ার পথ ধরে সোজা যদি তোমাদের গ্রামে চলে যাই?"

"পারলে তো আমি এখনই যাই। এই নোংরা, ভয়ানক শহরে আমি আর থাকতে চাই না। কিন্তু ভয় করে। ফের যদি কিছু হয়?"

ম্লান হাসি হেসে দু-দিকে মাথা নাড়ে রজত, "কী আর হবে। একটা তলোয়ারবাজির ম্যাচে দৈবাৎ একটা দুর্ঘটনা ঘটেছিল। তার থেকে মারামারি। তলোয়ারবাজদের মৃত্যু নিয়ে কেউ বেশি দিন ভাবে না।"

"কিন্তু বিজনের ভাই? সে যদি আমাদের খোঁজ পায়? বদলা নিতে আসে?" ইতস্তত করে বলে রিমা।

"বিজনের ভাই! হিমু? কোথায় আছে জানো সে?'' রজতের কণ্ঠস্বর আবার কর্কশ হয়ে ওঠে।

দু-দিকে মাথা ঝাঁকায় রিমা, "না! এখন কোথায় আছে, কী করে জানব? যখন হোমিগঞ্জ ছেড়ে আসি তখন দৌলতনগরের নিউটন অ্যাকাডেমিতে পড়ত।"

"দৌলতনগরের নিউটন অ্যাকাডেমিতে কোনও হিমু পড়ে না।" ঠোঁট বেঁকে যায় রজতের, "লোক পাঠিয়ে খোঁজ নিয়েছি!"

"হিমুর খোঁজ নিয়েছ? কেন?" বিস্মিত কণ্ঠে প্রশ্ন করে রিমা।

গ্লাসে চুমুক দেয় রজত, মুখে তার বাঁকা হাসি, "এখানে আসার পর কেমন একটা অস্বস্তি হচ্ছিল, তাই খোঁজ নিয়ে রেখেছি!"

রজতের গ্লাসে ঠররা ঢালে রিমা, "তাহলে বোধহয় বাড়ি চলে গেছে।" একটা লম্বা শ্বাস নেয় রিমা, "অন্য সবাই হয়তো পুরোনো কথা ভুলে গেছে। কিন্তু হিমু—''

মাথা নাড়ে রজত, "হিমু? আসতে দাও আমাদের খোঁজে, কিছু করার আগেই খতম করে দেব।"

"বেচারা!'' রিমার মুখ দিয়ে তার অজান্তেই কথাটা বেরিয়ে যায়।

রজতের ঠোঁট ফের বেঁকে যায়, "কেন? হিমুকে আমি মারলে তোমার খুব কষ্ট হবে?"

"না, না!" ব্যস্ত হয়ে উত্তর দেয় রিমা, "তুমি ছাড়া আমার আর কে আছে? কিন্তু বাচ্চা হিমু, যে কিছু করেনি, তাকে মারা—'' চোখের কোণে চিকচিক-করা জলটা হাত দিয়ে মুছে নেয় রিমা, "এমন নিষ্ঠুর কাজ, মহাকাল করুন, সেদিন যেন না আসে।''

উত্তর না দিয়ে মাথা নিচু করে ঠররার গ্লাসে চুমুক দেয় রজত।

রজত মাথাটা নিচু না করলে রিমা দেখতে পেত, তার কালি-পড়া চোখের পেছনে আবার জেগে উঠেছে অল্প কিছুক্ষণের জন্যে ঘুমিয়ে-পড়া সেই উন্মত্ততা।

নিমুর বয়স চল্লিশ পেরিয়েছে। তার বংশপরিচয় কারও জানা নেই, কিন্তু পোশাকের পারিপাট্য দেখলে তাকে বড় ঘরের কেউ বলে ভুল হয়। সেনেটর সুখেন্দু যখন জীবিত ছিলেন তখন নিমু তাঁর ব্যক্তিগত মাসাজার ছিল। তিনি মারা যাওয়ার পর নিমু চাকরিটি হারায় বটে, কিন্তু ততদিনে তার এত সুনাম রটে গেছে যে তার অন্নসংস্থানের অভাব হয়নি। যারাই তাকে দিয়ে মাসাজ করিয়েছে, তারা সবাই একবাক্যে বলে যে নিমুর আঙুলে জাদু আছে।

তবে মাসাজ করা ছাড়াও নিমু অর্থ রোজগারের জন্যে আরও নানারকম ফন্দিফিকির করে থাকে এবং সেই উপলক্ষ্যে শুভার সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলে।

বেশ কয়েকদিন হল বৃষ্টি থেমে গেছে, আকাশ পরিষ্কার। হাওয়ার স্যাঁতসেঁতে ভাবটাও আর তেমন নেই।

এইরকম এক সকালে হাই তুলতে তুলতে নিমু শুভার বাড়ির দিকে আসছে, তার সঙ্গে একটা ছেলের আর-একটু হলেই ধাক্কা লেগে যাচ্ছিল। ছেলেটা শুভার বাড়ির দোতলার বারান্দার দিকে তাকাতে তাকাতে যাচ্ছিল, নিমুকে দেখতে পায়নি।

কটমট করে ছেলেটার দিকে তাকিয়ে বাড়ির ভেতরে ঢোকে নিমু। এ বাড়িতে তার অবাধ যাতায়াত, কেউ তাকে বারণ করে না।

দোতলার একটা ঘরে আলগা পোশাকে আরামকেদারায় আধশোয়া হয়ে বসে ছিলেন শুভা, মুখে তাঁর একটা পাইপ।

মুখ থেকে ধোঁয়া ছাড়েন শুভা, তামাকের গন্ধ ছড়িয়ে যায় ঘরে, "একেবারে সকালে যে? রাতে এলে না, ছিলে কোথায়?"

হাই তুলতে তুলতে শুভার পায়ের কাছে বসে পড়ে নিমু, "জুয়ো খেলছিলাম!"

মুচকি হাসেন শুভা, "জিতলে?"

আবার হাই তোলে নিমু, "না, হেরেছি। বড় মানুষের ছেলে, খেলিয়ে তুলতে হবে। এখন দিনকতক হারব।"

নিমুর একটা কান আলতো করে টেনে দেন শুভা, "তুমি একটা পাক্কা জোচ্চোর!"

একটা চোখ টেপে নিমু। শুভার একটা পা কোলের ওপর টেনে নিয়ে হাঁটুর আর গোড়ালির মাঝখানটা মাসাজ করতে থাকে দু-হাতে।

"সে যা বলবে। কিন্তু তোমার বাড়িতে ঢোকার সময়ে দেখলাম, একটা ছেলে তোমার বারান্দার দিকে তাকাতে তাকাতে গেল।"

পাইপে টান দেন শুভা, আরামে তাঁর চোখ বুজে আসে। নিমুর আঙুলে সত্যিই জাদু আছে।

"বছর উনিশ-কুড়ি বয়স তো? ছোট ছোট চুল, তলোয়ারবাজির নবিশের মতো পোশাক-আশাক? ও রোজ দিনে দুবার এখানে চক্কর মেরে যায়।"

হাত থেমে যায় নিমুর, কপালে কয়েকটা ভাঁজ পড়ে তার, "তোমার প্রেমে পড়েছে নাকি?"

হাত বাড়িয়ে নিমুর একটা গাল টিপে দেন শুভা, "দুর বোকা! আমার কি সে বয়স আছে নাকি? ও মিতার জন্যে এখানে ঘুরঘুর করে।"

"ওঃ!" একটা হাসি ফোটে নিমুর মুখে, তার হাত আবার চলতে আরম্ভ করে, "কিন্তু মিতা তো সেনেটর কৃষ্ণেন্দুর মহলে।"

"উঁঃ!" একটা আচমকা নিশ্বাস টানেন শুভা। নিমুর হাত উঠে এসেছে তাঁর হাঁটুর ওপরে। তার হাতে সত্যিই জাদু আছে।

"সে কথা ছেলেটা জানে ভেবেছ?"

হাসি খেলে যায় নিমুর মুখে, "ও হ্যাঁ, তা-ই তো। কিন্তু সেনেটর কৃষ্ণেন্দুর মহলে মিতাকে যে কাজ করতে পাঠালে, সে তো পাক্কা মাগিবাজ। মেয়েছেলে দেখলেই তো মুখে নাল ঝরে!"

কপট ক্রোধে চোখ পাকিয়ে নিমুর দিকে তাকান শুভা, "ন্যাকা! বোঝো না নাকি? সেইজন্যেই তো পাঠিয়েছি। একবার যদি মিতাকে মনে ধরে তো আমারও কিছু হয়।"

কেমন কুৎসিত দেখায় নিমুর মুখের হাসি, "হ্যাঁ, তা ঠিক! তারপর আবার নথখোলনির পাব্বনি উপরি!"

নিমুর হাতের ঠেলায় শুভার জামা উঠে এসেছে প্রায় তাঁর কোমরের কাছে। নিমুর মতোই একটা কুৎসিত হাসি হেসে দু-হাতে চুলের মুঠি ধরে তার মাথাটা গুঁজে দেন তিনি দুই ঊরুর মাঝে।

নিমুর আঙুলে কেবল নয়, জিবেও জাদু আছে।

সে কথা অবশ্য কম লোকেই জানে।

১১

সামাজিক পরিমাপে কাঁসরপাড়ার অবস্থান খুঁটিপাড়ার ঠিক বিপরীত মেরুতে। অম্বালিকায় পৌঁছে সবচাইতে অক্ষত অবস্থায় আবিষ্কার করা এই অঞ্চলের বিভিন্ন ইমারতে, মহলে, সৌধে বাস করে হকিন্সাবাদের ক্ষমতাবান আর মাতব্বররা। এর মধ্যে ভিন্নর স্থাপত্যের অন্যতম উদাহরণ যে মহলটি, সেটি একসময় ছিল সেনেটর সুখেন্দুর। তিনি গত হওয়ার পর ইদানীং এটির মালিক তাঁর পুত্র সেনেটর কৃষ্ণেন্দু।

সেনেটর সুখেন্দুর সম্বন্ধে হকিন্সাবাদের শাসকশ্রেণির মধ্যে দুটি বিপরীত মতবাদ আছে। যারা তাঁর গুণমুগ্ধ, তাদের বিশ্বাস, সেনেট আর চ্যান্সেলরের মধ্যে সেনেটর সুখেন্দু একটা গুরুত্বপূর্ণ সেতুর কাজ করতেন। তাঁর হস্তক্ষেপের জন্যেই ক্ষমতার দাঁড়িপাল্লার দুইটি পাল্লা এক সরলরেখায় বিরাজ করত। অপরদিকে তাঁর সমালোচকদের মত, তিনি আজীবন ক্ষমতার দুটি বিন্দুকে পরস্পরের বিরুদ্ধে ব্যবহার করে নিজের আখেরটি ভালো করে গুছিয়ে নিয়েছেন। সেনেট আর চ্যান্সেলরের মধ্যে যে সংঘাতের আবহাওয়া বর্তমানে তৈরি হয়েছে, তার বীজটি তিনিই রোপণ করে গেছেন।

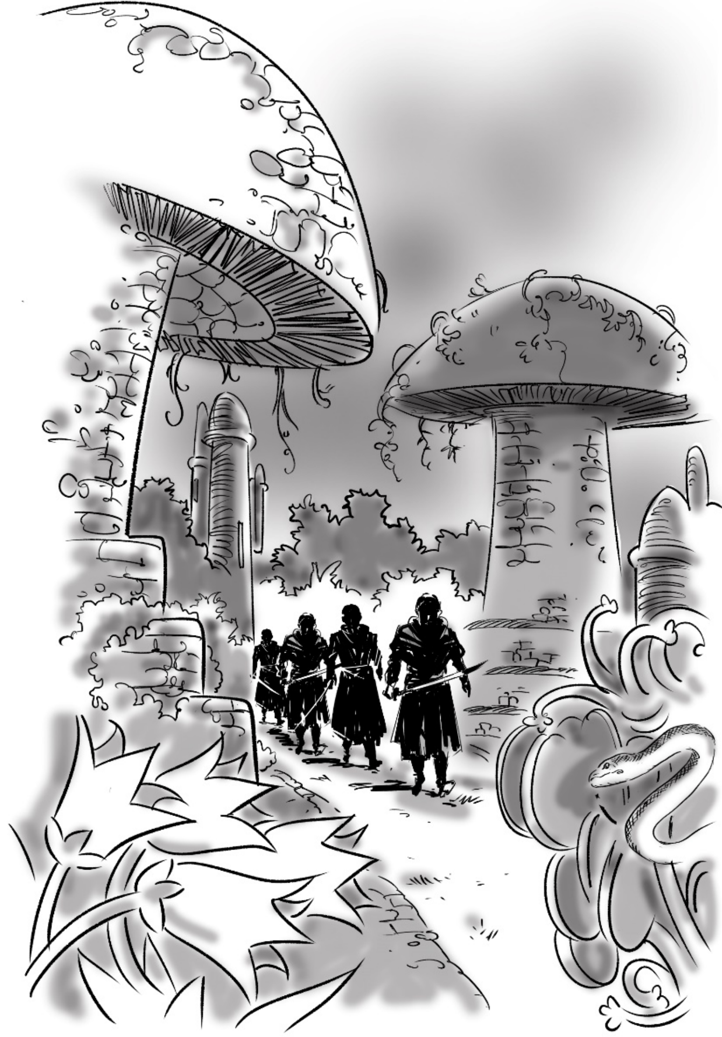
তবে রাজনীতিতে সেনেটর সুখেন্দুর অবদান সম্বন্ধে নানা মত থাকলেও, তাঁর মহলটি যে ভিন্নর স্থাপত্যের অন্যতম নিদর্শন, সে বিষয়ে কারও দ্বিমত নেই। এখানে প্যাঁচানো স্ক্রুয়ের মতো থামের গায়ের খাঁজে খাঁজে ফুটে থাকে নানা রঙের বাহারি ফুল, দেওয়ালের গা বেয়ে নেমে আসে সর্পিল, কুটিল জলরেখা, ঘোলাটে কাচের স্তম্ভ হাতের ছোঁয়ায় বেজে ওঠে অদ্ভুত, অচেনা সুরে, ছত্রাকের মতো ইমারতের ছাদ থেকে দোল খায় রঙিন অর্কিড।

সেনেটর সুখেন্দুর মতো তাঁর পুত্রের অবশ্য রাজনীতির মারপ্যাঁচে বিশেষ অংশগ্রহণ করেন না। উত্তরাধিকারসূত্রে পিতার মহল এবং পদটি লাভ করলেও পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করতে তাঁর বিন্দুমাত্র আগ্রহ আছে বলে মনে হয় না। জীবনের নানা রসাস্বাদনেই তিনি সাধারণত তাঁর প্রয়াস নিয়োজিত করে থাকেন।

শীতের মরশুম এসে গেছে অম্বালিকায়, সন্ধে নামার সঙ্গে সঙ্গেই পাল্লা দিয়ে নেমে আসে তাপমাত্রা। সুখেন্দুর মহলের দরবার হলের মাঝখানে একটা বিশাল আতশদানে[৬] জ্বলা আগুন তাই উষ্ণতা ছড়ায়।

আতশদানের একদিকে সেনেটর কৃষ্ণেন্দু। তাঁর দু-পাশে বসে তাঁর ব্যক্তিগত লশকরের তলোয়ারবাজরা। সেনেটর কৃষ্ণেন্দুর বয়স বেশি না হলেও মাথার চুল পাতলা হয়ে গেছে। উঁচু খাড়া নাকের দু-পাশের চোখ দুটো কোটরাগত। গালে হাত দিয়ে তিনি কী চিন্তা করেন।

আতশদানের অন্যদিকে বসে অতীন আর কওমি পলটনের কিছু লোকজন। তাদের মধ্যে প্রধান সোমনাথ আর বিপুল। সোমনাথ চেহারায় কিছুটা স্থূলকায়, চওড়া কাঁধ আর খাটো ঘাড়ের ওপর বসানো মাথাটা গোলাকার। চামড়ার ভাঁজে প্রায় হারিয়ে যাওয়া দুই সরু চোখে ধূর্ত চাহনি। লম্বা ছিপছিপে চেহারার বিপুলের পাশে তাকে কিছুটা বেমানান লাগলেও, তাদের দুজনের শরীর ভঙ্গি থেকে বুঝতে অসুবিধে হয় না যে তারা পরস্পরের ঘনিষ্ঠ।



এদের থেকে দূরত্ব বজায় রেখে পেছনদিকে বসে থাকে রজত। সে কওমি পলটনের পদাধিকারী নয়, কেবল পেশাদার খুনি। তা ছাড়া রাজনীতির মারপ্যাঁচে তার কোনও আগ্রহ নেই।

পরিচারিকারা এসে কওমি পলটনের তলোয়ারবাজদের চা আর খাবার পরিবেশন করে। গালে টোল-পড়া একটা মেয়ে এসে রজতের পাশে চায়ের পাত্র আর খাবারের প্লেট নামিয়ে রাখে। আড়চোখে সেদিকে দেখে সামনে তাকায় রজত। আতশদানের অন্য পাশে মাথা নিচু করে বসে-থাকা সেনেটর কৃষ্ণেন্দুকে তার কেমন শিকারি জলশকুনের মতো লাগে।

গাল থেকে হাত নামিয়ে অতীনের দিকে তাকান সেনেটর কৃষ্ণেন্দু, "তাহলে আপনি বলছেন, আমাকে সেনেটের সদস্যদের বোঝাতে হবে যে চ্যান্সেলর সেনেটের সামনে যা প্রস্তাব আনবেন, সেসব বিনা প্রতিবাদে পাস করিয়ে দেওয়াটা সময়ের প্রয়োজন।"

"হ্যাঁ। অম্বালিকার স্বার্থে।" উত্তর দেয় অতীন, "অম্বালিকার যে অরাজক অবস্থা, তাতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করে সুখসমৃদ্ধি ফিরিয়ে আনতে সুশাসন দরকার। আর—"

"আর সুশাসনের জন্যে প্রয়োজন ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ। অনেকবার শুনেছি যুক্তিটা!'' একটা লম্বা নিশ্বাস ফেলেন সেনেটর কৃষ্ণেন্দু, "কিন্তু সবাই আপনাদের এ যুক্তি মানে না। কেউ কেউ বলে যে ক্ষমতা এক জায়গায় কেন্দ্রীভূত হলে ক্ষমতার অপব্যবহার হয়। তার চাইতে বিভিন্ন ভরকেন্দ্রে ক্ষমতাকে বণ্টন করে দিলে সবার স্বার্থই বজায় থাকে।"

"ভুল কথা বলে!'' জোর গলায় উত্তর দেয় অতীন।

ভ্রূ কপালে তোলেন সেনেটর কৃষ্ণেন্দু, "তা-ই কি? সেদিন তো আপনাদের নেতা ব্রিগেডিয়ার উজ্জ্বলের মুখেও একই কথা শুনলাম মনে হচ্ছে!"

"ব্রিগেডিয়ার উজ্জ্বলের সঙ্গে আমাদের আর কোনও সংস্রব নেই। আমরা তাঁকে আর নেতা বলে মানি না।" উষ্মার সঙ্গে উত্তর দেয় অতীন।

দু-পাশে হাত ছড়িয়ে দেন সেনেটর কৃষ্ণেন্দু, "সে আপনাদের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার। আমার জানার দরকার নেই। কিন্তু আমার অবস্থান স্পষ্ট করে দিই। এইসব রাজনীতির কূটতর্কে আমার কোনও আগ্রহ নেই। যে প্রথা যেমন চলছে, তাকে তেমনি চলতে দেওয়া উচিত বলেই আমি মনে করি।"

"তাহলে অম্বালিকার সমৃদ্ধির প্রতি আপনার কোনও দায়বদ্ধতা নেই?'' কিছুটা রূঢ়ভাবেই প্রশ্ন করে অতীন।

একটা হাসি খেলে যায় সেনেটর কৃষ্ণেন্দুর মুখে, "আমি মুক্ত বিহঙ্গ। দায়বদ্ধতাতে বিশ্বাস করি না। অম্বালিকা আমাদের আসার আগে থেকেই ছিল, আমাদের পরেও থাকবে। তাকে নিয়ে অযথা দুশ্চিন্তার প্রয়োজন দেখি না।"

আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ান সেনেটর কৃষ্ণেন্দু, "যা হবার তা হবে। সে নিয়ে চিন্তা করে সময় নষ্ট করার চাইতে আনন্দ করা ভালো। আমার খাসমহলে আজ আমার বন্ধুদের জন্যে কিছু আমোদ-প্রমোদের বন্দোবস্ত করেছি। আপনাদেরও সাদরে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।"

উঠে দাঁড়িয়ে মাথা ঝোঁকায় অতীন, “মাফ করবেন, আজ আপনাকে সঙ্গ দিতে পারলাম না। অন্যত্র কিছু কাজ আছে।”

“যেমন আপনার অভিরুচি।” মাথা ঝুঁকিয়ে তলোয়ারবাজদের সঙ্গে নিয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যান সেনেটর কৃষ্ণেন্দু।

সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসে অতীনও। বাগানের অদ্ভুতদর্শন স্থাপত্যের মধ্যে দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে বিরক্তির স্বরে বলে, “যা শুনেছিলাম তা-ই। এই সেনেটর কৃষ্ণেন্দু একেবারে অপদার্থ। ফুর্তি করা ছাড়া এর জীবনে আর কোনও উদ্দেশ্য আছে বলে মনে হয় না।”

সবাই মিলে মহল ছেড়ে বেরিয়ে আসছে, একটা চেনা সুর ভেসে আসে রজতের কানে। চেনা সুর, চেনা কণ্ঠস্বর।

হোমিগঞ্জের চালকলের কাছে এই গলায় এই গানই অনেকদিন আগে একবার শুনেছিল সে। অনেক অনেকদিন আগে।

এই ঠান্ডাতেও বিন্দু বিন্দু ঘাম দেয় রজতের কপালে। অনেক পুরোনো স্মৃতি ঠেলে ঠেলে উঠে আসতে চেষ্টা করে ওপরে।

জামার হাতায় ঘাম মুছে সে অতীনকে বলে, “তোমরা এগোও, আমি একটু পরে আসছি।”

কপালে ভুরু তোলে অতীন, কিন্তু কিছু বলে না।

১২

সেনেটর কৃষ্ণেন্দুর মহলের বিচিত্র বাগানের মধ্যে দিয়ে গানের আওয়াজ লক্ষ করে হাঁটতে হাঁটতে বাগানের শেষ প্রান্তে এসে পড়ে রজত।

খানিকটা ফাঁকা জায়গায় পেছন ফিরে একটা উনুনে শুকনো গাছ-পাতা জ্বালায় একটা লোক। কাজ করতে করতে নিজের মনেই গান করে সে।

নিচু গলায় রজত ডাক দেয়, “মন্টু!”

পেছন ফিরে তাকিয়ে পাথরের মতো জমে যায় মন্টু। হতভম্ব দৃষ্টিতে সে হাঁ করে তাকিয়ে থাকে রজতের দিকে। যেন ভূত দেখছে।

আবার ডাকে রজত, “মন্টু!”

ধড়ফড় করে উঠে দাঁড়ায় মন্টু, “ছোটেসাব! তুমি!”

মন্টুর কাছে এগিয়ে আসে রজত, “তুই এখানে কী করছিস, মন্টু?”

মন্টুর গলাটা কেমন চড়ে যায়, “জানতে চাইছ, এখানে এসেছি কেন?”

“হ্যাঁ। তা-ই তো জিজ্ঞেস করছি।”

উনুন থেকে কয়েকটা স্ফুলিঙ্গ হাওয়ায় উড়ে এসে মন্টুর গায়ে পড়ে। সে দিকে দৃক্‌পাত না করে কান্না-জড়ানো গলায় চেঁচিয়ে ওঠে মন্টু, “বড়েসাব তো মারা গেছে। আমি আর হোমিগঞ্জে থেকে কী করতাম?”

“বাবা মারা গেছে!” অস্ফুট কণ্ঠে বলে রজত। অসুস্থ বৃদ্ধ মানুষটার চলে যাওয়া অপ্রত্যাশিত নয়, তবুও তার বুকের কোন এক গোপন কোণে একটা ব্যথা চিনচিন করে ওঠে।

মাথা নাড়ায় মন্টু, “আমি অনাথ। জন্মের পর পথের ধারে কে ফেলে দিয়ে চলে গিয়েছিল। বড়েসাব আমায় কুড়িয়ে পেয়ে মানুষ করে। বড় হলে চালকলটা চালাতে দেয়।”

চোখের জল মোছে মন্টু, “দুনিয়ায় আমার কেউ নেই। এক বড়েসাব ছিল। বাপের মতো। সে-ই যখন চলে গেল—” কথা শেষ করার আগেই কান্নায় গলা বুজে আসে মন্টুর।

শূন্যদৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে একটা শ্বাস নেয় রজত, “কবে মারা গেল বাবা?”

আবার কাঁদতে শুরু করে মন্টু, “সব তোমার দোষ। তোমার যাওয়ার পরপরই শয্যা নিয়েছিল বড়েসাব। তার দিনকতক বাদে বিজনের ভাই হিমু হোমিগঞ্জ এসেছে শুনে তাকে ডেকে পাঠাল।”

“কী!” নিজের কানকে যেন বিশ্বাস করতে পারে না রজত।

“হ্যাঁ। হিমুকে ডেকে পাঠিয়ে বলল, ‘রজতের ঘাড়ে অম্বালিকার অশুভ আত্মা ভর করেছে। ও আর মানুষ নেই। তোমাকে রজতকে মারতে হবে। তুমি হকিঙ্গাবাদ গিয়ে কিষেনপ্রতাপের আখড়ায় তলোয়ারবাজি শেখো। আমি চিঠি লিখে দিচ্ছি। নিজের নাম বলবে না। বৈজু নামে আমার এক পুরোনো কর্মচারী ছিল, মারা গেছে বহুদিন। তার নাম বসিয়ে তোমার জন্যে একটা জাল পরিচয়পত্র বানিয়ে রেখেছি। কেউ তোমার পরিচয় জানতে চাইলে সেইটা দেখিয়ে বলবে তোমার নাম বৈজু।’ হিমুকে এইসব বলার দু-দিনের মাথাতেই বড়েসাব মারা গেল।”

রজতের মনে হয়, তার চারপাশের দুনিয়াটা কেমন তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে। বুকের ভেতরে থেকে উঠে আসতে-চাওয়া ক্রোধের চিৎকার, আর মন্টুর গলায় তলোয়ার চালিয়ে দেওয়ার ইচ্ছে, দুটোকেই কোনওরকমে দাবিয়ে রাখে সে। সমস্ত দুনিয়া তার দুশমন। কেউ তার বন্ধু নয়, সবাই তার বিপক্ষে। কারও তোয়াক্কা করার তার দরকার নেই।

একটা বিকৃত হাসিতে বেঁকে যায় রজতের মুখ, "আচ্ছা! এইবার বুঝতে পেরেছি!"

উনুনের আগুনের শিখার দিকে তাকায় রজত, "মন্টু, তোকে একটা কাজ করতে হবে। কিষেনপ্রতাপের আখড়ায় গিয়ে হিমুকে বলে আসবি যে রজত খুঁটিপাড়ায় থাকে। সে এখন নিজের পরিচয় দেয় রাজেন বলে, আর কওমি পলটনের হয়ে পয়সার বিনিময়ে মানুষ মারে।''

বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে মন্টু, "কী বলছ কী তুমি?"

নিরুত্তাপ কণ্ঠে রজত বলে, "বলবি, হিমু যখনই চাইবে, আমি লড়তে রাজি আছি। ওর সমস্ত দুঃখকষ্ট আমি এক তলোয়ারের কোপে ঘুচিয়ে দেব।"

"না, আমি ওসব বলতে পারব না! আমি কোনও খুনখারাপির মধ্যে নেই!" কান্না-ভেজা গলায় চিৎকার করে ওঠে মন্টু।

উত্তর দেয় না রজত। মন্টুকে পেছনে ফেলে বেরিয়ে যায় বাগান থেকে।

নিজের খাসমহলের মেঝেতে বিছানো ফরাশে তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে বসেন সেনেটর কৃষ্ণেন্দু। ধীরে ধীরে তাঁর পার্ষদ আর ঘনিষ্ঠরা এসেও জোটে। পরিচারিকারা এসে গ্লাসে সুগন্ধি ফুলেল মদ ঢালে।

"তাহলে আমরা মধ্যপন্থা নিচ্ছি! মানে সেনেট বা চ্যান্সেলর কোনওদিকেই আমরা চলব না?'' গ্লাস হাতে নিয়ে প্রশ্ন করে একজন।

মদের গ্লাস-ধরা হাতটা একবার বাঁদিক থেকে ডানদিকে ঘোরান সেনেটর কৃষ্ণেন্দু, "এই যে তোমরা সব এখানে আজ হাজির হয়েছ, আমি জানি, তোমাদের মধ্যে অনেকেই মনে করে, আমার বাবা খুব কাজের মানুষ ছিলেন। আর সে তুলনায় আমি একটা অপদার্থ। আইয়াশ।''

সমস্বরে অভ্যাগতদের মধ্যে থেকে অনেকগুলো 'না, না' উঠে আসে।

হাতের গ্লাসে চুমুক দেন সেনেটর কৃষ্ণেন্দু। মুখে একটা মৃদু হাসি খেলে তাঁর, "আমার আর আমার বাবার মধ্যে কাজেকর্মে অনেক তফাত। কিন্তু আমার বাবার কাছ থেকে পাওয়া একটা শিক্ষা আমি অক্ষরে অক্ষরে মানি। কী জানো?"

আবার সমস্বরে অভ্যাগতদের মধ্যে থেকে অনেকগুলো 'কী? কী?' উঠে আসে।

"রাজনীতিতে আদর্শ জিনিসটা একটা বোঝা। পেছনে টেনে রাখে, এগোতে দেয় না। রাজনীতির একটাই উদ্দেশ্য, ক্ষমতা দখল করা, আর ক্ষমতার জোরে দুনিয়াটাকে ভোগ করা। চ্যান্সেলর আর সেনেট দু-পক্ষই বিশ্বাস করে, তারা একটা আদর্শের জন্যে লড়াই করছে। আমি ওই আদর্শের বোঝা থেকে মুক্ত।"

"তাহলে আমরা এখন কী করব?'' কেউ প্রশ্ন করে।

খালি গ্লাস বাড়িয়ে ধরেন সেনেটর কৃষ্ণেন্দু। গ্লাসে মদ ঢালে পরিচারিকা।

"কিছুই করব না। সেনেট আর চ্যান্সেলর, পরস্পরের বিরুদ্ধে লড়াই করে নিঃশেষ হয়ে যাক, তারপর হয়তো তৃতীয় কোনও শক্তির উত্থান হবে। ততক্ষণ আমরা অপেক্ষা করব!"

"কিন্তু অম্বালিকার মানুষ—!'' দ্বিধাজড়িত কণ্ঠে মন্তব্য করতে গিয়েও থেমে যায় প্রশ্নকর্তা।

“অম্বালিকার মানুষ!” সেনেটর কৃষ্ণেন্দুর হাসিটা ছড়িয়ে যায় সারা ঘরে, “মানুষ হল শামুক বাঁশের ঝাড়ের মতো। না কাটলে জঙ্গল হয়ে যায়। মাঝেমধ্যে ছেঁটে দিলে মজবুত হয়। একবার কেটে ফেললে আবার গজায়। মানুষ আর শামুক বাঁশ দুটোই ব্যবহারের বস্তু। আমাদের ব্যবহারে লাগা ছাড়া এ দুনিয়ায় তাদের আর কোনও উদ্দেশ্য নেই। বুঝলে?”

গ্লাসের মদটা এক চুমুকে শেষ করে ফেলেন সেনেটর কৃষ্ণেন্দু, “যা-ই হোক, অনেক গুরুগম্ভীর আলোচনা হল। এবার মেহফিল শুরু করা যাক। কী গেম খেলা হবে আজ? কেউ কিছু ঠিক করেছে?’’

“শামুক বাঁশের কথা যখন উঠল তখন শামুক বাঁশের খেলাটাই খেলা যেতে পারে!” কেউ একজন বলে।

“বাঃ! তা-ই হোক তাহলে!’’ খালি গ্লাসটা নামিয়ে রাখেন সেনেটর কৃষ্ণেন্দু, “গোল করে বোসো তাহলে! যে যার পার্টনার নিয়ে নাও!’’

অতিথিরা সব পুরুষ। প্রত্যেকে তাদের পছন্দের পরিচারিকাকে পাশে টেনে নিয়ে বসে পড়ে।

“আরম্ভ করা যাক?’’ সেনেটর কৃষ্ণেন্দুর হাসিটা কেমন কুৎসিত দেখায়।

“আমার পার্টনার নেই!’’ পুরুষদের মধ্যে থেকে একজন মৃদু অনুযোগ করে।

“ওহো, তা-ই তো!’’ একজন পরিচারিকার দিকে তাকান সেনেটর সুখেন্দু, “বিনু, একে একজন পার্টনার জোগাড় করে দেওয়া যাবে?’’

মাথা ঝোঁকায় বিনু, “একটা মেয়ে আছে, হুজুর। তবে একেবারে নতুন। সবে মাসকয়েক আগে কাজে লেগেছে।’’

“নিয়ে এসো, নিয়ে এসো!” হাসিটা চওড়া হয় সেনেটর কৃষ্ণেন্দুর, “এই সুযোগে তোমরাও শিখিয়ে-পড়িয়ে নিতে পারবে!”

মহলের ভাঁড়ারঘরের তাকে মিতা বাসন গুছিয়ে রাখছে, বিনু এসে তাকে ডাক দেয়, “আরে, তুমি এখানে! আর আমি সারা মহল চষে বেড়াচ্ছি। চলো, চলো, হুজুর ডাকছেন!’’

“কিন্তু কেন?’’ উদ্‌বিগ্ন দৃষ্টিতে বিনুর দিকে তাকায় মিতা।

“শামুক বাঁশ খেলতে! চলো!”

“সে কী খেলা? আমি তো খেলতে জানি না!’’ ভয়ার্ত কণ্ঠে বলে মিতা।

“গেলেই দেখতে পাবে। কী করে খেলতে হয়, শিখিয়ে দেব। আরে, চলো-না।’’ একরকম টানতে টানতেই মিতাকে খাসমহলে টেনে নিয়ে আসে বিনু।

“হুজুর, মিতাকে নিয়ে এসেছি!”

“বেশ। বেশ। এসো মিতা। বিনু, ওকে বসিয়ে দাও!” দুই চোখ ডিমকি হায়েনার মতো চকচক করে ওঠে সেনেটর কৃষ্ণেন্দুর।

নারী-পুরুষের বৃত্তের মধ্যে মিতাকে একটা খালি জায়গায় জোর করে বসিয়ে দেয় বিনু।

মিতার দিকে তাকান সেনেটর কৃষ্ণেন্দু, মুখে তাঁর একটা কামুক হাসি, “এই খেলাটার নাম শামুক বাঁশ। শামুক বাঁশ ব্যবহার করার আগে যেমন তার খোলস ছাড়াতে হয়, এই খেলাতেও তেমন পয়েন্ট হারালে খোলস ছাড়তে হয়। যে হারবে, তার পার্টনার খোলস ছাড়বে।’’

“হুজুর, ঠিক বুঝতে পারলাম না।’’ ভয়ার্ত চোখে সেনেটর কৃষ্ণেন্দুর দিকে তাকায় মিতা।

সামনে রাখা গ্লাস থেকে এক চুমুক মদ খান সেনেটর কৃষ্ণেন্দু, “খেলা শুরু হলেই বুঝতে পেরে যাবে। তোমার কাজ শুধু দান দেওয়া।’’

মিতা দ্যাখে, বৃত্তে বসা সবার মতোই তার সামনেও একজোড়া ছক্কা পড়ে আছে। কোনও এক অনাগত বিপদের আশঙ্কায় তার কপালে ঘামের বিন্দু ফুটে ওঠে।

হাতের মুঠোয় ছক্কা দুটো তুলে ফরাশের ওপর দান চালেন সেনেটর কৃষ্ণেন্দু, “নয়!’’

আঙুল তুলে নিজের ডানদিক থেকে এবার গুনতে শুরু করেন তিনি, “এক, দুই, তিন, চার…।”

গুনতে গুনতে তাঁর আঙুল থামে একজন পরিচারিকার ওপর। তার সামনে রাখা ছক্কা তুলে সে এবার দান দেয়। দুটো ছক্কা মিলিয়ে পাঁচ পড়ে।

‘খোলস! খোলস!’ নারী-পুরুষের বৃত্তটা সমস্বরে চিৎকার করে।

পরিচারিকার পাশে বসা পুরুষটি তার গায়ের জামা খুলে ছুড়ে ফেলে দেয়।

উল্লাসে চিৎকার করে ওঠে সবাই।

শামুক বাঁশ খেলার উদ্দেশ্য পরিস্ফুট হয়ে ওঠে মিতার কাছে। ক্ষুধার্ত ডিমকি হায়েনার ব্যূহে পড়া কস্তা[৭] হরিণের মতো থরথর করে কাঁপতে থাকে সে।

আবার দান চালেন সেনেটর কৃষ্ণেন্দু। এবার তাঁর গুনতি গিয়ে থামে পরিচারিকা বিনুর পাশে বসা পুরুষটিতে এসে। সে-ও পালটা দান দেয়। দানে সেনেটর কৃষ্ণেন্দুর চাইতে ফোঁটা কম পড়ে।

একটা মাদক হাসি হেসে বিনু তার ঊর্ধ্বাঙ্গের পোশাক খুলে ফ্যালে। উল্লাসের চিৎকার ছড়িয়ে যায় ঘরে।

আর-একবার দান চালেন সেনেটর কৃষ্ণেন্দু। এবারও তাঁর গোনা গিয়ে থামে পরিচারিকা বিনুর পাশে বসা পুরুষটিতে এসে। এবারেও তার দানে সেনেটর কৃষ্ণেন্দুর চাইতে ফোঁটা কম পড়ে।

'খোলস! খোলস!' সমস্বরে চিৎকার করে সবাই।

একটা বিলোল চাহনি মেলে বিনু তার ঊর্ধ্বাঙ্গের অন্তর্বাস খুলে ফ্যালে। দু-হাতে স্তনভার ধরে শরীর ঘুরিয়ে প্রদর্শন করে।

উল্লাসের চিৎকারে মনে হয়, ছাদ ভেঙে পড়বে।

অবশ, আড়ষ্ট শরীরে মিতা বসে মহাকালের কাছে প্রার্থনা করে।

দান পড়ে, পোশাক উড়ে পড়ে দূরে, উল্লাসের চিৎকারে কাঁপে ঘর, নারী-পুরুষ নগ্ন হয়, মহাকালের কাছে প্রার্থনা করে মিতা।

মহাকাল প্রার্থনা শোনেন না। মিতার পাশের পুরুষটি দান হারে।

সমস্বরে 'খোলস, খোলস' চিৎকার ওঠে। মিতার দু-চোখ দিয়ে জলের ধারা নেমে আসে, কেউ পাশ থেকে তার পোশাকের বোতাম খুলতে শুরু করে।

হঠাৎ তখনই বাইরে কোথা থেকে একটা কাচ ভাঙার আওয়াজ হয়, কারা 'ধর, ধর। মার, মার' চিৎকার করে ওঠে, একসঙ্গে অনেকজনের দৌড়োনোর শব্দ পাওয়া যায়।

মুহূর্তের মধ্যে ঘরে নিস্তব্ধতা নেমে আসে। অরাজক, অশান্ত হকিন্সাবাদে এইসব শব্দ কোনও শুভসংবাদ বহন করে আনে না।

বৃত্তে বসা নগ্ন আর অর্ধনগ্ন নারী-পুরুষ ভয়ার্ত দৃষ্টিতে পরস্পরের মুখের দিকে চাইতে থাকে। ঘরের শৃঙ্গাররসের আমেজ যেন এক নিমেষেই বদলে গেছে ভয়ে।

গলাখাঁকারি দিয়ে শুকনো গলায় সেনেটর কৃষ্ণেন্দু বলেন, "কেউ একবার উঠে দ্যাখো কী হয়েছে।"

একজন উঠে ঘরের একটা জানলা খোলে। বাইরে থেকে একঝলক শীতের হাওয়ার সঙ্গে ভেসে আসে বাগানের ফুলের গন্ধ। ঘরের অনাবৃত শরীরগুলো ঠান্ডায় কেঁপে ওঠে।

যে জানলা খুলেছিল, সে বাইরে তাকিয়ে বলে, "কিছু দেখতে পাচ্ছি না। তবে মহলের পাহারাদাররা আর বরকন্দাজরা এদিক-ওদিক ছোটাছুটি করছে।"

একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেন সেনেটর কৃষ্ণেন্দু।

আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই খোলা জানলা দিয়ে মুখের সলতেয় আগুন ধরানো একটা মাটির বোতল ঘরের মধ্যে উড়ে আসে। মেঝেতে আছাড় খেয়ে টুকরো টুকরো হয়ে যায় বোতল, তার মধ্যে ভরা তেল আর দাহ্য পদার্থ ফরাশের ওপর ছড়িয়ে পড়ে, দাউদাউ করে আগুন জ্বলে ওঠে ফরাশে।

আতঙ্কে চিৎকার করে অনাবৃত শরীরগুলো ঘর থেকে বেরিয়ে বাগানের হিমশীতল ঠান্ডায় প্রাণভয়ে এদিক-সেদিক দৌড়োয়। জামার বুকের কাছটা এক হাতে চেপে ধরে তাদের সঙ্গে দৌড়োয় মিতাও।

দৌড়োতে দৌড়োতে মিতা খেয়াল করে, সে গোলযোগ থেকে বেশ দূরে বাগানের একটা নির্জন অংশে এসে পড়েছে। চারপাশে আর কেউ নেই দেখে একটা গাছের নীচে দাঁড়িয়ে হাঁপাতে থাকে মিতা।

আচমকা গাছের পেছন থেকে একটা হাত তাকে টেনে নিয়ে যায় গাছের পেছনে। কালো মুখোশ পরা একটা মুখ নেমে আসে তার মাথার দিকে। চিৎকার করে উঠতে গিয়েও করতে পারে না মিতা, আক্রমণকারীর অন্য হাতটা তার মুখ চেপে ধরেছে।

কালো মুখোশের পেছন থেকে একটা চেনা কণ্ঠস্বর অত্যন্ত নিচু স্বরে মিতার কানের কাছে বলে, "আমার ভুল হয়েছিল, মিতা। এ জায়গা তোমার জন্যে নয়। পালিয়ে যাও এখান থেকে।"

কণ্ঠস্বর চিনতে বিন্দুমাত্র ভুল হয় না মিতার। বিস্মিত কণ্ঠে সে বলে, "কাকা!"

কিন্তু সে কথা শোনার আগেই মুখোশ-পরা আগন্তুক ছুট দিয়েছে বাগানের অন্যদিকে। তাকে দেখতে পেয়ে হইহই করে তাড়া করে আসে মহলের পাহারাদাররা।

রজতের বলা কথাগুলো বলে মুখ চুন করে দাঁড়িয়ে থাকে মন্টু।

সস্নেহে তার কাঁধে একটা হাত রাখেন কিষেনপ্রতাপ, "তোমার চিন্তা করার কারণ নেই। হিমুর দায়িত্ব আমার। এখন থেকে হিমু আর বাড়ি যাবে না, আমার এখানেই থাকবে। তুমি কেবল রজতের ওপর দূর থেকে একটু নজর রেখো। কিছু ঘটলে আমাকে খবর দিয়ো।"

মন্টুর মুখ দেখে মনে হয় না, কিষেনপ্রতাপের কথায় সে খুব একটা আশ্বস্ত হয়েছে, তবুও ঘাড় নেড়ে সে বিদায় নেয়।

আখড়া এখন খালি। মন্টুর আসার সঙ্গে সঙ্গেই কিষেনপ্রতাপ সবাইকে বিদায় দিয়েছেন। ধূপ আর ফুলের সুবাস-ভাসা শূন্য ঘরে হিমু মুখোমুখি দাঁড়িয়ে থাকে কিষেনপ্রতাপের।

"তাহলে আমি কি এখন রজতকে চ্যালেঞ্জ জানাব? তাকে লড়তে ডাকব?"

"না!'' জোর গলায় বলেন কিষেনপ্রতাপ, "রজত বৃথা গর্ব করেনি। তুমি ওর সামনে কয়েক সেকেন্ডও টিকবে না।"

"কিন্তু কেন ওস্তাদ?'' মৃদু প্রতিবাদ করে হিমু, "সেদিন হয়তো আমি রজতের সঙ্গে পেরে উঠিনি। কিন্তু তলোয়ারবাজিতে হার-জিত তো থাকেই। আরও কিছুদিন অভ্যাস করলে—''

হাত তুলে বাধা দেন কিষেনপ্রতাপ, "তলোয়ারবাজি? রজত নিজেও জানে না, কিন্তু সে তলোয়ারবাজির সীমানা অতিক্রম করে গেছে বহুদিন আগেই। রজত যা করে, তার নাম তলোয়ারবাজি নয়।"

বিস্মিত কণ্ঠে হিমু বলে, "বুঝলাম না, ওস্তাদ!"

"তলোয়ারবাজি কাকে বলে বৈজু? কায়দা, তরিকা, প্যাঁচ, হরকত— এইসব তো? তলোয়ার নিয়ন্ত্রণ করার নানা কৌশল রপ্ত করা। কিন্তু রজত তলোয়ারকে নিয়ন্ত্রণ করে না, তার তলোয়ারই তাকে নিয়ন্ত্রণ করে।"

ঘরের একপাশের হাতিয়ার র‍্যাক থেকে একটা ইস্পাত কাচের তলোয়ার তুলে হাতের মোচড়ে দুবার ঘোরান কিষেনপ্রতাপ। তলোয়ার হাওয়া কাটে শনশন আওয়াজ করে।

"কোনও সাধারণ তলোয়ারবাজ রজতের বিরুদ্ধে জিততে পারবে না। রজতের বিরুদ্ধে জিততে গেলে তোমাকে তলোয়ারবাজ নয়, যোদ্ধা হতে হবে।"

তলোয়ারটা হিমুর হাতে ধরিয়ে দেন কিষেনপ্রতাপ, "যোদ্ধার জন্য তলোয়ারই তার মন। মনই তার তলোয়ার।"

“তলোয়ারবাজ আর যোদ্ধা আলাদা?” বিস্মিত কণ্ঠে প্রশ্ন করে হিমু। যোদ্ধা শব্দটা তার অজানা।

র‍্যাক থেকে আর-একটা তলোয়ার তুলে নেন কিষেনপ্রতাপ, “তলোয়ারবাজের কাছে তলোয়ার অর্থ, যশ আর জাগতিক সুখ উপার্জনের যন্ত্র। যোদ্ধার কাছে তলোয়ার অস্ত্র নয়। তলোয়ার জীবনের প্রশ্নের উত্তর খোঁজার পথ।”

কোনওরকম সতর্কবাণী ছাড়াই হিমুর গলা লক্ষ্য করে তলোয়ার চালিয়ে দেন কিষেনপ্রতাপ, “যোদ্ধা কায়মনোবাক্যে মৃত্যুকে জীবনের চরম ও একমাত্র সত্য বলে গ্রহণ করবে।”

কিষেনপ্রতাপের তলোয়ার আটকানোর জন্যে নিজের তলোয়ার তোলার সুযোগটুকু পায় না হিমু। তলোয়ারের ডগা তার কণ্ঠনালির মাত্র একচুল দূর দিয়ে বাতাসের হালকা স্পর্শ দিয়ে চলে যায়।

বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটে ওঠে হিমুর কপালে। তার মনে হয়, সাক্ষাৎ মৃত্যু তার গলায় চুম্বনরেখা এঁকে দিয়ে গেল।

হিমুকে ভাববার সুযোগ দেন না কিষেনপ্রতাপ। পরের পর আঘাতে তাঁর তলোয়ার বিরামহীনভাবে ধেয়ে আসে তার শরীরের বিভিন্ন অংশ লক্ষ্য করে। অতি কষ্টে নিজের তলোয়ার দিয়ে সেগুলোকে আটকায় হিমু।

“ফসল বোনা আর ফসল কেটে ঘরে তোলার যে অবিরাম চক্র, কৃষক জীবনের পথ চলে তাকে ঘিরে। বণিকের জীবন আবর্তিত হয় লাভ-লোকসানের হিসেবের চারপাশে। কারিগর নিজের হাতে যা সৃষ্টি করে, নিজের জীবনের মূল্যায়ন করে তা-ই দিয়ে। আর যোদ্ধা? যোদ্ধা জীবনকে দ্যাখে তার অস্ত্রের মধ্যে দিয়ে।”

তলোয়ার নামিয়ে শান্ত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েন কিষেনপ্রতাপ। তাঁর শ্বাসপ্রশ্বাস স্বাভাবিক, শরীর শিথিল, মুখে হালকা হাসি। দেখে বোঝার উপায় নেই যে একটু আগেই তিনি দ্রুতগতিতে ঝড়ের মতো আক্রমণ করছিলেন।

তাঁর উলটোদিকে দাঁড়িয়ে হাঁপায় হিমু। কিষেনপ্রতাপকে আটকাতে তার যেন সমস্ত শক্তি ক্ষয় হয়ে গেছে।

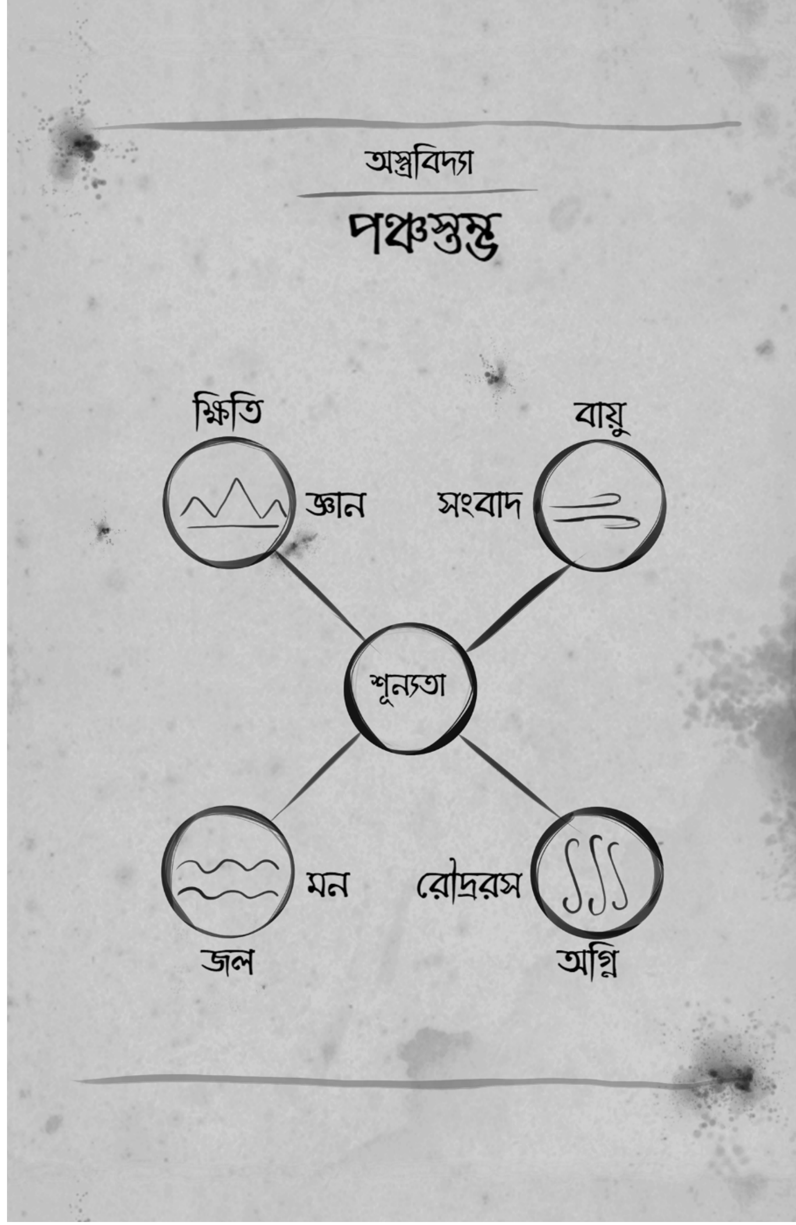
মাথা ডানদিকে ফেরান কিষেনপ্রতাপ, বাঁ হাঁটু ভাঁজ করে ডান পা ছড়িয়ে দেন ডানদিকে। তলোয়ার তুলে আনেন ওপরে। মুঠো বাঁ গালের কাছে, ফলা মাটির সঙ্গে

সমান্তরাল, ধার ওপরদিকে।

"এই ব্রহ্মাণ্ড যেমন পঞ্চভূতে গড়া, অস্ত্রবিদ্যাও তেমনি পাঁচটি স্তম্ভকে আশ্রয় করে দাঁড়িয়ে। ক্ষিতি, জল, অগ্নি, বায়ু ও শূন্যতা।''

শরীরের ভঙ্গি পালটান কিষেনপ্রতাপ। দুই পা দু-পাশে ছড়ানো। হাঁটু সামান্য ভাঁজ করা, কোমর নিচুতে। তলোয়ারের মুঠো নাভির কাছে, ফলা ডানদিকে ফেরানো, মাটির সঙ্গে সমান্তরাল।

"ক্ষিতি হল শস্ত্রবিদ্যার শাস্ত্র, তার সঞ্চিত জ্ঞান, তার নানান খুঁটিনাটি। দাঁড়াতে হলে মানুষের যেমন শক্ত জমির প্রয়োজন হয়, যোদ্ধাও তেমনি দাঁড়িয়ে থাকে শস্ত্রবিদ্যার তত্ত্বজ্ঞানকে আশ্রয় করে।"



আবার কোনওরকম সতর্কবাণী ছাড়াই হিমুকে আক্রমণ করেন কিষেনপ্রতাপ। একের পর এক তাঁর তলোয়ারের আঘাত সন্ধান খোঁজে হিমুর শরীরের অসুরক্ষিত অংশের। তার সমস্ত শক্তি আর দক্ষতা ব্যয় করে কোনওমতে আঘাত আটকায় হিমু।

"কিন্তু জিততে হলে কেবল অস্ত্রের তত্ত্বজ্ঞান যথেষ্ট নয়, অস্ত্রের পেছনে যে মন, তার ওপরেও যোদ্ধার সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ থাকা প্রয়োজন। যোদ্ধার মন হবে জলের মতন। জলের যেমন কোনও নির্দিষ্ট আকার নেই, আধারের আকারই যেমন জলের আকার, যোদ্ধাও সেইভাবে লড়াইয়ের প্রয়োজনমতো রূপ দেবে মনকে। স্বচ্ছ, নিস্তরঙ্গ জলে যেমন অনেক

দূর দৃষ্টি চলে, যোদ্ধাও তেমনি নিজের রণদৃষ্টিকে প্রসারিত করতে চিন্তার তরঙ্গকে শান্ত করে মনকে স্বচ্ছ রাখবে।”

অতি কষ্টে একবার পালটা আক্রমণ করতে সক্ষম হয় হিমু। অনায়াসে আঘাত এড়িয়ে যান কিষেনপ্রতাপ।

“যুদ্ধও এক ধরনের কলা। এই কলার মূল বৈশিষ্ট্য প্রচণ্ডতা। আগুন যেমন দাবানল হয়ে বিধ্বংসী রুদ্ররূপ ধারণ করে, যোদ্ধাকেও তেমনি যুদ্ধের সময় সংহারমূর্তি ধারণ করতে হয়ে। যোদ্ধা তাই নিরবচ্ছিন্ন অভ্যাসের মধ্যে দিয়ে নিজের মধ্যে ক্রমাগত রৌদ্ররসের সঞ্চার করবে।’’

হাঁপাতে থাকে হিমু। ঘামে তার সমস্ত শরীর ভিজে গেছে, বুকটা হাপরের মতো ওঠানামা করছে। অথচ কিষেনপ্রতাপের মধ্যে কোনও পরিবর্তন নেই। শান্ত, নিরাসক্ত ভঙ্গিতে আবার তলোয়ার তোলেন তিনি।

“তবে এ-ও জেনে রাখো যে আত্মকেন্দ্রিকতা অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসের জনক। বায়ু যেমন বয়ে আনে দূরের শব্দ, দূরের গন্ধ, যোদ্ধাও তেমনি নানা প্রান্তের যোদ্ধাদের রণকৌশল, শস্ত্রবিদ্যার সংবাদ রাখবে। অন্যকে জানলে তবেই নিজেকে পরিমাপ করা সম্ভব।”

কথা শেষ হতে-না হতেই আবার ঝড়ের বেগে হিমুর ওপর এসে পড়েন কিষেনপ্রতাপ। আঘাতের পর আঘাত নেমে তার আসে শরীর লক্ষ্য করে। তলোয়ারের ঠোকাঠুকিতে লেগে স্ফুলিঙ্গ ছড়িয়ে যায়, হিমুর মনে হয়, কেবল তলোয়ারের ঘূর্ণিঝড় ছাড়া সমস্ত জগতের অস্তিত্ব যেন লোপ পেয়েছে। তার মধ্যেই কোথাও দূর থেকে ভেসে আসে কিষেনপ্রতাপের কণ্ঠস্বর।

“কিন্তু এসবের ওপরেও আছে শূন্যতা। শূন্যতাকে বলে বোঝানো যায় না। তাকে অনুভব করতে হয়। এই ব্রহ্মাণ্ডের সমস্তই শূন্যতা থেকে শুরু হয়ে শূন্যতাতেই সমাপ্ত হয়। প্রকৃতির এই ছন্দে একবার নিজেকে সম্পূর্ণরূপে নিমজ্জিত করতে পারলে যোদ্ধা অবচেতনভাবে তখন প্রকৃতির ছন্দে যুদ্ধ করে, শরীরী কৌশল ব্যবহার করে নয়।”

কিষেনপ্রতাপের আক্রমণের তীব্রতা আর প্রতিহত করতে পারে না হিমু, মাটিতে গড়িয়ে পড়ে যায়।

তলোয়ার নামিয়ে তাকে হাত ধরে ওঠান কিষেনপ্রতাপ, “রজতকে হারাতে গেলে তোমাকে শূন্যতাকে করায়ত্ত করতে হবে।’’

১৫

শীত পুরোদস্তুর জাঁকিয়ে পড়েছে। হাড়-কাঁপানো ঠান্ডায় ঝোড়ো হাওয়া শুকনো পাতা উড়িয়ে শনশন আওয়াজ তুলে ছুটে যায় গলি দিয়ে। তার ধাক্কায় ফটক-দেওয়া বাড়িটার জানলা-দরজা ঠকঠক করে কেঁপে ওঠে।

বাড়ির ভেতরে কাগজপত্র-ছড়ানো টেবিলের পেছনে বসে থাকেন শুভা। ঘরের কোণে তেপায়া আতশদানে আগুন জ্বলে, তার আঁচের উষ্ণতা যেন প্রতিফলিত হয় তাঁর মুখে।

তাঁর সামনে অসহায় মুখে দাঁড়িয়ে থাকে রবি, সে যেন নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছে না।

“চলে গেছে! মিতা চলে গেছে?”

বিরক্তির স্বরে শুভা বলেন, “হ্যাঁ, তা-ই তো বললাম, দিন দশেক আগে চলে গেছে।’’

“কিন্তু কী এমন হল, হুজরাইন, যে চলে গেল?” বেদনা-মাখা কণ্ঠস্বরে প্রশ্ন করে রবি।

টেবিলে রাখা একটা কাগজ ছুরি দিয়ে কাটেন শুভা, “সে আমি আর কী করে জানব বলো? আমায় বলে কি আর গেছে? সেনেটর কৃষ্ণেন্দুর বাড়ি থেকে এক মাস আগে চলে এল। শুনলাম, ওঁর মহলে কী সব দাঙ্গাহাঙ্গামা হয়েছে। ভাবলাম, বাচ্চা মেয়ে, হয়তো ভয় পেয়েছে, একটা দোকানে কাজ জোগাড় করে দিলাম। দিন সাতেক আগে সে কাজও ছেড়ে দিয়ে চলে এল। এবার একটু বকাবকি করলাম, তার পরের দিন সকালে উঠে দেখি ঘরে নেই।’’

কাগজের ওপর কর্কশ আওয়াজ করে শুভার ছুরি চলে। সেদিকে তাকিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফ্যালে রবি, “কোথায় গেল, কিছু আন্দাজ করতে পারেন, হুজরাইন?”

হাতের ছুরিটা নামিয়ে রাগত স্বরে শুভা বলেন, “এক কথা আর কতবার বলব? জানলে তো তোমায় বলেই দিতাম। দ্যাখো, কোনও একটা ছোঁড়াকে পটিয়ে তার সঙ্গে ভেগে পড়েছে হয়তো।”

চোখের কোণটা হাতের উলটো পিঠ দিয়ে মুছে নেয় রবি, “হ্যাঁ, তা তো ঠিক, আপনিই বা কী করে জানবেন! হুজরাইন, যদি আপনার আপত্তি না থাকে তাহলে মিতার জিনিসপত্রগুলো দেখতে পারি? যদি কিছু আন্দাজ পাই, কোথায় গেছে।”

“আচ্ছা যাও।” নিমরাজি হয়ে গম্ভীর মুখে বলেন শুভা।

একটা বুড়ি কাজের লোক রবিকে মিতার বিছানার কাছে নিয়ে যায়। বিছানা উলটে-পালটে দ্যাখে রবি, কিন্তু কোথায় গেছে, কেন গেছে, তার কোনও হদিশ পাওয়া যায় না।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়ায় রবি, “যাক গে, আর কী করা যাবে। যেখানেই থাকুক, ভালো থাকুক।”

নিজের বাক্স থেকে একটা বোতল বের করে বুড়ির দিকে এগিয়ে ধরে রবি, “মিতার জন্যেই আমার আসা-যাওয়া ছিল, তোমাদের সঙ্গেও দেখা হত। আর হয়তো কোনওদিন আসা হবে না। এইটা রেখে দাও, ভালো ফুলেল মদ, রাতে সবাই ভাগ করে খেয়ো।”

কান-এঁটো-করা হাসি হেসে বোতলটা হাত বাড়িয়ে নেয় বুড়ি।

আর-একবার দীর্ঘশ্বাস ফেলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায় রবি।

১৬

রাত বেশি হয়নি, কিন্তু তুষার পড়ে অবিশ্রান্তভাবে। জনমানবহীন রাস্তা ডুব দিয়েছে বরফের নীচে। বরফের চাদর মুড়ি দিয়েছে হকিঙ্গাবাদের বাড়িঘরও, কেবল তাদের জানলার ফাঁক দিয়ে নীলচে আলো চুইয়ে আসে।

কাঁসরপাড়া থেকে একটু দূরে একটা কন্টেনার ডিপোয় একসঙ্গে বসে কওমি পলটনের নেতারা কারও প্রতীক্ষা করে। অগুনতি খাটো পায়ে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে সারি সারি কন্টেনার, ক্রিস্টাল লণ্ঠনের আলোয় তাদের ছায়া পড়ে দেওয়ালে।

বোতল থেকে গ্লাসে ঠররা ঢেলে হাতে হাতে এগিয়ে দেয় একজন। হাত বাড়িয়ে গ্লাস নেয় অতীন, “আপাতত এটা পরিষ্কার যে হকিঙ্গাবাদ থেকে আমরা আর কোনও সাহায্য পাব না। দৌলতনগরের গভর্নর আমাদের সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। আমাদের অন্তত একবার তার কথাটা শোনা দরকার।”

ঘাড় নেড়ে সায় দেয় সবাই। গ্লাসে চুমুক দেয় অতীন, “কিন্তু পেছনে শত্রু ফেলে যাওয়াটা বোকামি। ব্রিগেডিয়ার উজ্জ্বল এককালে আমাদের নেতা ছিল, আমাদের অনেক খবর জানে, আমরা না থাকলে আমাদের অনেক ক্ষতি করে দিতে পারে। সুতরাং দৌলতনগর যাওয়ার আগে উজ্জ্বলকে খতম করাটা দরকার।”

এবারেও ঘাড় নেড়ে সায় দেয় সকলে।

সবার মুখের দিকে তাকায় অতীন, “উজ্জ্বল সেনেটের ব্রজেশের ছেলেয় বিয়ের মজলিশে গেছে। মজলিশ থেকে সেরে ফেরার সময়ে এই ডিপোর কাছ দিয়েই যাবে। আমাদের তখনই যা করার করতে হবে।”

“তাহলে এখন কী করব?'' দলের মধ্যে থেকে কেউ প্রশ্ন করে।

“অপেক্ষা!” ছোট্ট জবাব দেয় অতীন।

বাইরে বিরামহীনভাবে তুষার পড়ে চলে, ডিপোর মধ্যে কওমি পলটনের লোকজন অপেক্ষা করে।

ঘণ্টাখানেক বাদে বরফের ওপর দিয়ে হাঁটার আওয়াজ হয়, আধা-অন্ধকার ডিপোয় একজন তলোয়ারবাজ এসে ঢোকে।

অধীর আগ্রহে উঠে দাঁড়ায় অতীন, “বলো মিলন? আসছে?”

নাথা নাড়ায় মিলন, “হ্যাঁ, সেনেটর ব্রজেশের মহল থেকে দুখানা পালকি একসঙ্গে রওনা দিয়েছে। ঠান্ডার জন্যে পালকি কাপড়ে ঢাকা, তবে একটা পালকিতে সেনেটর কৃষ্ণেন্দুর খানদানের নিশান লাগানো, আর অন্যটাতে উজ্জ্বলের।”

“কৃষ্ণেন্দু! কৃষ্ণেন্দু আর উজ্জ্বল দুজনে একসঙ্গে! এবার কী করব আমরা?” প্রশ্ন করে সোমনাথ।

“কী আর করব! দুজনকেই মারব।'' তাচ্ছিল্যের সঙ্গে উত্তর দেয় অতীন, “সেদিনকেও এই কৃষ্ণেন্দু উজ্জ্বলের কথা বলছিল। বোঝাই যাচ্ছে, দুজনে হাত মিলিয়েছে।”

“না!” হাত তুলে বাধা দেয় বিপুল, ‘‘কৃষ্ণেন্দু সরাসরি আমাদের বিপক্ষে যায়নি। তাকে মেরে শত্রুবৃদ্ধি করার দরকার নেই।”

“তাহলে উজ্জ্বলকে মারব কীভাবে? দুজনে তো একসঙ্গে রয়েছে।” জানতে চায় সোমনাথ।

"এক কাজ করা যাক,'' উত্তর দেয় বিপুল, "আমরা এখানে আক্রমণ করব না। আমরা পালকি দুটোর পেছন পেছন যাব। তারপর কৃষ্ণেন্দুর পালকিটা উজ্জ্বলের থেকে আলাদা হয়ে গেলে উজ্জ্বলকে আক্রমণ করব।"

"আর যদি দুটো পালকি আলাদা না হয়?'' প্রশ্ন করে অতীন।

দু-পাশে হাত ছড়িয়ে দেয় বিপুল, "তখন তাহলে দুজনকেই মারতে হবে।"

বিপুলের দিকে তাকায় সোমনাথ, "ফাঁকা রাস্তায় এতজন মিলে পালকির পিছু নেওয়া যাবে না, টের পেয়ে যাবে।''

মাথা নাড়ে বিপুল, "ঠিক আছে, সবার আসার দরকার নেই। আট-দশজনকে নিয়ে আমি যাচ্ছি। উজ্জ্বলকে মারতে তার চাইতে বেশি লোক দরকার নেই। বাকিরা এখানেই থাক।''

"আর রাজেন?" রজতের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করে অতীন।

"রাজেন আসুক। তবে একটু পেছনে থাকুক। দরকার পড়লে আমরা ডেকে নেব।" উত্তর দেয় বিপুল।

১৭

রাত আরও গভীর হয়েছে, তুষারপাত হয়ে চলেছে বিরামহীনভাবে। ফুলের দোকানের বাড়িটা জানলা-দরজা আঁটা, লোকজনের সাড়াশব্দ নেই। দোতলার একটা ঘরে দুটো তেপায়া আতশদানে আগুন জ্বলে। তাদের উষ্ণতা আটকে রাখে বাইরের হাড়-জমানো ঠান্ডাকে। আগুনে ফেলা কাঠফুলের সুগন্ধে মেশে একটা ছিপি-খোলা বোতল থেকে উঠে-আসা ফুলেল মদের মাদক গন্ধ।

ঘরের একটিমাত্র বিছানায় কম্বলমুড়ি দিয়ে আধশোয়া হয়ে বসে থাকেন শুভা। তাঁর ঢুলুঢুলু চোখ দেখলে বুঝতে অসুবিধে হয় না যে ওই বোতলের কিছুটা তরল তাঁর মধ্যে ইতিমধ্যেই স্থানান্তরিত হয়েছে।

শুভার পায়ের কাছে কম্বলের মধ্যে মাথা ঢুকিয়ে নিমু তার আঙুলের জাদু দেখায়। সে জাদুতে মাঝে মাঝেই শুভা চমকে উঠে জোরে শ্বাস টানেন এবং কম্বলের নীচে নড়তে-থাকা নিমুর মাথাটা দু-হাতে চেপে ধরেন।

হঠাৎ নিমুর জাদু বন্ধ হয়ে যায়, আর তার দেহটা কম্বলের তলা থেকে হড়কে বেরিয়ে এসে দড়াম করে মাটিতে আছাড় খায়। ভয়ে আর ব্যথায় আর্তনাদ করে ওঠে নিমু।

ফুলেল মদ আর নিমুর আঙুলের জাদুর ঘোর একই সঙ্গে কেটে যায় শুভার। তিনি আতঙ্কিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখেন, ঘরের মেঝেয় নিমু মুখ থুবড়ে পড়ে রয়েছে, আর দু-পা দু-হাতে ধরে দাঁড়িয়ে রয়েছে একটা কালো মুখোশ-পরা লোক।

নিমুর পা দুটো লোকটা আচমকা ছেড়ে দিয়ে কোমর থেকে একটা ছোরা বের করে। পা মাটিতে ঠোকায় নিমু, আর একবার ককিয়ে ওঠে, আর শুভা আতঙ্কে চমকে উঠে চেঁচিয়ে ওঠেন, ‘চোর, চোর’ বলে।

মুখোশ-পরা লোকটা শুভার চিৎকার গ্রাহ্য করে না। একটা চেয়ারে আয়েশ করে বসে বলে, “চ্যাঁচামেচি করে লাভ নেই। মদে যা ডোজ ছিল, কাজের লোকজন কেউ কাল দুপুরের আগে উঠবে না। সব নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে!”

লোকটার কথার অর্থ বুঝতে না পেরে তাকিয়ে থাকেন শুভা।

“চিনতে অসুবিধে হচ্ছে?” মুখ থেকে মুখোশটা খুলে ফ্যালে লোকটা।

বিস্ময়ে আর ভয়ে চেঁচিয়ে ওঠেন শুভা, “রবি! ডাকাত!”

একটা হাসি খেলে যায় রবির মুখে, “হ্যাঁ, আমি ডাকাত। এবার—”

রবির কথা শেষ হয় না, মাটিতে পড়ে-থাকা নিমু রবিকে লক্ষ্য করে লাফ দেয়।

চেয়ার ছেড়ে নড়ে না রবি। কেবল একটা পা বাড়িয়ে নিমুর পায়ে জড়িয়ে তাকে ফের ফেলে দেয়।

নিমু আর-একবার মুখ থুবড়ে পড়তেই রবি নিচু হয়ে তার হাতের একটা আঙুল একেবারে পেছনদিকে উলটে দেয়।

মট করে হাড় ভাঙার আওয়াজ ওঠে, নিমু তারস্বরে চিৎকার করতে আরম্ভ করে। কিছুটা যন্ত্রণায় আর কিছুটা তার জাদুর আঙুল খোয়ানোর দুঃখে।

একটা বালিশের ওয়াড় তার মুখে ঠুসে দিয়ে তার ঘাড়ে একটা পা রেখে চেয়ারে আয়েশ করে বসে রবি।

ভয়ে ঠকঠক করে কাঁপতে থাকেন শুভা, “ওই ঘরের আলমারিতে একটা টাকার থলে আছে, নিয়ে চলে যাও। কিন্তু প্রাণে মেরো না।”

মাথা নাড়ে রবি, “না! টাকাপয়সা চুরি করতে আমি আসিনি।”

কাঁপুনি কিছুটা কমে শুভার। বিস্মিত কণ্ঠে তিনি প্রশ্ন করেন, “তবে?”

শুভার চোখে চোখ রেখে রবি পালটা প্রশ্ন করে, “মিতা কোথায়?”

“মিতা? মিতা তো চলে গেছে!” কেমন তাড়াহুড়ো করে বলেন শুভা।

হাতের ছোরাটা শুভার দিকে ছুড়ে দেয় রবি। তাঁর কান ঘেঁষে ছুটে গিয়ে ছোরাটা দেওয়ালে বিঁধে কাঁপতে থাকে তিরতির করে। আতঙ্কে চিৎকার করে ওঠেন শুভা।

আবার মাথা নাড়ে রবি। আঙুল তুলে দেখায় দেওয়ালে বেঁধা ছোরাটাকে, “না, যায়নি। ওই ছোরাটা দিয়ে সেদিনকে তুই কাগজ কাটছিলি। ওটা আমিই মিতাকে রুসোগঞ্জে দিয়েছিলাম। মিতা নিজে থেকে চলে গেলে ওটা ফেলে যেত না।”

মাটিতে পড়ে-থাকা নিমু আবার ওঠার চেষ্টা করে। তার পেটে একটা লাথি কষিয়ে দেয় রবি, “এই বাঞ্চোত। চুপচাপ পড়ে থাক। নইলে বাকি আঙুলগুলোও ভেঙে দেব।”

চেয়ার থেকে উঠে দেওয়াল থেকে ছোরাটা খুলে নেয় রবি। শুভার চুলের মুঠি ধরে ছোরার ডগাটা চেপে ধরে তাঁর চোখের নীচে, “বলবি? না চোখটা তুলে নেব?”

ভয়ে ঠকঠক করে কাঁপতে থাকেন শুভা, “না! না! বলছি! বলছি! নিমু ভালো খদ্দের পেয়েছিল, বেচে দিয়েছি!”

ছোরাটা কোমরে গুঁজে শুভার গালে একটা থাপ্পড় লাগিয়ে দেয় রবি, “ভালো খদ্দের!” তার কণ্ঠস্বর শুনে মনে হয় সে যেন নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছে না, “কোথায় বেচেছিস?”

“বাইজি কোঠায়।” ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলেন শুভা।

শুভার চুলের মুঠিটা ধরে আবার নাড়ায় রবি, “কোন বাইজি কোঠায়?”

“দৌলতনগরে।”

“দৌলতনগরে!” রবির কণ্ঠস্বরে বিস্ময় ঝরে পড়ে!

“হকিন্সাবাদে বেচলে জানাজানি হয়ে যেতে পারে, তাই—!”

শুভার চুলের মুঠি টানে রবি, “বাঃ! ব্যাবসা বুদ্ধি তো টনটনে দেখছি! দৌলতনগরের কোথায়?”

“রূপমঞ্জিলে।” কান্না-ভেজা গলায় উত্তর দেন শুভা।

“রূপমঞ্জিলে!” আর্তনাদ করে উঠে শুভাকে চড়ের পর চড় মারতে থাকে রবি, “রূপমঞ্জিলে! হারামজাদি মাগি, তুই বাচ্চা মেয়েটাকে ওই নরকে পাঠিয়ে দিয়েছিস!”

কয়েক মিনিট বাদে রবির মেজাজ ঠান্ডা হয়। ফোঁপাতে-থাকা শুভাকে ছেড়ে দিয়ে চেয়ারে বসে একটা ভারী নিশ্বাস ফ্যালে।

"বাপ-মায়ের ঠিক নেই, জ্ঞান হয়ে থেকে চুরি করছি। কখনও টাকাপয়সা, কখনও গয়নাগাটি, কখনও কোনও দামি জিনিস, সারাজীবন ধরে লোকের থেকে নিয়েই গিয়েছি কেবল। এই মেয়েটাকে পেয়ে এই প্রথম মনে হল, না নিয়ে বরং তাকে কিছু দিই। নেওয়ার চাইতে দেওয়াতে যে এত আনন্দ, এর আগে জানতাম না। ভেবেছিলাম, ধুমধাম করে মেয়েটার বিয়ে দেব, তার বাচ্চাগুলো আমার কোলেপিঠে চড়ে খেলবে। তুই খানকি মাগি সেসব ইচ্ছেয় জল ঢেলে দিলি।"

কোমর থেকে ছোরাটা টেনে বের করে করে রবি। শিউরে ওঠেন শুভা, "মেরো না, আমাকে মেরো না। টাকাপয়সা যা আছে, সব নিয়ে যাও, কিন্তু মেরো না।"

মাথা ঝাঁকায় রবি, "আমি চোর, টাকাপয়সা কি দামি জিনিস চুরি করি। কিন্তু তোরা বড় মানুষেরা তো দেখছি আমার চাইতেও বড় চোর রে! মানুষের জীবনটাই চুরি করে নিস।"

ছোরাটা শুভার দিকে তুলে ধরে রবি, "না, তোকে মারব না। মানুষ মারা আমার দ্বারা হবে না। কিন্তু তোর নাক-উঁচু-করা বড়মানুষি জীবনের মতো ঘুচিয়ে দেব। তোকে আর তোর এই নাগরকে ল্যাংটো করে একসঙ্গে দড়ি দিয়ে রাস্তার মোড়ে বেঁধে রেখে যাব। কাল থেকে সারা হকিন্সাবাদের খোরাক হবি তুই।"

একলাফে শুভার কাছে পৌঁছে গিয়ে ছোরা দিয়ে চড়চড় করে তাঁর পোশাক কাটতে আরম্ভ করে রবি। তাঁর কান্নাকাটি, কাকুতিমিনতি সব বৃথা যায়।

বাইরে তখনও একনাগাড়ে বরফ পড়ে চলেছে।

১৮

হাওয়ার শনশন শব্দের সঙ্গে বিরামহীনভাবে তুষারপাত হয়ে চলে। রাস্তার গোড়ালি-ডোবা বরফের আস্তরণের ওপর বাতিস্তম্ভের নীলচে আলো পড়ে। তার মধ্যে দিয়ে ঘসঘস শব্দ তুলে দুটো পর্দা-ফেলা পালকি হাঁটে। পালকির সামনে পালকিবরদার পালকির রশি ধরে হাঁটে, পালকির পেছনে হাঁটে বরকন্দাজরা।

বাড়ির আনাচকানাচ থেকে দুটো পালকির ওপর নজর রাখে কওমি পলটনের আট-দশজন লোক। তাদের সর্বাঙ্গ মোড়া গরম পোশাকের ওপর তুষারের সাদা আস্তরণ।

কন্টেনার ডিপো ছাড়িয়ে এগিয়ে যায় পালকি দুটো। তাদের পেছনে তুষার মাথায় নিঃশব্দে হাঁটে কওমি পলটনের লোকেরা। আর তাদের কিছুটা পেছনে হাঁটে রজত।

দু-এক কিলোমিটার যাওয়ার পর একটা মোড়ে এসে একটা পালকি অন্য একটা রাস্তা নেয়, বরকন্দাজরা সেটাকেই অনুসরণ করে। অন্য পালকিটা পালকিবরদারের পেছনে হাঁটতে থাকে আগের রাস্তা ধরে।

তুষারকণার মধ্যে দিয়ে পালকিটাকে ভালো করে একবার ভালো করে দেখে নেয় বিপুল, "উজ্জ্বলের নিশান। এই পালকিটাই।"

একজন মিসাইল লঞ্চারে মিসাইল কাঠি বসায়। হাত নেড়ে বাধা দেয় বিপুল, "মিসাইল না। দু-দিকে অনেক বাড়ি আছে। আওয়াজ হবে।''

আস্তে আস্তে পালকির কাছে এগিয়ে যায় দলটা। ছুটে গিয়ে একজন অতর্কিতে পালকিবরদারের ঘাড়ে তলোয়ারের কোপ মারে। লুটিয়ে পড়ে পালকিবরদার, দড়িতে তার হাতের টানে থেমে যায় পালকি। আর-একজন ছুটে গিয়ে পালকির পাশে ফেলা পর্দায় তলোয়ারের খোঁচা মারে, "বেরিয়ে আয় হারামজাদা!"

উত্তরে পর্দার পেছন থেকে একটা তলোয়ারের ডগা বেরিয়ে এসে হামলাকারীর বুকে আমূল বিঁধে যায়। আর সে রক্তাক্ত দেহে মাটিতে লুটিয়ে পড়ার আগেই পালকি থেকে যে লোকটা লাফিয়ে নামে, তুষারপাত আর ঝাপসা নীলচে অন্ধকারের মধ্যেও তাকে দূর থেকে চিনতে অসুবিধে হয় না রজতের।

কিষেনপ্রতাপ।

খুব সম্ভব বিপদ আন্দাজ করে উজ্জ্বল নিজের পালকিতে কিষেনপ্রতাপকে তুলে দিয়েছে।

"এই, তোমরা কারা? আমার সঙ্গে তোমাদের কীসের দুশমনি?" তলোয়ার হাতে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করে কিষেনপ্রতাপ।

"তুমি কে?'' পালটা প্রশ্ন করে বিপুল, "উজ্জ্বল কোথায়?''

"আমি অনির্বাণ আখড়ার কিষেনপ্রতাপ। নিজের পালকি ছিল না, তাই উজ্জ্বলের পালকিতে বাড়ি ফিরছি।" উত্তর দেন কিষেনপ্রতাপ, "কিন্তু তোমরা কে? খামোখা আমার

ওপর হামলা করলে কেন?”

“উজ্জ্বলের পালকিতে এসেছে যখন, তখন উজ্জ্বলের বন্ধুই হবে। মার শালাকে!” বিপুলের একজন সহকারী চিৎকার করে বলে।

তলোয়ার বাড়িয়ে ধরেন কিষেনপ্রতাপ, “দ্যাখো, তোমাদের সঙ্গে আমার কোনও শত্রুতা নেই। হয়তো তোমাদের বুঝতে কিছু ভুল হয়েছে। বৃথা রক্তপাত করে লাভ নেই। আমাকে যেতে দাও।”

উত্তরে চিৎকার করে বিপুল সমেত পুরো দলটা তলোয়ার তুলে তাঁকে চারদিক থেকে আক্রমণ করে।

পলটনের তলোয়ারবাজদের পায়ের ধাক্কায় বরফের গুঁড়ো ছিটকে ওঠে, হাহাকার-করা বাতাসে সেই বরফ গুঁড়ো পাক খেয়ে ওঠে ওপরের দিকে। বাতিস্তম্ভের নীলচে আলোয় মনে হয়, কিষেনপ্রতাপকে ঘিরে ধরেছে বরফের তুফান।

বাঁদিক থেকে মাথার ওপর তলোয়ার তুলে ছুটে-আসা একজনের পথ থেকে শরীরটাকে সামান্য হেলিয়ে সরিয়ে নেন কিষেনপ্রতাপ। সে যখন পাশ দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে, তার পিঠের ওপর আছড়ে পড়ে তাঁর তলোয়ার। সঙ্গে সঙ্গে ডানদিকে লাট্টুর মতো ঘুরে যান তিনি, এক কদম হটে যান পেছনে। তাঁর মাথা লক্ষ্য করে নেমে-আসা একটা তলোয়ার তাঁর শরীরকে আঘাত না করেই নেমে যায় নীচে। মুহূর্তের মধ্যে কিষেনপ্রতাপ মাথার ওপর তলোয়ার তুলে আঘাত করেন তলোয়ার ধরে থাকা হাতটায়। কবজি থেকে হাতটা বিচ্ছিন্ন হয়ে তলোয়ার সমেত ছিটকে পড়ে মাটিতে। কাটা হাত থেকে ছড়িয়ে-পড়া রক্ত বাতিস্তম্ভের নীল আলোয় কালো দেখায়। মনে হয়, সাদা বরফের ওপর বুঝি কিছুটা কালি ছিটকে পড়ল।

আর-একজন পেছন থেকে দৌড়ে আসে। কিষেনপ্রতাপ পেছনে ফেরার প্রয়োজনও বোধ করেন না। ডান হাতে ধরা তলোয়ারের ফলাটা শরীরের পেছনে ফিরিয়ে নীচ থেকে ওপরে তুলে দেন। আক্রমণকারীর পেট থেকে বুক অবধি লম্বালম্বি চিরে যায়। তুষার-ওড়ানো বাতাসের কান্নার সঙ্গে মেশে মানুষের আর্তনাদ।

দূর থেকে তুষারের ঝাপসা পর্দার পেছন থেকে লড়াই দ্যাখে। আজ যে-কোনও কারণেই হোক, তার ভেতরের বুভুক্ষাটা অন্যদিনের মতো লড়াইয়ে যোগ দেওয়ার উৎসাহ দেখায় না।

মাথার ওপর তলোয়ার তুলে আবার একজন আক্রমণ করে কিষেনপ্রতাপকে। কয়েক পা পেছনে হটে তিনি তার রাস্তা থেকে সরে যান, তারপর আঘাত করেন তার কোমরে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে একজন তলোয়ার পিঠের পেছনে রেখে তাঁকে আক্রমণ করে বাঁদিক থেকে। সামনে কয়েক পা হেঁটে সরে যান কিষেনপ্রতাপ, তারপর পেছনে ঘুরে লোকটা তলোয়ার পিঠের পেছন থেকে তুলে আনার আগেই চিরে দেন তার পেট।

কওমি পলটনের সবাই এবার একসঙ্গে আক্রমণ করে কিষেনপ্রতাপকে। তাদের পা থেকে ছিটকে-ওঠা তুষারের ঘূর্ণিতে আড়াল পড়ে যান তিনি। কেবল বাতিস্তম্ভের নীল আলোর প্রতিফলনে তাঁর তলোয়ারটা আঁচ করা যায়। দূর থেকে ভালো করে বুঝতে পারে না রজত কী হচ্ছে। শুধু তার মনে হয়, একটা সাদা ঝড়ের কেন্দ্রে যেন নীল বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, আর প্রতিবার তার সঙ্গে তাল রেখে সাদা বরফের ওপর ছিটকে যাচ্ছে নীল আলোয় কালো দেখানো রক্ত। যেন কোনও রণদেবতা সাদা কাগজের ওপর কালো কালিতে লিখে চলেছেন এক ভয়ানক জঙ্গনামা[৮]।

দূর থেকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে দ্যাখে রজত, কিন্তু সেই সমরতুফানে পা রাখতে এগোয় না। তার ভেতরে যে ক্ষুধাটা উদ্দাম হিংস্রতার সন্ধানে সদাই উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকে, সেটা যেন আজ কোথায় লুকিয়ে পড়েছে।

কিষেনপ্রতাপের চারপাশের তুষারের ঘূর্ণির তীব্রতা কমে আসে। তাঁকে ঘিরে-ধরা তলোয়ারবাজরা দূরে সরে যায় তাঁর থেকে। একটা উঁচু পাঁচিলের দিকে পিঠ করে দাঁড়িয়ে পড়েন কিষেনপ্রতাপ। তাঁর দু-হাতে ধরা তলোয়ার সামনের দিকে উঁচু করে ধরা।

দু-পাশ থেকে সাবধানে দুজনে তলোয়ার উঁচিয়ে এগিয়ে আসে। কিষেনপ্রতাপ আস্তে আস্তে ডানদিকে ফেরেন, ডানদিকের আক্রমণকারী তাঁর ঘোরার সঙ্গে তাল রেখে কয়েক কদম পেছনে হটে যায়। কিষেনপ্রতাপের হাঁটু দুটো ভাঁজ হয়ে আসে, তাঁর তলোয়ারের ফলা ঘুরে যায় ডানদিকের হাঁটুর কাছে, তলোয়ারের হাতল-ধরা দুই মুঠো উঠে আসে বাঁদিকের কোমরের কাছে। সেই অবস্থা থেকে আচমকাই বাঁদিকে ঘুরে যান তিনি। ঘোরার সময়ে তাঁর হাঁটু দুটো সোজা হয়ে যায়, তলোয়ার ডানদিকের হাঁটুর কাছে থেকে কোনাকুনি উঠে যায় ওপরে বাঁদিকে। অতর্কিতে আক্রমণে নড়ার সুযোগ পায় না বাঁদিকের তলোয়ারবাজ, কিষেনপ্রতাপের তলোয়ার তার কণ্ঠনালি দু-ফাঁক করে দেয়।

ডানদিকের তলোয়ারবাজ তখন চলে এসেছে কিষেনপ্রতাপের পেছনে। বাঁ কাঁধের ওপর থেকে সে তলোয়ার চালায় তাঁর গলা লক্ষ্য করে। কিন্তু ততক্ষণে আবার হাঁটু ভাঁজ করে ফেলেছেন কিষেনপ্রতাপ, তলোয়ারের কোপ চলে যায় তাঁর মাথার ওপর দিয়ে।

ডানদিকে ঘুরে যান কিষেনপ্রতাপ। তাঁর দুই মুঠি বাঁ কানের কাছে, তলোয়ারের ডগা ফেরানো আকাশের দিকে। সোজা হয়ে তলোয়ার সেখান থেকে নেমে যায় তলোয়ারবাজের বাঁ কাঁধ থেকে ডানদিকের কোমর অবধি।

আবার ডানদিকে ঘুরে যান কিষেনপ্রতাপ, কেবল ডান হাতে তলোয়ার তুলে আঘাত করেন বাঁদিক থেকে ছুটে-আসা একজনের গলায়।

তবু লড়াইতে যোগ দেয় না রজত। তার স্বাভাবিক রণোন্মত্ততা আজ যেন তাকে পরিত্যাগ করে গেছে। বাতাসের হাহাকারের মাঝে দাঁড়িয়ে পাথরের মূর্তির মতো সে তুষারপাতের ঝরোখার মধ্যে দিয়ে লড়াই দ্যাখে। তার মাথা, কাঁধ, পোশাক তুষারকণা জমে সাদা হয়ে ওঠে।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই কিষেনপ্রতাপের চারপাশে ভিড়টা খালি হয়ে যায়। বাতাসের হাহাকার আর ইতস্তত ছড়ানো লাশের মাঝখানে কিষেনপ্রতাপের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে থাকে কেবল বিপুল।

লড়াইতে যোগ দিতে চেষ্টা করেও পেরে ওঠে না রজত। বহুকাল আগের এক রাত্রিতে, সেই উটিয়া বাঁদরের সামনে তার শরীর যেমন তার মনের আদেশ অমান্য করেছিল, আজও সে ঠিক সেইরকম অবস্থায় তুষারপাত আর বাতাসের আকুল কান্নার মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকে।

বিপুলের দিকে ফেরেন কিষেনপ্রতাপ, তাঁর ডান হাতে ধরা তলোয়ার নীচে নামানো। ফটক তরিকায় তলোয়ার তুলে তাঁর দিকে এক-পা এক-পা করে এগিয়ে আসে বটে বিপুল, কিন্তু কী করবে, মনস্থির করতে পারে না। সে একবার কিষেনপ্রতাপকে বেড় দিয়ে ঘোরার চেষ্টা করে। একবার তলোয়ার তোলে। একবার নামায়।

তলোয়ার নামিয়ে নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকেন কিষেনপ্রতাপ।

আবার তলোয়ার তোলে বিপুল।

কিষেনপ্রতাপের ডান হাতে ধরা তলোয়ারটা সাপের ছোবলের মতো উঠে আসে তার মাথা লক্ষ্য করে। কোনওমতে আঘাতটা নিজের তলোয়ার দিয়ে আটকায় বিপুল। দুটো

তলোয়ার ঠোকার আওয়াজ ছড়িয়ে যায় বাতাসে। তুষারকণায় মেশে আগুনের স্ফুলিঙ্গ।

কিষেনপ্রতাপের তলোয়ার-ধরা ডান হাতের মুঠোটা উঠে যায় তাঁর বাঁ কাঁধ অবধি। সেখান থেকে দু-হাতে হাতল ধরে আবার তিনি তলোয়ার নামিয়ে আনেন বিপুলের শরীরের দিকে।

এ আঘাতটাও কোনওমতে ঠেকায় বটে বিপুল, কিন্তু একটা বিকট আওয়াজ তুলে তার তলোয়ারের ফলা ভেঙে খানখান হয়ে যায়।

ছুটে পালাতে-যাওয়া বিপুলকে ঘাড় ধরে ছুড়ে ফেলেন কিষেনপ্রতাপ, পিঠে হাঁটু দিয়ে তাকে চেপে ধরেন বরফের মধ্যে।

"কে তুই? নাম কী তোর? কেন হামলা করলি আমার ওপর?''

উত্তর দেয় না বিপুল, শুধু অন্ধ আক্রোশে চিৎকার করে।

"তুই তো এদের নেতা মনে হচ্ছে।" গর্জন করেন কিষেনপ্রতাপ, "বোধবুদ্ধি নেই তোর? তোর জন্যে এতগুলো লোক অকারণে মারা গেল।"

উত্তর না দিয়ে চিৎকার করে চলে বিপুল। দূর থেকে নিশ্চেষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে দ্যাখে রজত।

হাতের তলোয়ারটা চারপাশে ঘুরিয়ে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে-থাকা লাশগুলো ইঙ্গিত করেন কিষেনপ্রতাপ, "উজবুক কোথাকার! দেখ তোর চারপাশে। এতগুলো লোক জানোয়ারের মতো মরে পড়ে আছে। এদের মৃত্যুর জন্যে তুই দায়ী। লজ্জা করে না তোর?"

উত্তর না দিয়ে ফাঁদে পড়া পশুর মতো কেবল চিৎকার করে চলে বিপুল। তলোয়ারের হাতলের প্রান্ত দিয়ে তার মাথায় সজোরে আঘাত করেন কিষেনপ্রতাপ।

চিৎকার বন্ধ হয়ে যায় বিপুলের। জ্ঞান হারিয়ে তার মাথাটা ঢলে পড়ে বরফে।

উঠে দাঁড়ান কিষেনপ্রতাপ। দূর থেকেই তলোয়ার উঁচিয়ে ধরেন রজতের দিকে। বাতাসের গর্জন সত্ত্বেও তাঁর কথাগুলো স্পষ্ট শুনতে পায় রজত।

"তলোয়ারই মন। মনই তলোয়ার। তলোয়ারকে জানলে মনকেও জানা যায়। অশুভ তলোয়ার, অশুভ মন।"

ক্রোধে জ্বলে ওঠে রজত, তলোয়ার টেনে বের করার চেষ্টা করে খাপ থেকে। কিন্তু অন্য সময় হাতলে হাত রাখলেই যে হাতিয়ার হিংস্র শ্বাপদের মতো রজতের মনের ভেতর জিঘাংসু রক্তপিপাসার আর্তি জানান দিতে দ্বিধা করে না, সেটা যেন আজ নির্বীর্য হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে।

মনের ভেতরে কয়েক বছর ধরে সযত্নে লালিত বুভুক্ষু উন্মত্ততাকে জাগিয়ে তুলতে চেষ্টা করে রজত। কিন্তু এই প্রথম সে তার সন্ধান পায় না। কিষেনপ্রতাপের উঁচিয়ে-ধরা তলোয়ার থেকে তার দিকে যেন ভেসে আসে এক অসীম শূন্যতার আভাস, যেখানে অস্তিত্ব আর অনস্তিত্ব দুই অনুপস্থিত। সেখানে মৃত্যু নেই, অমরত্ব নেই, দিনরাত্রির প্রভেদ নেই। আছে শুধু অন্ধকারে নিমজ্জিত আরও অন্ধকার। সেখানে রজত, তার ক্রোধ, তার রক্তলোভী উন্মত্ততা মুহূর্তের মধ্যে বিলীন, নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

রজতের শিরদাঁড়া দিয়ে এমন একটা ঠান্ডা স্রোত বয়ে যায়, যার সঙ্গে বাইরের তুষারের কোনও সম্পর্ক নেই।

তলোয়ারের হাতল থেকে হাত তুলে নিয়ে কিষেনপ্রতাপের সামনে থেকে দৌড়ে পালিয়ে যায় সে।

জনহীন রাস্তায় লাশের ওপর বরফ পড়তে থাকে।

১৯

সকালের নরম রোদ এসে পড়ে আখড়ার কাঠের মেঝেয়। জানলায় বসা দুটো রামধনু ফিঙে চিপ চিপ আওয়াজ করে নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করে। কাঠের গামলায় জল পড়ার আওয়াজ আর তাদের ডাক ছাড়া ফাঁকা আখড়ায় কোনও শব্দ নেই।

"তাহলে কওমি পলটনের নেতারা সব একসঙ্গে দৌলতনগর যাচ্ছে?" সামনে বসে-থাকা হিমুর দিকে তাকিয়ে বলেন কিষেনপ্রতাপ।

"হ্যাঁ ওস্তাদ। মন্টু একটু আগে তা-ই বলে গেল। ও কৃষ্ণেন্দুর মহলে কানাঘুষো শুনেছে যে কাল বা পরশুই ওরা একটা ব্লিম্প ভাড়া করে যাত্রা করবে।"

"হুঁ।" কয়েকটা চিন্তার রেখা পড়ে কিষেনপ্রতাপের কপালে, "রজত যদি দৌলতনগর থেকে আর না ফেরে, বা অন্য কোথাও চলে যায়, তাহলে তার সন্ধান পাওয়া মুশকিল হবে। এই দুশমনি আর জিইয়ে রাখতে দেওয়া যায় না।"

"তাহলে কী করব, ওস্তাদ?"

"তুমি রজতকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে চিঠি পাঠিয়ে দাও।"

"মন্টুর হাত দিয়ে?"

মাথা নাড়েন কিষেনপ্রতাপ, “না। মন্টুকে পাঠিয়ো না। রজত কী করবে, বলা যায় না। তুমি পোস্ট অফিস থেকে চিঠি পাঠিয়ে দাও।’’

“কখন ডাকব রজতকে লড়তে, ওস্তাদ?”

“কাল সকালে। দপ্তরখানার সামনের মাঠে।”

“কালকেই! কিন্তু আমি কি রজতের মুখোমুখি হওয়ার জন্যে তৈরি, ওস্তাদ?” বিস্মিত কণ্ঠে প্রশ্ন করে হিমু।

“না।” শান্তভাবে উত্তর দেন কিষেনপ্রতাপ। ‘‘রজতের সমকক্ষ হয়ে উঠতে গেলে তোমাকে এখনও অনেক অভ্যাস করতে হবে। কিন্তু তার সময় নেই। বহুদিন বাদে এই প্রথম রজতের আত্মবিশ্বাসে চিড় ধরেছে। এই তোমার সুযোগ। রজত তার আত্মবিশ্বাস ফিরে পাওয়ার আগেই তোমাকে আক্রমণ করতে হবে।”

“কিন্তু তা-ও কি আমি রজতের বিরুদ্ধে জিততে পারব?’’ ভয় নয়, সামান্য উদ্‌বেগের ছোঁয়া হিমুর কণ্ঠে।

“খুব সম্ভব না। তোমার মৃত্যু নিশ্চিত জেনেই তোমাকে রজতের সম্মুখীন হতে হবে।”

ঝগড়া বন্ধ করে উড়ে যায় জানলার পাখি দুটো।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আবার প্রশ্ন করে হিমু, “কিন্তু মৃত্যু অবধারিত জেনেও লড়তে যাওয়াটা কি একভাবে আত্মহত্যা নয়?”

“না,” হিমুর চোখে চোখ রেখে উত্তর দেন কিষেনপ্রতাপ, “জীবনের কাছে পরাস্ত হয়ে পালিয়ে যাওয়ার নাম আত্মহত্যা। যোদ্ধা পালানোর পথ খোঁজে না। যোদ্ধার কাছে জীবন শিশিরের বিন্দু কিংবা বিদ্যুতের ক্ষণপ্রভার মতোই। মৃত্যু তার স্বাভাবিক পরিণতি। যুদ্ধের ফলাফল সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিরাসক্ত হয়ে যোদ্ধা যুদ্ধে লিপ্ত হয়।’’

শরীরের দু-পাশে দু-হাত ছড়িয়ে একটা কবিতা আবৃত্তি করেন কিষেনপ্রতাপ, “হে যোদ্ধা, তোমার মৃত্যুর সময় যদি এসে থাকে নিকটে, আর তুমি মারা যাও, তাহলে ভালোই তো। আর মৃত্যুর সময় যদি এসে থাকে, তবু তুমি মারা না যাও, হে যোদ্ধা, সে তো আরও ভালো।”

“গুস্তাকি মাফ করবেন ওস্তাদ, কিন্তু এ কথাগুলো মহাকাল মন্দিরের ভিক্ষুদের মতো শোনাচ্ছে।’’

"অসম্ভব নয়।" মৃদু হাসি ফোটে কিষেনপ্রতাপের ঠোঁটের কোণে, "মহাকালের দর্শন আর তলোয়ারের মধ্যে মিল কোথায় জানো? দুটোরই উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষের 'আমি' বোধটাকে নাশ করা। এইটা বুঝতে পারলে তলোয়ারই তখন এই জীবন নামক প্রহেলিকার তালা খোলার চাবি হয়ে ওঠে।"

২০

খুঁটিপাড়ার আস্তানায় দেওয়ালে ঠেস দিয়ে সারারাত বসে থাকে রজত। যে ক্ষমতার ভিতের ওপর এতকাল তার জীবনটা দাঁড়িয়ে ছিল, কিষেনপ্রতাপের সঙ্গে একটিমাত্র মোলাকাতে সেই ভিত টলে গেছে। এতদিন নিজেকে অপ্রতিরোধ্য তলোয়ারবাজ মনে করা রজত এই প্রথম লড়াই থেকে পালিয়ে এসেছে।

পেরিয়ে-আসা জীবনের সবটাই রজতের আজ হঠাৎ কেমন মূল্যহীন, ফাঁপা লাগে। বহুকাল আগে হোমিগঞ্জের জঙ্গলে দেখা একটা কাঠের গুঁড়ির কথা মনে পড়ে তার। আজ তার নিজেকে সেই নিষ্পত্র, পচে-যাওয়া, পোকা-ধরা, মাটিতে অর্ধেক পোঁতা গুঁড়িটার মতো মনে হয়। যার কুসুমিত হওয়ার, পল্লবিত হওয়ার সমস্ত সম্ভাবনাই ফুরিয়ে গেছে। রয়ে গেছে কেবল যে-কোনও মূল্যে টিকে থাকার ইচ্ছেটুকু।

পুরোনো স্মৃতিগুলো ভিড় করে আসে রজতের মনে। অভিযোগের দৃষ্টি নিয়ে কতকগুলো মুখ যেন চেয়ে থাকে তার দিকে। বিজন। কালভৈরবের মন্দিরের এক অচেনা বৃদ্ধ। চিরাগ আখড়ার তলোয়ারবাজরা। বিভূতি। সবাই যেন নীরবে তাদের মৃত্যুর কৈফিয়ত দাবি করে তার কাছে।

একটা গোঙানির আওয়াজ বেরিয়ে আসে তার মুখ থেকে। একটু দূরে বসে থাকা রিমা অবাক চোখে তাকায় তার দিকে।

"কী হয়েছে তোমার? কাল সারারাত ধরে এখানে বসে রইলে? ছেলেটার ধুম জ্বর, বারণ করলাম, তা-ও রাতের বেলা বেরিয়ে গেলে! কী করছিলে অত রাত অবধি অত ঠান্ডার মধ্যে?"

উত্তর দেয় না রজত। নিজের তলোয়ারটা তুলে নিয়ে ন্যাকড়া দিয়ে পালিশ করতে করতে নিস্পৃহ কণ্ঠে বলে, "আমি কাল দৌলতনগর যাচ্ছি।"

“দৌলতনগর!” বিস্মিত কণ্ঠে বলে রিমা।

“হ্যাঁ, অতীন আর কওমি পলটনের বাকি লোকজনের সঙ্গে।’’

“আমাদের এই অবস্থায় ফেলে রেখে?” অসহায়ভাবে বলে রিমা, “ছেলেটার জ্বর, হাতে একটা পয়সা নেই, আমাদের কী হবে?”

উত্তর দেয় না রজত। পালিশ করা শেষ করে সে ছোট একটা কাপড়ে মোড়া হাতুড়ি ঠুকে ঠুকে তলোয়ারটা পরখ করে।

হাত দিয়ে চোখের কোণ থেকে জল মোছে রিমা, “আমাদের কী হবে, তাতে তোমার কিছু যায়-আসে না, না? দৌলতনগর যাওয়ার অছিলায় এবার আমাদের বরাবরের মতো ছেড়ে দিয়ে চলে যেতে চাও, না?”

উত্তর দেয় না রজত, ভাবলেশহীন মুখে নিজের মনে তলোয়ারের যত্ন করতে থাকে।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফ্যালে রিমা, “তুমি যখন ঠিকই করে নিয়েছ আমাদের আর তোমার প্রয়োজন নেই, তাহলে আমি চলে যাই। জানতাম, একদিন না একদিন এই সেই দিন আসবে।”

আবার চোখের জল মুছে দেরাজ থেকে জামাকাপড় বের করে ব্যাগ গোছাতে আরম্ভ করে রিমা, “একটা মানুষ এত দয়ামায়াহীন হয় কী করে?”

আস্তানার দরজায় একটা শব্দ হয়। কেউ একটা কাগজ দরজার তলা দিয়ে গুঁজে দিয়ে ঘণ্টা বাজিয়ে চলে যায়।

“সে তোমার খুশি, তুমি থাকবে কি যাবে।” কাগজটা তুলে নিয়ে চোখ বোলায় রজত, “কিন্তু যাবে কোথায়?’’

“তাতে তোমার কী?” রাগতস্বরে উত্তর দেয় রিমা, “আমি তোমাকে কোনও কৈফিয়ত দিতে বাধ্য নই।”

“তা ঠিক।” ব্যঙ্গে বেঁকে যায় রজতের মুখ, “পারলে যাওয়ার আগে তোমাকে কিছু উপহার দিতাম। কিন্তু কী করব, দেওয়ার মতো আমার কাছে কিছু নেই। তবে যাওয়ার আগে তোমাকে একটা ভালো খবর দিই।”

কাগজটা কোলে রেখে শব্দ করে খাপে তলোয়ার ঢোকায় রজত। ভয়ার্ত দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে থাকে রিমা।

"কাল সক্কালবেলা, দপ্তরখানার মাঠে হিমুর সমস্ত দুঃখকষ্ট আমি বরাবরের মতো ঘুচিয়ে দেব।"

কোলের কাগজটা রিমার দিকে ছুড়ে দিয়ে উঠে দাঁড়ায় রজত, "হিমু হারামজাদা আমাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছে। প্রথমে বিজন, তারপরে এই শালা হিমু। দুটোরই কপালে আমার হাতে খতম হওয়া লেখা ছিল।"

দু-হাতে কাগজটা ধরে বিস্ফারিত চোখে রজতের দিকে তাকিয়ে থাকে রিমা। তার সমস্ত শরীর কাঁপতে থাকে থরথর করে। তার মনে হয়, দু-বছর আগের এক বিয়োগান্ত নাটকের প্রারম্ভে আবার এসে দাঁড়িয়েছে সে।

"হ্যাঁ, হিমুকেও মেরে ফ্যালো!" একটা বুকফাটা চিৎকার বেরিয়ে আসে তার গলা থেকে, "মানুষ মারা ছাড়া তুমি জানোই বা কী? মেরে ফ্যালো, দুনিয়াসুদ্ধ সবাইকে মেরে ফ্যালো!"

একটা বিকৃত হাসি খ্যালে রজতের মুখে, "না, সবাইকে না। সবাইকে মারার দরকার নেই। হিমুর পর কেবল ওই ওস্তাদ কিষেনপ্রতাপ একদিন না একদিন আমার তলোয়ারের ডগায় তার জান খোয়াবে।"

বন্য শ্বাপদের মতো একটা বিশ্রী হাসি বেরিয়ে আসে রজতের গলা থেকে, "তবে চিন্তা কোরো না। হিমুকে তাড়াতাড়ি মারব না। খেলিয়ে খেলিয়ে, ধীরেসুস্থে ওর প্রাণ নেব।"

২১

ফাঁকা আখড়ায় নিজের মনে একাই তলোয়ার নিয়ে অভ্যেস করে হিমু, তার কপাল থেকে ঘাম ছিটকে পড়ে, বিকেলের পড়ন্ত আলো ইস্পাত কাচের ফলায় প্রতিফলিত হয়ে বিন্দু বিন্দু আলোর নকশা আঁকে দেওয়ালে।

ঘরে এসে ঢোকেন কিষেনপ্রতাপ, "তুমি মন্টুকে খবর দিয়েছ?"

তলোয়ার থামিয়ে মাথা নিচু করে হিমু, "হ্যাঁ ওস্তাদ, কাল একদম সকালে সোজা চলে আসতে বলেছি।"

হিমুর হাতের তলোয়ারের দিকে তাকান কিষেনপ্রতাপ, "আজ আর তোমার এত অভ্যাস করার প্রয়োজন নেই। বিশ্রাম নাও। তুমি যদি জেতার জন্যে ব্যাকুল হয়ে পড়ো, তাহলে হেরে যাবে।"

চুপ করে থাকে হিমু। আখড়ার গামলায় জল পড়া ছাড়া আর কোনও শব্দ হয় না।

হিমুর চোখে চোখ রাখেন কিষেনপ্রতাপ, "জিতে বাঁচার চেষ্টা কোরো না। বরং মৃত্যুর জন্যে মনকে প্রস্তুত করো। জেনে রাখো, সৃষ্টির বাইরে থেকে দেখলে মাথার ওপরের আকাশ আর তোমার পায়ের নীচে জমি— এই দুয়ের মধ্যে যা কিছু আছে, তার সব কিছুর মূল্য এক পাঁজা কাঠের সমানও নয়। সেসব হারানোর জন্যে তৈরি থাকলে তবু বিজয়ী হওয়ার একটা সম্ভাবনা থাকবে।"

ইতস্তত করে হিমু বলে, "ওস্তাদ, কাল লড়াইয়ের পর আমি আর না-ও ফিরতে পারি। তা-ও একটা কথা জানতে চাইছি। রজতের বাবা আমায় মৃত্যুশয্যায় বলেছিলেন যে রজতের ওপর অম্বালিকার অশুভ আত্মা ভর করেছে। আর আপনি সেদিন বললেন যে রজত যা করে তা তলোয়ারবাজি নয়। এই দুটো কথার মধ্যে কি কোনও যোগসূত্র আছে?"

মাথা নাড়ান কিষেনপ্রতাপ, "আছে। রজত তলোয়ার চালায় না। রজতের তলোয়ারই রজতকে চালায়। কিন্তু এর বেশি আমি আর এখন কিছু বলব না। রজত যদি কাল তোমার কাছে হারে তাহলে তোমার এই প্রশ্নের উত্তর আমি দেব।"

২২

রাত গভীর, তবু পাথরের মূর্তির মতো জেগে বসে থাকে রিমা।

রাতটুকু পোয়ালেই হিমু আর রজত মুখোমুখি হবে দ্বৈরথে। আর সে লড়াইয়ের পরিণাম নিয়ে রিমার মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। বিজনের মতো হিমুও প্রাণ দেবে রজতের হাতে। অকালে ফুরিয়ে যাবে আরও একটা নিরপরাধ প্রাণ।

রিমার মনের ভেতর দিয়ে তার অতীতের স্মৃতিগুলো সার বেঁধে একের পর এক ফোটোস্কেপের ছবির মতো চলে যায়। এশারগাঁওতে কাটানো শৈশব, বিজনের সঙ্গে ঘর বাঁধা, প্রথমবার হকিন্সাবাদ বেড়াতে এসে চোখে ধাঁধা লাগা, আরও পাওয়ার আশায় রজতের কাছে গিয়ে সব খোয়ানো।

একপাশে মেঝেতে শুয়ে-থাকা রজতের দিকে তাকায় রিমা। ঘুমোতে ঘুমোতে চমকে উঠে হাত-পা ছোড়ে রজত, তার হাতের আঙুল বেঁকে যায়, পিঠ ধনুকের মতো হয়ে যায়, গলা থেকে বেরিয়ে আসে গোঙানির মতো শব্দ। যেন সে কোনও ভয়ংকর দুঃস্বপ্ন দেখছে।

তার বিকৃত চোখ-মুখের দিকে তাকাতে তাকাতে হঠাৎ একটা ব্যাপার উপলব্ধি করে রিমা। রজতকে নৃশংস খুনি করে তোলার পেছনে তারও অবদান আছে। অতি উচ্চাকাঙ্ক্ষার বশবর্তী হয়ে যদি সেদিন সে রজতের কাছে না যেত, তাহলে শুধু বিজন নয়, আরও অনেক লোকের প্রাণ যেত না। রজত যাদের নির্বিচারে হত্যা করেছে, তাদের রক্ত তার হাতেও লেগে আছে। নিজের আর নিজের সন্তানের প্রাণের ভয়ে সে রজতকে আশ্রয় করে আছে বটে, কিন্তু রজতের সাহচর্যে কাটানো প্রতিটি দিন তাকে আরও নিবিড়ভাবে রজতের পাপের ভাগীদার করে তুলছে।

নিজের কর্তব্য স্থির করে নেয় রিমা। এই নরকের মতো জীবন থাকার চাইতে না-থাকা ভালো। তার প্রাণ যায় যাক, তবু প্রায়শ্চিত্ত করার অন্তত একবার চেষ্টা করে সে দেখবে।

কাপড়ের ভাঁজে লুকিয়ে-রাখা একটা ছোরা বের করে সন্তর্পণে হাঁটু ঘষে ঘষে রজতের ঘুমন্ত শরীরের কাছে সরে আসে রিমা। তারপরে এক মুহূর্তও ইতস্তত না করে ছোরা মাথার ওপর তুলে নামিয়ে আনে তার কণ্ঠনালি লক্ষ্য করে।

ছোরা রজতের শরীর স্পর্শ করে না। আচমকাই ঘুম ভেঙে যায় রজতের, এক হাতে চেপে ধরে সে রিমার ছোরা ধরা হাতের কবজি। যেন এই আক্রমণের জন্যেই অপেক্ষা করছিল সে। একটা জান্তব গর্জন বেরিয়ে আসে তার মুখ থেকে, "কী করছিস তুই হারামজাদি?"

উত্তর দেয় না রিমা, রজতের মুঠো থেকে হাত ছাড়িয়ে সে চেষ্টা করে তাকে আঘাত করতে।

কিন্তু রজতের শক্তির সঙ্গে পেরে ওঠা রিমার পক্ষে সম্ভব নয়। সজোরে তার হাত মুচড়ে দেয় রজত, তার মুঠো থেকে খসে পড়ে ছোরা। তাকে দু-হাতে ঠেলে ফেলে দিয়ে গর্জন করে ওঠে রজত, "শালা পাগলা মেয়েছেলে!"

উঠে দৌড়ে আস্তানার বাইরে পালিয়ে যায় রিমা। হুংকার করে তলোয়ার তুলে তার পেছনে ধাওয়া করে রজত।

বরফের আস্তরণে বাইরেটা সাদা হয়ে আছে। বাতাস কাচের মতো পরিষ্কার। আকাশে ঝকঝক করে অগুনতি তারা। নিস্তব্ধ, নিথর রাত্রে বরফের মধ্যে দিয়ে খালি পায়ে রজতের কাছ থেকে ছুটে পালাতে চেষ্টা করে রিমা।

প্রাণভয়ে মরিয়া হয়ে দৌড়োয় রিমা, আর তার পেছনে তলোয়ার নিয়ে তাড়া করে করে আসে রজত, মুখে তার ক্রূর হাসি।

ঘিঞ্জি খুঁটিপাড়ায় দৌড়োনোর জায়গা বিশেষ নেই। একটা চারদিক ঘেরা মাঠের মতো জায়গায় আটকে পড়ে রিমা, আর পালানোর পথ খুঁজে পায় না। মাঠের একপাশে একটা রাস্তা ঢালু হয়ে ওপরের দিকে উঠে গেছে। সেটা দিয়ে ওপরে উঠতে চেষ্টা করে রিমা, কিন্তু পা পিছলে গড়িয়ে পড়ে নীচে।

তলোয়ার হাতে তার দিকে ধীরপায়ে এগিয়ে আসে রজত। রজতকে এড়াতে গিয়ে ছুটতে ছুটতে একটা নোংরা জলের ডোবার মধ্যে পা পিছলে পড়ে যায় রিমা। সঙ্গে সঙ্গেই সে টের পায়, ঠান্ডায় তার শরীর অবশ হয়ে আসছে, তার আর পালানোর ক্ষমতা নেই।

তলোয়ার হাতে জলের মধ্যে নেমে আসে রজত, তাকে দেখে মনে হয় না, ঠান্ডা তার শরীরকে কোনওভাবে কাবু করতে পেরেছে। আগুনের মতো জ্বলে তার দু-চোখ, "তুই... তুই হিমুর জন্যে... আমাকে..."

রজতের ঠোঁট কাঁপে থরথর করে। তার কথাগুলো কেমন অসংলগ্ন শোনায়।

"না, হিমুর জন্যে নয়! হিমুর জন্যে নয়! তোমার জন্যে!'' সক্রোধে চেঁচিয়ে ওঠে রিমা।

"কী?'' থমকে যায় রজত। যেন সে বুঝতে পারছে না।

"তুমি না থাকলে আমার জীবনটা এমন নরক হয়ে উঠত না। এতগুলো লোকেরও হয়তো প্রাণ যেত না।" দু-ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ে তার চোখ থেকে। "আমার আর কিছু যায়-আসে না।" দু-হাত জোড় করে রিমা, "আমাকে এখানেই মেরে ফ্যালো রজত। কিন্তু হাত জোড় করছি, কাল তুমি স্বেচ্ছায় হিমুর হাতে প্রাণ দিয়ো। তাহলে হয়তো আমাদের দুজনেরই পাপের কিছুটা প্রায়শ্চিত্ত হবে।"

রিমার কথাগুলো রজতের কানে গেছে বলে মনে হয় না। একটা ক্রোধান্ধ চিৎকার করে সে রিমার বুকে তলোয়ারটা সজোরে বিঁধিয়ে দেয়।

আস্তানার ভেতরে বিছানায় শুয়ে-থাকা রিমার ছেলেটা হঠাৎ জেগে উঠে তারস্বরে কাঁদতে শুরু করে।

গম্ভীর মুখে তাকিয়ে থাকেন কিষেনপ্রতাপ, “আসেনি?”

মাথা নাড়ে হিমু, “না ওস্তাদ। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে যখন এল না তখন মন্টুকে ব্লিম্প টাওয়ারে খোঁজ নিতে পাঠালাম। কিন্তু ততক্ষণে ব্লিম্প চলে গেছে।”

ছলোছলো চোখে বসে-থাকা মন্টুর দিকে তাকায় হিমু, “তারপর খুঁটিপাড়ায় গিয়ে মন্টু দ্যাখে, গলির মধ্যে রিমার লাশ পড়ে আছে, আর আস্তানার ভেতর—”

হিমুর কথা শেষ হওয়ার আগেই মন্টুর পাশে কাঁথায় শোয়ানো বাচ্চাটা কাঁদতে শুরু করে। কোলে তুলে তাকে দোল দিতে শুরু করে মন্টু।

উদ্‌বিগ্ন দৃষ্টিতে কিষেনপ্রতাপের দিকে তাকায় হিমু, “এখন আমরা কী করব, ওস্তাদ?”

মন্টুর দিকে তাকিয়ে কিষেনপ্রতাপ বলেন, “তার চাইতে বড় প্রশ্ন, এই বাচ্চাটার কী হবে?”

“আমি মানুষ করব, হুজুর!” হাউমাউ করে চেঁচিয়ে ওঠে মন্টু, “বড়েসাবও তো আমাকে এমনি করে তুলে এনে মানুষ করেছিল।”

মাথা নাড়েন কিষেনপ্রতাপ, “বেশ। তাহলে তো ভালোই হল।”

মন্টুর দিকে তাকায় হিমু, “তুমি তাহলে কাল একে নিয়ে হোমিগঞ্জ চলে যাও, মন্টু। আমি চিঠি লিখে দেব, আমাদের বাড়িতে গিয়ে উঠো।”

ঘাড় নেড়ে বাচ্চাটাকে কোলে করে বিদায় নেয় মন্টু।

“আমিও কি তাহলে দৌলতনগর যাব, রজতকে ধরতে?'' প্রশ্ন করে হিমু।

আখড়ার জানলা দিয়ে পরিষ্কার নীলচে-সবুজ আকাশটা দেখা যায়। তার দিকে তাকান কিষেনপ্রতাপ।

“না। রজত তোমার জন্যে অপেক্ষা করে থাকবে। তলোয়ারবাজদের নিয়মকানুন, আদবকায়দার এখন সে আর পরোয়া করে না। তুমি গেলে নিজে না লড়ে কওমি পলটনের দলটাকে তোমার ওপর লেলিয়ে দেবে।”

“তাহলে কী করব?”

“তলোয়ারবাজির সময় যা করো। দুশমনের অসতর্ক মুহূর্তের অপেক্ষা করো। এখন দু-এক মাস চুপচাপ থাকো, রজতকে ভাবতে দাও যে তুমি হাল ছেড়ে দিয়েছ। তারপর দৌলতনগর গিয়ে তাকে খুঁজে বের কোরো।”

"ভাবতে পারিনি যে রজত পালিয়ে যাবে।" হতাশার সুর ফুটে ওঠে হিমুর কণ্ঠে, "দৌলতনগরের ভিড়ে রজতকে খুঁজে বের করা মুশকিল হবে।"

মাথা নাড়েন কিষেনপ্রতাপ, "হ্যাঁ, রজতের দৌলতনগর পালিয়ে যাওয়াটা আমাদের সমস্যা বাড়িয়ে দিল সন্দেহ নেই, কিন্তু এরও একটা ভালো দিক আছে। এতেই স্পষ্ট যে আমাদের শত্রু অপ্রতিরোধ্য নয়, সে-ও ভয় পায়।''

"শত্রু? মানে রজত?''

"না। রজত, রিমা এরা দাবার বোড়ে মাত্র। আমাদের প্রধান শত্রু অন্য কেউ। বা অন্য কিছু।''

সেদিনকার মতো রামধনু ফিঙে দুটো জানলায় এসে বসে ফের চিপ চিপ আওয়াজে ঝগড়া শুরু করে। চুপ করে কিছুক্ষণ তাদের ডাক শোনেন কিষেনপ্রতাপ।

"তুমি দু-দিন আগে আমাকে কিছু প্রশ্ন করেছিলে। তার উত্তরটা আজ দিই। মানুষ এই অম্বালিকায় এসে ভুল করেছিল। এখানে এসে মানুষ এক অশুভ শক্তির কবলে পড়েছে।''

"অশুভ শক্তি! বুঝলাম না, ওস্তাদ।"

"এই ব্রহ্মাণ্ডে শৃঙ্খলা আর বিশৃঙ্খলার মধ্যে হামেশা একটা টানাপোড়েন চলে। তোমার শরীর একটা শৃঙ্খলার অধীন। একে টিকিয়ে রাখতে তোমাকে শরীরের যত্ন নিতে হয়, তাকে পুষ্টি দিতে হয়। যদি না করো, তোমার শরীর প্রথমে রোগব্যাধির কবলে পড়বে, তারপর ভেঙে পড়বে। শৃঙ্খলার থেকে বিশৃঙ্খলার অধীনে চলে যাবে। যেমন তোমার শরীর, তেমনি এই সমাজের শরীর। এর নিয়মিত যত্ন না করলে এ-ও শৃঙ্খলার থেকে ক্রমশ বিশৃঙ্খলার দিকে চলে যায়।"

ঝগড়া থামিয়ে জানলা দিয়ে ভেতরে উড়ে এসে গামলার জলে ঝাঁপ দেয় পাখি দুটো। তাদের ডানা থেকে ছিটকে যায় মুক্তোর মতো জলের বিন্দু।

হাত তুলে হাতিয়ার র‍্যাকের দিকে ইঙ্গিত করেন কিষেনপ্রতাপ, "তোমাকে একটা প্রশ্ন করি, বৈজু। অম্বালিকায় আগ্নেয়াস্ত্র নেই কেন? কেন আমরা পৃথিবীর মধ্যযুগের মতো তলোয়ারের ব্যবহারে ফিরে গিয়েছি?"

একটু ইতস্তত করে জবাব দেয় হিমু, "অম্বালিকায় লোহা আর অন্য ধাতু অপ্রতুল বলে। ইস্পাত কাচ বিস্ফোরণের ধাক্কা সামলাতে পারে না।"

“মানলাম। কিন্তু তার বিকল্প কি কিছুই খুঁজে বের করা যেত না? ফোটোক্রিস্টালকে কি হাতিয়ারের রূপ দেওয়া যেত না?”

চুপ করে থাকে হিমু।

সামনে হাতটা ঘোরান কিষেনপ্রতাপ, “তোমার চারপাশে তাকিয়ে দ্যাখো বৈজু। সভ্যতার যে শিখরে পৌঁছে মানুষ পৃথিবী থেকে নক্ষত্রলোক পাড়ি দিয়ে অম্বালিকার উদ্দেশে যাত্রা করেছিল, অম্বালিকায় পৌঁছে মাত্র কয়েকশো বছরের মধ্যে সেই অবস্থা থেকে তার চূড়ান্ত অবনতি হয়েছে। পৃথিবীর মানুষ প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে লড়াই করত। আর অম্বালিকায় মানুষ প্রতিকূলতার মধ্যে নিজেকে কোনওমতে মানিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে। নিজের উদ্ভাবনী শক্তি, সৃজনশীলতা হারিয়ে ভিন্নরদের ফেলে-যাওয়া আস্তাকুঁড় থেকে প্রযুক্তি কুড়িয়ে বাঁচে। অম্বালিকায় পা রেখে মানুষ যেন ক্রমাগত পেছনের দিকে হাঁটছে। জ্ঞান, শিল্প, মনুষ্যত্ব প্রতিদিন অল্প অল্প করে হারিয়ে ফেলছে।’’

“কিন্তু কেন ওস্তাদ?’’

“সৃষ্টির আদিতে, যখন গ্রহ-নক্ষত্র দূরের কথা, কাল আর দিক পর্যন্ত জন্ম নেয়নি, তখন শৃঙ্খলা বলে কিছু ছিল না। কেবল ছিল অনন্ত বিশৃঙ্খলা। খুব সম্ভব ভিন্নররা সেই বিশৃঙ্খলার অন্তহীন শক্তিকে করায়ত্ত করতে চেয়েছিল। কিন্তু তাদের কোনও ভুলের দরুন স্থান আর কালের পর্দার পেছন থেকে সেই বিশৃঙ্খলার একটা চৈতন্যসূত্র এই শৃঙ্খলার জগতে ঢুকে পড়ে। এর প্রভাবে ভিন্নর সভ্যতা নষ্ট হয়ে যায়।”

“গুস্তাকি মাফ করবেন ওস্তাদ। কিন্তু এই সমস্ত কথা আপনি জানলেন কোথা থেকে?” অবিশ্বাসের সুর হিমুর কণ্ঠে।

“অসিমঠে।’’

“অসিমঠ! সে কোথায়, ওস্তাদ? তার কথা তো কখনও শুনিনি।” বিস্মিত কণ্ঠে প্রশ্ন করে হিমু।

“অসিমঠ উত্তর-পূর্বের পাহাড়ে। খুব কম লোকেই তার কথা জানে হিমু। এই অশুভ শক্তিকে পরাস্ত করার জন্যেই বহুকাল আগে অসিতপ বিভাস এর প্রতিষ্ঠা করেন।”

“ভিন্নররা কি এই শক্তিকে বাধা দেবার কোনও চেষ্টা করেনি?”

স্নানপর্ব সমাধা করে জানলা দিয়ে পাখি দুটো উড়ে চলে যায়। তাদের চিপ চিপ আওয়াজ মিলিয়ে যায় দূরে।

“কেউ কেউ হয়তো করেছিল। সে কথা জানার আর এখন কোনও উপায় নেই। কিন্তু ক্ষমতার লোভে ভিন্নরদের একটা গোষ্ঠী এই বিশৃঙ্খলার উপাসক হয়ে ওঠে। অম্বালিকার নানা জায়গায় ভূগর্ভে এদের উপাসনার কেন্দ্র ছিল। অম্বালিকায় আসার পর যখন আমাদের জ্ঞানের চর্চায় ভাটা পড়েনি, যারা এর বিপদ বুঝেছিল, তারা এসবের অনেকগুলো বুজিয়ে দেয়। কিন্তু সব নষ্ট করা যায়নি। রজত হয়তো এইরকমই কোনও উপাসনা গুহার সন্ধান পেয়ে থাকবে। এর সংস্পর্শে আসার পর এই শক্তি রজতকে আশ্রয় করে, তাকে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টির হাতিয়ার করে ফ্যালে।”

আখড়ায় অনেকদিন আগে রজতের চোখের পেছন থেকে উঁকি মারা উন্মত্ততার ছবিটা মনে পড়ে যায় হিমুর। নিজের অজান্তেই যেন শিউরে ওঠে সে।

“এর প্রভাবেই রজত মানুষ মারায় সিদ্ধহস্ত হয়ে উঠেছে?”

একটা লম্বা শ্বাস টানেন কিষেনপ্রতাপ, “হ্যাঁ। কিন্তু রজত যে শুধু নিজের হাতে মানুষ মারে তা-ই নয়। সে যেখানে যায়, তাকে কেন্দ্র করে বিশৃঙ্খলা চরমে ওঠে। হকিঙ্গাবাদে রাজনৈতিক সমস্যা ছিল। কিন্তু রজত আসার আগে পর্যন্ত সেটা এমন গৃহযুদ্ধের রূপ নেয়নি। রজত যেখানে যাবে, সেখানেই হানাহানি, অরাজকতা চরমে উঠবে। সেইজন্যে পিতা হয়েও অরূপ তোমাকে রজতকে প্রাণ নেবার অনুরোধ করেছিলেন। সেইজন্যেই আমি বলেছিলাম রজত যা করে তা তলোয়ারবাজি নয়। বিশৃঙ্খলার শক্তি তার মধ্যে দিয়ে লড়াইয়ের সময় নিজেকে ব্যক্ত করে।”

“কিন্তু ভিন্নরদের কী হল, ওস্তাদ? তারা কি সব নিজেদের মধ্যে মারামারি করে মরে গেছে?’’

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে উত্তর দেন কিষেনপ্রতাপ, “আমি একটা পালটা প্রশ্ন করি, হিমু। তুমি উটিয়া বাঁদর সম্বন্ধে কী জানো?”

“বন্য পশু। অত্যন্ত হিংস্র। লোকে বলে, ভিন্নররা একসময়ে এদের থেকেই বিবর্তিত হয়ে ধীমান প্রাণীতে পরিণত হয়।”

ধীরে ধীরে দু-পাশে মাথা নাড়ান কিষেনপ্রতাপ, “না, ভুল কথা। উটিয়া বাঁদররা বিবর্তনের ফলে ভিন্নরে পরিণত হয়নি। ক্রমশ অবনতি হতে হতে ভিন্নররাই উটিয়া বাঁদরে পরিণত হয়েছে। ভিন্নররা কোথাও যায়নি হিমু, বিশৃঙ্খলার অশুভ শক্তি তাদের সভ্যতার শিখর থেকে নামিয়ে জঙ্গলের পশু করে তুলেছে।’’

অনেকক্ষণ চুপ করে থাকেন কিষেনপ্রতাপ। তাঁর দৃষ্টি যেন হারিয়ে গেছে কোথাও।

তারপর হিমুর চোখে চোখ রাখেন।

"আর আমরাও যদি সময় থাকতে সাবধান না হই, তাহলে আর কয়েকশো বছরের মধ্যে মানুষও এই অম্বালিকার জঙ্গলে উটিয়া বাঁদরের পাশাপাশি হিংস্র জানোয়ারের মতো ঘুরে বেড়াবে।"

দৌলতনগর

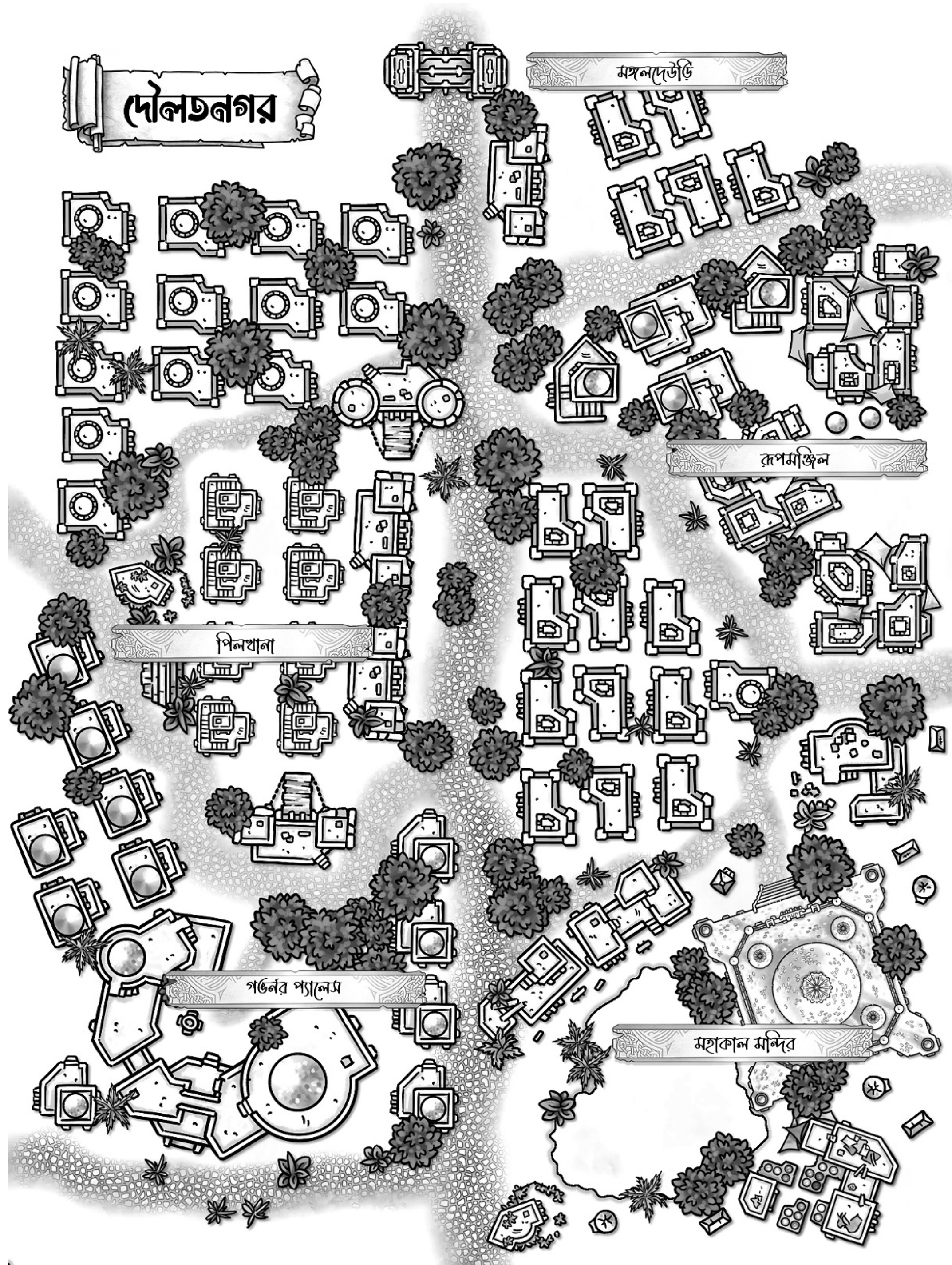


হে জীবন, কীসের সাথে তুলনা করি তোমার?
যেন দিনান্তে বিদ্যুতের ম্লান আলোয় দেখা
হেমন্তের শূন্য খেত



রামধনু ফিঙে,
চলো যাওয়া যাক
দ্যাখো কেমন আলোর ছটা
পুবের আকাশে




দৌলতনগর
মঙ্গলদেউড়ি
রূপমঞ্জিল
পিলখানা
গভর্নর প্যালেস
মহাকাল মন্দির



১

অম্বালিকায় হকিঙ্গাবাদ যদি রাজনীতির কেন্দ্র হয়, তাহলে দৌলতনগর তার প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র। এখানে ক্ষমতার উৎস ভূসম্পত্তি নয়, বাণিজ্যলব্ধ অর্থ।

দৌলতনগরের বর্তমান গভর্নরটি উচ্চতায় কিঞ্চিৎ খাটো হলেও উচ্চাভিলাষটি তাঁর আকাশচুম্বী। পিতামহ-প্রপিতামহের আমলের গৌরব ফিরিয়ে আনতে তিনি বদ্ধপরিকর। তিনি ভেঙে-পড়া মঙ্গলদেউড়ি পুনর্নির্মাণ করিয়েছেন, রাস্তাঘাট মেরামত করিয়েছেন, এবং তার চাইতে বড় কথা, দৌলতনগরের বাইরে নানা কারখানা বসিয়েছেন। নিউটন অ্যাকাডেমির কয়েকজন শিক্ষক পুরোনো ভিন্নর ইঞ্জিনকে যন্ত্র চালানোর কাজে ব্যবহার করার পন্থা আবিষ্কার করার পর এইসব কারখানায় আজকাল অনেক সস্তায় উৎপাদন হয়। যোধবণিকের কাফিলা আবার দৌলতনগর আসতে আরম্ভ করেছে। নীলকান্ত মহিষ জোতা তাদের গাড়িতে তারা কাঁচামাল নিয়ে আসে এবং দৌলতনগরের কারখানায় তৈরি পণ্য নিয়ে ফেরত যায়।

দৌলতনগরের কোষাগারে অর্থের জোগান বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে গভর্নরের দৃষ্টিও বাইরের দিকে প্রসারিত হয়েছে, কেবল দৌলতনগরেই তিনি আর নিজেকে সীমিত রাখতে চান না। সেনেট নির্বীর্য হওয়ার অর্থ সমস্ত ক্ষমতা চ্যান্সেলরের হাতে কেন্দ্রীভূত হওয়া। চ্যান্সেলরের ক্ষমতার উৎস কওমি পলটন। এবং কওমি পলটনের ক্ষমতার উৎস দৌলতনগরের কোশাগার। এইরকম একটা সরল গাণিতিক হিসেব দাঁড় করানো গেলে প্রশাসনিক দায়িত্বের অনর্থক ঝঞ্ঝাট ঘাড়ে না নিয়েই দৌলতনগরের গভর্নর বকলমে অম্বালিকার প্রভু হয়ে ওঠেন।

অতএব গভর্নর কওমি পলটনকে দৌলতনগরে ডেকে এনেছেন, এবং শাঁসে-জলে পুষ্ট করছেন। তাদের থাকার জন্যে পরিত্যক্ত কাইজারি মহামৃগের পিলখানা[৯] ভেঙে একটা নতুন মহল্লা বসানো হয়েছে, এবং কার্যত এটাই আজকাল কওমি পলটনের হেডকোয়ার্টার হয়ে দাঁড়িয়েছে। এখানে তাদের সঙ্গে এসে যোগ দিয়েছে আরও নানান ভাগ্যসন্ধানী। প্লেটোগড়ের বরখাস্ত সিপাহি, ইউলারগঞ্জের গুন্ডা, কাজ-হারানো যোধবণিক, ভাগ্যসন্ধানী পিণ্ডারি, কয়েদ-খাটা আসামি, কাউকেই অতীন ফেরায়নি। গভর্নরের বদান্যতায় এবং অতীনের দিলখোলা নিয়োগপদ্ধতিতে কওমি পলটনের সদস্যসংখ্যা ফুলেফেঁপে উঠেছে, পিলখানা আজকাল দিবারাত্র সরগরম থাকে।

শীতকাল কেটে গিয়ে বসন্ত এসেছে। আবহাওয়া পরিষ্কার, রোদের তেমন তাপ নেই। পিলখানার নতুন বাঁধানো রাস্তার মোড়ে একটা নীল আপেল খেতে খেতে চারপাশের ভিড়ের ওপর নজর রাখে হিমু। আজ দিন সাতেক হল সে দৌলতনগর এসেছে। টানা সাত দিন ধরে সে এই পিলখানার আনাচকানাচে সকাল-সন্ধে নজর রাখছে, কিন্তু আজ পর্যন্ত রজতকে দেখতে পায়নি। সাবধানে পিলখানার আশপাশের দোকানে রজতের খোঁজও করেছিল, কিন্তু সেখানেও কেউ সন্ধান দিতে পারেনি। আজকেও সকাল থেকে সে এই পিলখানায় চক্কর কাটছে, কিন্তু এ পর্যন্ত তার ঘোরাফেরা বৃথাই গেছে, রজত তার নজরে পড়েনি।

হঠাৎ বড়রাস্তার দিক থেকে একটা হইহই ওঠে, বাজনার আওয়াজ আর লোকের উল্লাসধ্বনি শোনা যায়। চারপাশের লোকজন মাথা তুলে আওয়াজটা শোনে, তারপরে দৌড় দেয় বড়রাস্তা লক্ষ্য করে।

একজনকে দাঁড় করিয়ে হিমু জিজ্ঞেস করে, "কী হয়েছে ভাই, এত আওয়াজ কীসের?"

"বসন্তপূজার শোভাযাত্রা বেরিয়েছে!" বলেই সে দৌড় লাগায়।

বসন্তপূজার শোভাযাত্রা বসন্তকালের শুরুতেই বেরোয়। দৌলতনগরের আমোদ-প্রমোদের ব্যাবসার সঙ্গে যারা জড়িত, তারা সব এই দিনে মিছিল করে শহর পরিক্রমা করে, তারপর মহাকাল মন্দিরে পুজো দিয়ে ফেরত যায়।

কয়েক মিনিটের মধ্যে পিলখানার রাস্তা ফাঁকা হয়ে যায়।

প্রথমে হিমু ভাবে, ফেরত চলে যাবে। পিলখানার ফাঁকা রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকাটা বিপজ্জনক। কেউ যদি সন্দেহের বশে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে তাহলে সে ফাঁদে পড়ে যাবে।

তারপরে তার মনে হয়, পিলখানায় কয়েকদিন তল্লাশি করেও সে রজতের খোঁজ পায়নি। বসন্তপূজার শোভাযাত্রা দেখতে সাধারণত ভিড় ভেঙে পড়ে। সেখানে একবার চোখ রাখলে হয়, যদি রজতকে দেখতে পাওয়া যায়।

বড়রাস্তার দু-পাশে মানুষের ভিড়। তারই মধ্যে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে চারদিকে নজর রাখে হিমু। ভিড়ের সামনে দিয়ে একের পর এক চলে যায় শহরের প্রমোদ পসারিরা।

প্রথমে আসে একদল বাজিগর। কেউ ডিগবাজি খেতে খেতে, কেউ হাওয়ায় একসঙ্গে অনেকগুলো বল বা মুগুর ছুড়তে ছুড়তে, কেউ শরীরের চারপাশে একটা বিশাল রিং ঘোরাতে ঘোরাতে রাস্তা দিয়ে হেঁটে যায়। ভিড়ের মধ্যে থেকে হাততালি, টীকাটিপ্পনী ভেসে আসে।

তারপরে রঙিন সাজ-পরানো গ্রিবিনে চড়ে আসে শুঁড়িখানার মালিকরা, তাদের পেছনে তাদের সহকারীরা ফুলেল মদের খুদে খুদে বোতল ছুড়তে থাকে ভিড়ের মধ্যে, সেগুলো নেওয়ার জন্যে হুড়োহুড়ি পড়ে যায়।

শুঁড়িদের পর মুখে রং মেখে, মুখোশ পরে অদ্ভুত সাজপোশাক গায়ে হেলতেদুলতে হেঁটে চলে যায় নটুয়ারা। ভিড়ের মধ্যে থেকে উড়ে আসে হাসির হররা, টীকাটিপ্পনী, হাততালি।

তারপর দু-পায়ে হেঁটে আসে একসার ফুলে সাজানো পালকি। পালকির মধ্যে বসে হাত নাড়ে রূপমঞ্জিলের বাইজি কুঠির মালিক-মালকিনরা। ভিড় থেকে এবার ভেসে আসে শিস, অশালীন উক্তি।

পালকির পর অজস্র ছোট ছোট পায়ে হেঁটে আসে একটা লম্বাটে মাল কন্টেনার। তার দু-দিক নামানো। কন্টেনারের ভেতরে সাজসজ্জা করে দাঁড়িয়ে থাকে রূপমঞ্জিলের সদ্য যোগ-দেওয়া রূপবতীরা।



কন্টেনারের দিকে চোখ পড়তে হঠাৎ চমকে ওঠে হিমু। তার বুকের ভেতর হৃৎপিণ্ডটা হাতুড়ির মতো পড়তে থাকে। তার সামনে আচমকা রজত, পুরো কৌমি পলটন, দুটো উটিয়া বাঁদর, একটা কাইজারি মহামৃগ সব একসঙ্গে এসে পড়লেও তার হয়তো এইরকম অবস্থা হত না।

কন্টেনারের ভেতর দাঁড়িয়ে আছে একটা গালে টোল-পড়া মেয়ে। যাকে সে শেষ দেখেছিল হকিন্সাবাদের এক বৃষ্টি-ভেজা বিকেলে।

হিমুর মাথা থেকে রজত, তলোয়ারবাজি, শস্ত্রবিদ্যার পাঁচ স্তম্ভ, সব বেমালুম উবে যায়। সে কন্টেনারটাকে নজরে রেখে তার পেছনে পেছনে হাঁটতে শুরু করে।

২

রাস্তার ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নিজেকেই গাল দেয় রবি। মিতার খোঁজ পেতে গিয়ে তার অত বাড়াবাড়ি না করলেও চলত। হকিন্সাবাদের বড় মানুষদের নিজেদের মধ্যে যতই ঝগড়া থাকুক, সমাজের নীচের তলার কেউ তাদের কারও গায়ে হাত দিলে তাকে শিক্ষা দেবার জন্যে তারা শ্বাপদের মতো হিংস্র হয়ে ওঠে।

রাস্তার মোড়ে ঠান্ডায় অর্ধমৃত শুভাকে উলঙ্গ অবস্থায় পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাই তার মাথার দাম ঘোষণা হয়ে যায়, তার ছবি পড়তে থাকে হকিন্সাবাদের বড়রাস্তার ছাতার মতো প্রোজেক্টরের তলায়, আর তার নাগাল পেতে শিকারি শিঙেল চিতার মতো হন্যে হয়ে সারা হকিন্সাবাদে চষে ফেলতে থাকে হকিন্সাবাদের পুলিশ আর সেনেটর কৃষ্ণেন্দুর নিজস্ব লশকরের তলোয়ারবাজরা।

প্রাণ বাঁচাতে প্রায় এক মাস গা-ঢাকা দিয়ে থাকতে হয় রবিকে। তারপর এক কাফিলা-সালারকে[১০] ঘুস দিয়ে তার কাফিলায় মালের বস্তার নীচে লুকিয়ে হকিন্সাবাদ ছেড়েছে সে।

রবি অবশ্য জানে যে দৌলতনগরের রূপমঞ্জিলেরও নিজস্ব নিয়ম আছে, বাইজি কুঠিতে মাস ছয়েকের ট্রেনিং-এর আগে কোনও মেয়েকে খদ্দেরের কাছে পাঠানো হয় না। ততদিন তারা প্রতিষ্ঠিত বাইজিদের ফাইফরমাশ খাটে আর মজলিশে পরিচারিকার কাজ করে। সুতরাং ততদিন মিতার তেমন কোনও বিপদ হয়তো হবে না। কিন্তু মেয়েটা হয়তো ভাববে যে রবি তাকে বিপদের মুখে ফেলে পালিয়ে গেছে, এইটা মনে করলেই তার বুকের ভেতরটা কেমন টনটন করে ওঠে।

দৌলতনগরের হালহকিকত সব রবির সব জানা। সুতরাং তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে সে শোভাযাত্রা দেখতে থাকে। মিতাকে খুঁজে বের করার এটাই শ্রেষ্ঠ পন্থা।

শোভাযাত্রায় মাল কন্টেনারটা আসার সঙ্গে সঙ্গেই তার মধ্যে সে মিতাকে দেখতে পায়। মনের আনন্দটা ভেতরেই চেপে রেখে সে ভিড় ঠেলে সামনে এগিয়ে যায়। ভিড়ের সামনের দিকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে কোমরে তলোয়ার বাঁধা কুঠির পাহারাদাররা দাঁড়িয়ে। শোভাযাত্রার দিন এরাই কুঠির মালকিন আর মেয়েদের নিরাপত্তা দেয়। এদের একজনের কাছে এগিয়ে গিয়ে রবি যতটা সম্ভব নিরুত্তাপ কণ্ঠে প্রশ্ন করে, “বাবা! এবারে অনেকগুলো নতুন মেয়ে দেখছি! কোন কুঠির ভাই?”

"মোহিনী, শ্যামলী আর উর্বশী।" রাস্তা থেকে চোখ না সরিয়েই উত্তর দেয় পাহারাদার।

কোনও তাড়াহুড়ো না দেখিয়ে ভিড় ঠেলে আস্তে আস্তে বেরিয়ে আসে রবি। তারপর বড়রাস্তা ছেড়ে একটা গলিতে ঢুকে দৌড় দেয় প্রাণপণে।

৩

অম্বালিকায় পা রাখার পর মানুষ যখন প্রথম দৌলতনগর অঞ্চলে আসে, এখানে সে হকিন্সাবাদের মতো কোনও ভিন্নর সভ্যতার পুরাকীর্তি পায়নি। এই অঞ্চলটা প্রায় পুরোটাই ঝোপঝাড় আর জঙ্গলে ভরতি ছিল।

কেবল একটি ব্যতিক্রম বাদে।

হকিন্সাবাদের একটি অঞ্চলে বুদ্‌বুদের মতো কয়েকটি সৌধ মানুষ আবিষ্কার করে। যেন কতকগুলো গম্বুজ মাটির ওপর গড়ে উঠেছে। এই বাড়িগুলোর ভেতরে দেওয়ালের গায়ে একটা চৌকোনা পাথরে চাপ দিলে গম্বুজের মাথার কাছে অগুনতি কুলুঙ্গিতে নীল আলো জ্বলে ওঠে, মেঝের নীচে কোনও যন্ত্রের মৃদু গুঞ্জন পাওয়া যায়।

প্রথমদিকে এই গম্বুজগুলোর উদ্দেশ্য না বুঝতে পারা গেলেও, কিছুদিনের মধ্যেই এদের রহস্য মানুষের কাছে পরিষ্কার হয়ে যায়। এদের ভেতরের যন্ত্রটা চালু হলে মানুষের অনুভূতিগুলো বহুগুণ বৃদ্ধি পায়।

গম্বুজের এই শক্তি হয়তো অনেক বৈজ্ঞানিক পরীক্ষানিরীক্ষার কাজে লাগানো যেত, কিন্তু তার বদলে মানুষ এই গম্বুজগুলোকে ঘিরে বানিয়ে ফেলল বাগান, হলঘর, বারান্দা, বড় বড় জানলা-বসানো এক খোলামেলা কাঠের বাড়ি, এবং তার সরল নির্দোষ নাম রাখল পার্টি হাউস।

পার্টি হাউস হয়ে উঠল বড় মানুষদের আমোদ-প্রমোদের আর হুল্লোড়ের ঠিকানা। আর সেই সমস্ত প্রমোদের অন্তিম অধ্যায়ের যৌনক্রীড়া অনুষ্ঠিত হতে থাকল ওই গম্বুজের নীচে, বহুগুণে বর্ধিত রতিসুখ উপভোগ করার জন্যে।

আর পার্টি হাউসে রূপের জোগান দিতে তার চারপাশে ধীরে ধীরে গড়ে উঠল রূপমঞ্জিল। একের পর এক বাইজি কোঠা, শুঁড়িখানা, বড় মানুষদের প্রমোদ ভবন, এবং দোকানপাটে সাজানো এক বৃহৎ মহল্লা।

তিনটে কোঠার মধ্যে কোনটা মিতার, সেটা খুঁজে পেতে বেশি বেগ পেতে হয়নি রবিকে। এখন সে এই রূপমঞ্জিলের একটা পানশালার বারান্দায় ঠররার গ্লাস হাতে রাস্তার উলটোদিকে মোহিনী কোঠার ওপর নজর রাখে।

ধীরে ধীরে বেলা বাড়ে, মহাকাল মন্দিরের পুজো সাঙ্গ করে কোঠায় এক-এক করে ফিরে আসে বাইজির দল।

ঠররার দাম চুকিয়ে বারান্দা থেকে নেমে আসে রবি, ধীরেসুস্থে মোহিনী কোঠার সামনে এসে দরোয়ানকে বলে, "মিতার সঙ্গে দেখা করব।"

চোখ তুলে আকাশের দিকে ইঙ্গিত করে লোকটা, "এখনও সময় হয়নি। সন্ধেবেলা ঘুরে এসো।"

মৃদু হাসে রবি, "আরে না না। আমি এমনি দেখা করতে এসেছি। আমি ওর কাকা, অনেক দূরে থাকি।"

ব্যঙ্গে বেঁকে যায় দরোয়ানের ঠোঁট, "ওইসব বাবা-কাকা এখানে অনেকে খেলতে আসে। যাও, ফোটো তো, বললাম না, এখনও সময় হয়নি।"

পকেট থেকে কতকগুলো নোট বের করে লোকটার হাতে গুঁজে দেয় রবি, "মাইরি বলছি। আমি ওর কাকা। তুমি একবার খবর দিয়ে দ্যাখো-না। বলো, রুসোগঞ্জের কাকা এসেছে। যদি দেখা করতে না চায়, চলে যাব।"

ভেতরে ঢুকে গিয়ে ব্যাজার মুখে ফেরত আসে দরোয়ান, "যাও, ডাকছে।"

কুঠির ভেতরে একটা ছোট ঘরে বসে মিতা। বেশভূষা বাইজিদের মতো। রবিকে দেখে তার মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, "ওঃ কাকা। আমি ভেবেছিলাম, আর তোমার সঙ্গে কোনওদিন দেখাই হবে না।"

"কেন হবে না! আমি একটা কাজে আটকে পড়েছিলাম। কিন্তু তুমি দৌলতনগরে এসেছ শুনেই আমি ছুটতে ছুটতে চলে এসেছি। কেমন আছ তুমি?"

রবি ভেবেছিল, মিতা হয়তো কাঁদবে, অনুযোগ করবে, তাকে ছাড়িয়ে নিয়ে যেতে বলবে। কিন্তু মিতা সেসব কিছুই করে না। শুধু ম্লান হেসে বলে, "ভালোই আছি, কাকা। এখানেই তো আমাকে থাকতে হবে, তাই মানিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছি। রুমাদির টুকটাক কাজ করছি, আদবকায়দা শিখছি।"

কেমন একটা যন্ত্রণার ছাপ লাগে রবির মুখে, "তুমি থাকতে না চাইলে—"

আবার সেই ম্লান হাসি হাসে মিতা, "কোথায় আর যাব, কাকা? সংসারে আপন বলতে কেউ নেই। কার কাছে যাব? এই হয়তো আমার ভবিতব্য! আর তা ছাড়া এরাই বা আমায় ছেড়ে দেবে কেন? শুনেছি, হুজরাইনের থেকে এরা আমাকে অনেক টাকায় কিনেছে।"

বুকের ভেতরটা মুচড়ে ওঠে রবির। মিতাকে আশ্বস্ত করার জন্যে সে কিছু বলতে যাচ্ছে, কুঠির দরোয়ান আবার ব্যাজার মুখে এসে হাজির হয়, "একজন তলোয়ারবাজ তোমার সঙ্গে দেখা করতে চাইছে। বলছে, তুমি চেনো। হকিন্সাবাদে বৃষ্টির দিন দেখা হয়েছিল।"

ফের মুখটা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে মিতার, "হকিন্সাবাদ? বৃষ্টি? ও হ্যাঁ হ্যাঁ, চিনি। নিয়ে এসো।"

"কে মিতা?" প্রশ্ন করে রবি।

"নাম জানি না, কাকা, হকিন্সাবাদে দেখা হয়েছিল।" একটু ইতস্তত করে বলে মিতা।

"চেনো, অথচ নাম জানো না?" বিস্ময়ের ছোঁয়া লাগে রবির কণ্ঠস্বরে।

চুপ করে থাকে মিতা।

একটু বাদেই ঘরে ঢোকে হিমু। রবি অবাক হয়ে দ্যাখে, তাকে দেখামাত্র মিতার মুখে একটা অদ্ভুত খুশির হাসি খেলে যায়।

মাথা ঝোঁকায় হিমু, "কিছু মনে করবেন না, আমার নাম হিমু। অনির্বাণ আখড়ার তলোয়ারবাজ। আপনার মনে আছে কি না জানি না, তবে হকিন্সাবাদে একদিন বৃষ্টির দিন আপনি আমাকে আশ্রয় দিয়েছিলেন।"

"খুব মনে আছে।" হেসে বলে মিতা, "বসুন-না! বসুন।"

রবির দিকে চোখ যায় হিমুর, সে কিছুটা ইতস্তত করে।

"বসুন-না।" আবার বলে মিতা, "ইনি আমার কাকা। আমার বাবার মতো।"

রবিও যোগ দেয়, "হ্যাঁ সাহেব, বসুন-না।"

আড়ষ্টতা কাটিয়ে একটা টুল টেনে নিয়ে বসে হিমু।

"মিতা, এঁর সঙ্গে তোমার হকিন্সাবাদে আলাপ হয়েছিল?" কে জানে কেন, রবির মুখে একটা চওড়া হাসি লটকানো।

"হ্যাঁ। একবারই দেখা হয়েছিল।" চোখ নামিয়ে বলে মিতা।

"ওঃ! খালি একবার!" রবির হাসিটা প্রায় তার কান ছোঁয়।

“আমি দৌলতনগর একটা কাজে এসেছিলাম। আপনাকে শোভাযাত্রায় দেখলাম, তাই ভাবলাম, একবার দেখা করি।” প্রসঙ্গ পালটানোর চেষ্টা করে হিমু, রবির চওড়া হাসিটা তার নজর এড়ায়নি।

“দৌলতনগর কাজে এসেছিলেন?” মিতার মুখ দেখে মনে হয়, সে-ও প্রসঙ্গ পালটাতে পেরে হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছে।

“হ্যাঁ। একজনের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলাম।”

চেয়ার ছেড়ে ওঠার উপক্রম করে রবি, “আচ্ছা মিতা, তোমরা কথা বলো, আমি এবার উঠি।” তার মুখের হাসিটা ছোট হওয়ার কোনও লক্ষণ দেখা যায় না।

“না, না, কাকা, তুমি বসো।” কেমন যেন তাড়াহুড়ো করে বলে মিতা।

“হ্যাঁ, হ্যাঁ, আপনি বসুন।” হিমুও যেন কেমন তাড়াহুড়ো করে মিতার কথার পুনরাবৃত্তি করে, “আমি বেশিক্ষণ থাকতে পারব না।”

উঠতে গিয়েও বসে পড়ে রবি। তবে তার কান-এঁটো-করা হাসিটা যথাস্থানেই লটকানো থাকে।

“আপনি কারও সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন, বলছিলেন। আপনি কি কয়েকদিন থাকবেন দৌলতনগরে?'' আবার প্রশ্ন করে মিতা।

“ঠিক বলতে পারছি না।” একটু ইতস্তত করে উত্তর দেয় হিমু।

তার ঈষৎ দ্বিধা রবির চোখ এড়ায় না, “কিছু মনে করবেন না সাহেব, আপনি কি কারও সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন? না কাউকে খুঁজতে এসেছেন?”

“হ্যাঁ, ওই আর কী। খুঁজতে।” আবার ইতস্তত করে উত্তর দেয় হিমু।

কপাল কোঁচকায় রবি, “এত বড় শহরে কাউকে খুঁজে পাওয়া তো খুব মুশকিল। কোথায় থাকে, সে ব্যাপারে কিছু জানেন?”

ঘাড় নাড়ে হিমু, “না। সে কোথায় থাকে, জানাটা সহজ নয়।''

“মাপ করবেন সাহেব, তবে যাকে খুঁজছেন, সে কি তলোয়ারবাজ? নাকি অন্য কেউ?” আবার প্রশ্ন করে রবি।

আবার ঘাড় নাড়ে হিমু, “সেটা এই মুহূর্তে আপনাদের ঠিক বুঝিয়ে বলা মুশকিল।”

কুঠির একজন কর্মচারী ঘরে এসে ঢোকে। মিতাকে উদ্দেশ করে বলে, “রুমাদি বলে পাঠাল, সন্ধেবেলা পার্টি হাউসে পার্টি আছে, তৈরি থাকতে।”

“কওমি পলটনের পার্টি তো?” উত্তর দেয় মিতা।

“হ্যাঁ, হ্যাঁ। ওই পিলখানার বজ্জাতগুলো।” মুখ বেঁকিয়ে উত্তর দিয়ে বিদায় নেয় লোকটা।

চমকে ওঠে হিমু, ‘‘আপনি এই কওমি পলটনের লোকেদের চেনেন?’’ মিতার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করে সে।

“হ্যাঁ, চিনি। ওদের একজন বড় মাপের নেতা আছে, অতীন, সে নীরাদির কাছে আসে।”

কপাল কুঁচকোয় রবি, “আপনি যাকে খুঁজছেন, সে কি এই কওমি পলটনের কেউ? বা কওমি পলটনের সঙ্গে কোনওভাবে জড়িত?’’

উত্তর দেয় না হিমু। কপাল কুঁচকে কী যেন চিন্তা করে।

“আমাকে বিশ্বাস করে খুলে বলতে পারেন।’’ অনুরোধের স্বরে বলে মিতা, “যদি কোনওভাবে আপনাকে সাহায্য করতে পারি।”

মিতার অনুরোধে যোগ দেয় রবিও, “হ্যাঁ, মিতা আর আমি যতটা পারি আপনাকে সাহায্য করার চেষ্টা করব। আমাদের আপনার বন্ধু বলেই জানবেন। আপনি নিঃসংকোচে আমাদের সব বলতে পারেন।”

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে একটা লম্বা নিশ্বাস নেয় হিমু। ‘‘আমি যাকে খুঁজছি, তার নাম রাজেন। কওমি পলটনের হয়ে খুনখারাপি করে। কিন্তু কয়েকদিন ধরে পিলখানা চষে বেড়িয়েও আমি তার খোঁজ পাইনি।”

“আচ্ছা! রাজেন!” কী চিন্তা করে মিতা।

“হ্যাঁ। ওর আসল নাম রজত। বাড়ি হোমিগঞ্জে।”

“রজত! হোমিগঞ্জ!” কেমন চিন্তিত লাগে রবিকেও।

মাথা ঝাঁকায় মিতা, “না, মনে পড়ছে না। কিন্তু কওমি পলটনের কেউ হলে সন্ধেবেলা পার্টি হাউসে হয়তো আসবে। আপনি এই কুঠির কাছাকাছি কোথাও থাকবেন, আমি পার্টি হাউসে খোঁজ নিয়ে জানাব, এসেছে কি না।”

কুঠির কর্মচারী এসে আবার মিতাকে তাড়া দেয়, “রুমাদি তৈরি হতে বলল।”

উঠে পড়ে রবি, “চলুন সাহেব, আমরা বাইরে যাই।”

রাস্তায় বেরিয়েই আবার দাঁড়িয়ে পড়ে রবি, “ওঃ! দেখেছেন, মিতাকে একটা দরকারি কথা বলতে ভুলে গেলাম।”

রাস্তার ওপারে পানশালাটা হিমুকে দেখায় রবি, “সাহেব, আপনি ওখানে অপেক্ষা করুন, আমি মিতাকে একটা কথা বলেই চট করে চলে আসছি।”

কুঠির দরোয়ান রবিকে দেখে বিরক্ত হয়, “এই তো একটু আগেই গেলে। আবার কী চাই?”

মুচকি হাসে রবি, “কুঠির মালকিনের সঙ্গে দেখা করতে চাই।”

নাক দিয়ে একটা ব্যঙ্গের শব্দ করে দরোয়ান, “নতুন লোক নাকি তুমি? আকাশ থেকে পড়েছ? জানো না, কুঠির মালকিন কারও সঙ্গে দেখা করে না।”

আবার মুচকি হেসে বাঁ হাতের তর্জনী আর মধ্যমা ফাঁক করে দরোয়ানের দিকে বাড়িয়ে ধরে রবি, “আমার সঙ্গে দেখা করবে।”

ঝুঁকে দুটো আঙুলের মাঝের চামড়াটা দ্যাখে দরোয়ান। ঝাপসা নীল কালিতে একটা দু-টুকরো হয়ে-যাওয়া তালার ছবি উলকি করা।

মাথা দোলায় রবি, ‘সিন্ডিকেট। যাও, খবর দাও।”

হতভম্বের মতো রবির মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে ভেতরে দৌড়োয় দরোয়ান।

একটু পরে লাক্ষার নকশা-করা আসবাব আর ফুলের তোড়ায় সাজানো কুঠির মালকিনের ঘরে পা রাখে রবি।

মালকিনের নাম মোহিনী। রূপমঞ্জিলে মালকিনের নাম থেকেই কুঠির নাম হয়। তবে মোহিনীর নাম হয়তো এককালে মোহন ছিল, চড়া প্রসাধনের নীচ থেকে উঁকি-মারা গালের সবুজাভ আভায়, মুগুরের মতো লোমশ দুই হাতে আর কর্কশ গলার স্বরে তার কিছুটা আভাস রয়ে গেছে।

মোহিনীর জানলাহীন ঘরে বাসি খাবারের গন্ধ, টেবিলে একটা প্লেটে জড়ো করে রাখা একগাদা হাড়গোড়। খড়কে দিয়ে দাঁত খুঁটতে খুঁটতে মোহিনী বলে, “যা বলার, পাঁচ মিনিটে বলে ফুটে যাও। ব্যাবসার সময়, বেশি হেজিয়ো না।”

“তোমার যে নতুন মেয়েটা, মিতা, তাকে ছাড়াতে চাই।”

চুপ করে কিছুক্ষণ রবির দিকে তাকিয়ে থাকে মোহিনী, তারপর অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে, “খোয়াব দেখছ নাকি বুড়ো? সিন্ডিকেট বলে ঘরে ঢুকতে দিয়েছি, নইলে লাথ মেরে

তাড়িয়ে দিতাম। তা-ই বলে একেবারে মেয়েছেলে কেনার আবদার? বুড়ো বয়সে খুব রস দেখছি যে! ফোটো এখান থেকে।”

মোহিনীর চোখে চোখ রেখে রবি বলে, “তুমি সিন্ডিকেটের নিয়ম জানো। জলশকুন জলশকুনের মাংস খায় না। আমি মেয়েটার কাকা। যার জিম্মায় রেখেছিলাম, সে তোমাকে বেচে দিয়েছে।”

আবার অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে মোহিনী, “এ লাইনে বাবা-কাকা অনেক দেখা হয়ে গেছে, বুড়ো। সত্যি কাকা, না মেয়েছেলে কিনে কাকা-কাকা খেলতে চাও? ওঃ! শালা রস একেবারে গড়িয়ে পড়ছে যে! যাবে, না পেছনে ক্যাঁত করে একটা লাথি মারব?’’

পকেট থেকে একটা ফোটোক্রিস্টাল বের করে টেবিলের ওপর ছুড়ে দেয় রবি, “দেখে নাও।’’

কপাল কুঁচকে কয়েক সেকেন্ড রবির দিকে তাকিয়ে থাকে মোহিনী, তারপর ক্রিস্টালটা একটা লণ্ঠনে পুরে দেয়।

ঘরের দেওয়ালে আলোর ছবি পড়ে। হকিন্সাবাদে শুভাকে নগ্ন অবস্থায় রাস্তায় পাওয়ার খবর, পুলিশ কমিশনারের বক্তব্য, রবির একটা আন্দাজি ছবি-আঁকা ইনামের পোস্টার।

পোস্টারের ছবিটার দিকে তাকিয়ে রবির মুখের দিকে তাকায় মোহিনী, তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে একটা শিসের শব্দ, “উরি শ্লা! তুমি বুড়ো তো দেখছি একেবারে রসের কলশি।” আওয়াজ করে হাওয়ায় একটা চুমু খায় মোহিনী, “আজ রাতে থাকো-না বুড়ো আমার কাছে! হাওয়ায় আগুন লাগিয়ে দেব।”

একটা চওড়া হাসি হাসে রবি, “দুর হারামি! কাজের কথা বল!”

বুকে হাত রেখে ঠোঁট ফোলায় মোহিনী, “বুক ভেঙে দিলে গো বুড়ো তুমি আমার।’’

ভুরু কপালে তুলে রবি প্রশ্ন করে, “কত দিয়ে কিনেছিলে?”

ড্রয়ার থেকে একটা খাতা বের করে রবির সামনে একটা পাতা মেলে ধরে মোহিনী, “কেনা দাম। তবে আরও খরচা হয়ে গেছে। দুনো লাগবে।”

মাথা নাড়ায় রবি, “না, দেড়া। অত খরচা তোমার হয়নি। জলশকুন হয়ে জলশকুনের মাংস খেতে চেয়ো না।”

জামার ভেতর থেকে একটা বটুয়া বের করে রবি। বটুয়া থেকে আঙুলের আকারের কয়েকটা সোনার কাঠি বের করে গুনে গুনে নামিয়ে রাখে টেবিলের ওপর।

"দেড়ার একটু বেশি আছে। আজকের রেট।"

সোনার টুকরোগুলো টেবিল থেকে কুড়িয়ে নিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফ্যালে মোহিনী, "লোকসান হয়ে গেল গো বুড়ো।"

"সে তোমার ব্যাপার। ব্যাবসা করার আগে তোমার যাচাই করা উচিত ছিল।"

ধূর্ত চোখে বটুয়াটার দিকে তাকায় মোহিনী, "অবশ্য তোমার বটুয়াটা কেড়ে নিয়ে মেয়েটাকে রেখে দিলে আমার লাভ ভালোই থাকে।"

"তা থাকে," নিরুত্তাপ কণ্ঠে বলে রবি, "কিন্তু তারপর থেকে যদি রোজ তোমার মক্কেলেদের বাড়িতে চুরি হয় তাহলে তোমার ব্যাবসা থাকে না।"

আবার ঠোঁট ফোলায় মোহিনী, "তুমি বারবার কেন এমন করে আমার বুক ভেঙে দাও গো বুড়ো।"

"তাহলে পাক্কা?" প্রশ্ন করে রবি।

ড্রয়ার থেকে একটা নম্বর-লেখা কাঠের চাকতি বের করে রবির দিকে ছুড়ে দেয়, "এই নাও। তবে এখন না। পার্টি হাউসে মেহফিল আছে। তার পর নিয়ে যেয়ো।"

৫

সন্ধে নেমেছে। অন্ধকারে সেজে উঠছে রূপমঞ্জিল। রাস্তায়, বারান্দায়, বাড়ির ছাদে জলে নানা রঙের কাগজের লণ্ঠন। রাস্তায় সুসজ্জিত নারী-পুরুষের ভিড়, হাওয়ায় ভাসে হাসির আওয়াজ আর আতরের সুগন্ধ, পানশালায় উপচে পড়ে লোক।

একটা পানশালা থেকে একটু দূরে একটা গাছের নীচে অন্ধকারে বসে অপেক্ষা করে রবি আর হিমু। রবির পায়ের কাছে দুটো গ্লাস আর একটা মদের বোতল রাখা, যেন দুজনে মিলে নেশা করতে বসেছে।

রাস্তার ভিড়ের দিকে তাকিয়ে ধীরে ধীরে মাথা নাড়ে রবি, "যত শুনছি, সাহেব, তত আশ্চর্য হচ্ছি। ওফ, এ তো ভয়ানক মানুষ! একেবারে যেন সাক্ষাৎ নরকের দানব!"

"তা একরকম বলতে পারেন। এ যেখানে যায়, সেখানটাই নরক হয়ে ওঠে।" উত্তর দেয় হিমু।

“আমি জীবনে খুনে, বদমাইশ কম দেখিনি, সাহেব। কিন্তু এ তাদের সবাইকে ছাপিয়ে যায়।”

উত্তর না দিয়ে হিমু উদ্‌বিগ্ন দৃষ্টিতে রাস্তার শেষ প্রান্তের দিকে তাকায়। যেখানে পার্টি হাউসের রোশনাই ঝলমল করছে। এক ঘণ্টা ধরে এই করে আসছে হিমু— ঘনঘন পার্টি হাউসের দিকে তাকানো।

সহানুভূতির স্বরে তাকে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করে রবি, “চিন্তা করবেন না সাহেব। মিতার স্বভাবটা নরম হলে কী হবে, মাথায় খুব বুদ্ধি। দেখবেন না, ও এমন করে খবর বের করে নেবে, যে কেউ টেরই পাবে না।”

হিমুর মুখ দেখে মনে হল না, সে রবির কথায় খুব একটা স্বস্তি পেয়েছে। চুপ করে আবার পার্টি হাউসের দিকে তাকায় সে।

সেই মুহূর্তে পার্টি হাউসের দিক থেকে ছুটতে ছুটতে আসে বিকেলে দেখা মোহিনী কুঠির সেই কর্মচারী, “আরে এসো, এসো,” একগাল হেসে বলে রবি, “মিতা কিছু খবর পাঠিয়েছে বুঝি?”

“হ্যাঁ।” হাঁপাতে হাঁপাতে বলে লোকটা।

“বেশ, বেশ। বোসো। এক গ্লাস খাবে নাকি আমদের সঙ্গে?” গ্লাসে মদ ঢালে রবি।

“না, না,” ব্যস্ত হয় লোকটা— “আমার তাড়া আছে। পান থেকে চুন খসলেই পিলখানার বদমাশগুলো হুজ্জত করবে।”

“কী বলল মিতা?” উদ্‌গ্রীব কণ্ঠে প্রশ্ন করে হিমু।

“মিতাদি বলে পাঠাল যে পার্টিতে রাজেন বলে কেউ একজন এসেছে।”

“আচ্ছা, আচ্ছা!” একগাল হেসে উঠে দাঁড়ায় রবি, “অনেক ধন্যবাদ ভাই তোমাকে এই খবরটা দেওয়ার জন্যে। এটা রাখো।”

লোকটার হাতে কয়েকটা টাকার নোট গুঁজে দেয় রবি, “পার্টি কখন শেষ হবে, বলতে পারো?”

“এই তো সবে শুরু হল। শেষ হতে হতে রাত দশটা তো হবেই।”

“দশটা?”

“হ্যাঁ। তার পরে তো আগে নয়।” রবির দেওয়া টাকাগুলো পকেটে ঢুকিয়ে বিদায় নেয় লোকটা।

"কী করবেন এখন সাহেব?'' হিমুকে প্রশ্ন করে রবি, "আপনি যাকে খুঁজছিলেন, সে তো আছে ওখানে।"

চোয়াল শক্ত হয়ে আসে হিমুর, "আজ রাতের মধ্যেই মারব ওকে।"

"আজ রাতের মধ্যেই?" বিস্ময়ের ছোঁয়া রবির কণ্ঠে।

"হ্যাঁ। এই সুযোগ হাতছাড়া হতে দেওয়া উচিত হবে না। পার্টি হাউসের সামনে অপেক্ষা করব। পার্টি থেকে বেরোলে ওর পিছু নেব, তারপর একটা নির্জন জায়গা দেখে হামলা করব।"

৬

পার্টি হাউসে হুল্লোড় চলে। ঘরে আলো, ছাদে টাঙানো মহার্ঘ রঙিন ক্রিস্টালের ঝাড়বাতি আর ঘরের আনাচকানাচে বসানো সুগন্ধি মোমবাতি।

লম্বা হলঘরের একদিকে একটা উঁচু প্ল্যাটফর্মে বসে থাকে অতীন, তার দু-পাশে বিপুল আর সোমনাথ। কওমি পলটনের তিন নেতা। তাদের পরনে দামি পরিচ্ছদ, চুল পরিপাটি করে আঁচড়ানো, মুখে পরিতৃপ্তির ছাপ। বুঝতে অসুবিধে হয় না যে তারা হকিন্সাবাদের প্রতিকূলতার দিনগুলো পেছনে ফেলে এসেছে।

ঘরের উলটোদিকে আর-একটা উঁচু প্ল্যাটফর্মে বসে সংগীত পরিবেশন করে কুঠির বাইজিরা, তাদের রূপের সঙ্গে পাল্লা দেয় তাদের সুরেলা কণ্ঠ আর বাদ্যযন্ত্রের জাদু।

ঘরের মাঝখানে পাতা ফরাশের ওপর ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বসে থাকে কওমি পলটনের সদস্যরা, তাদের মাঝে ঘুরে ঘুরে খাদ্য-পানীয় পরিবেশন করে সদ্য কুঠিতে যোগ-দেওয়া অল্পবয়সি মেয়েরা। তাদের সঙ্গে সঙ্গে মিতাও অতিথিদের গ্লাসে মদ ঢালে।

মূল দলটা থেকে একটু দূরে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে বসে থাকে রজত। তার সামনে দামি মদ নয়, একটা ঠররার বোতল। এই কয়েক মাসে তার স্বাস্থ্য ভেঙে গেছে। চোখ দুটো কোটরাগত, চোয়ালের হাড় ঠেলে বেরিয়ে এসেছে। কারও সঙ্গে কথা না বলে সে আপন মনে ঠররার গ্লাসে চুমুক দেয়।

অতীনের হঠাৎ চোখ যায় মিতার দিকে, "এই মেয়েটা! এদিকে এসো।''

ফুলেল মদের বোতল হাতে এগিয়ে আসে মিতা।

তাকে দু-চোখ দিয়ে মাপে অতীন, “মাঝেমধ্যে দেখি তোমাকে এখানে। কী নাম তোমার?’’

“মিতা, হুজুর।’’ মদ ঢালে মিতা অতীনের গ্লাসে।

“কত বয়স তোমার?’’

“আপনিই বলুন হুজুর।” মাথা নামিয়ে উত্তর দেয় মিতা।

“আঠেরো-উনিশ হবে, না?” গ্লাসে চুমুক দেয় অতীন।

“প্রায়, ওইরকম হবে হুজুর।” অল্প হেসে আবার অতীনের গ্লাসে মদ ঢালে মিতা।

“বাড়ি কোথায়?’’

“পশ্চিমে হুজুর, গোড়েলগাঁওয়ে।”

“গোড়েলগাঁও! ওঃ, অত দূর থেকে এখানে চলে এসেছ?’’ গ্লাসে চুমুক দেয় অতীন, “তুমি মোহিনী কুঠিতে কাজ করো?’’

“হ্যাঁ হুজুর, রুমাদির কাছে কাজ শিখছি।’’

“বাইজি হওয়ার জন্যে?” কেমন একটা অদ্ভুত হাসি খেলা করে অতীনের মুখে, “তাহলে তো তোমাকে সাহায্য করতেই হয়।”

চুপ করে থাকে মিতা।

“তুমি হয়তো আমাকে চেনো না। কিন্তু আমি কওমি পলটনের নেতা।” অহংকারে ঘাড় পেছনে হেলে যায় অতীনের, “রুমাকে বলবে, আমি তোমাকে নারী হয়ে উঠতে সাহায্য করব।” মুখের হাসিটা কেমন কদর্য হয়ে ওঠে অতীনের, “বুঝতে পারলে, না কী?’’

মুখ শুকিয়ে যায় মিতার, ঢোঁক গিলে মাথা নিচু করে নেয় সে।

“যাও।’’ হাত নেড়ে মিতাকে বিদায় দেয় অতীন। মদের বোতল তুলে নিয়ে অন্যদিকে সরে যায় মিতা।

পাশে বসা বিপুলের দিকে ফেরে অতীন, “আমি একটু আসছি। রাজেনের সঙ্গে কথা বলার আছে।”

বিপুলের চোয়াল কেমন শক্ত হয়ে আসে, “অতীন, তোমায় একটা কথা বলার ছিল। এই রাজেন আমাদের সঙ্গে পিলখানায় থাকে না। বাইরে অন্য কোথাও থাকে। দলের ছেলেদের মধ্যে এই নিয়ে কিছুটা অসন্তোষ রয়েছে।”

বিপুলের কথাকে পাত্তা দেয় না অতীন, “রাজেনের ব্যাপার একটু আলাদা। ও আমাদের দলের হলেও, কিছুটা স্বতন্ত্র। ও অন্যদের সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারে না। ওকে আমার ওপরেই ছেড়ে দাও।”

উঠে চলে যায় অতীন, নিজেদের মধ্যে মুখ চাওয়াচাওয়ি করে বিপুল আর সোমনাথ।

৭

সুবেশা নর-নারীর ভিড়ের মধ্যে দিয়ে রূপমঞ্জিলের আলোয় সাজানো পথ দিয়ে হাঁটে রবি আর হিমু। তাদের হাতে এখনও অনেক সময় আছে, রাত দশটার আগে পার্টি শেষ হবে না।

“দেখুন, একটু বাদেই আপনি লড়াইতে আটকে পড়বেন, আমি হয়তো আর বলার সুযোগ পাব না,” কিছুটা ইতস্তত করে বলে রবি, “মিতার ব্যাপারে আপনাকে কয়েকটা কথা বলার ছিল।”

“হ্যাঁ, বলুন।”

“মিতার মা-বাপ কেউ নেই। ছিল এক বুড়ো দাদু, সে-ও খুন হয়ে যায়।”

“সে কী!”

“হ্যাঁ। কালভৈরব পাসে।”

“কালভৈরব পাসে!” বিস্মিত কণ্ঠে বলে হিমু।

“হ্যাঁ। সেসব কথা পরে আপনাকে একদিন বিশদে বলব। তবে আপনাকে একটা অন্য কথা বলার ছিল।”

“হ্যাঁ, বলুন।” দাঁড়িয়ে পড়ে হিমু।

আবার ইতস্তত করে রবি, “কীভাবে আপনাকে কথাটা বলি, ঠিক বুঝতে পারছি না। মিতা মেয়েটা খুব ভালো। কিন্তু ওর তিন কুলে কেউ নেই, পুরো একা। কোথায় কখন আবার কী বিপদে পড়ে, আপনার কাজ মিটে গেলে ওকে একটু দেখবেন।”

একটা ম্লান হাসি হাসে হিমু, “আজ রাতের পর যদি বেঁচে থাকি, তাহলে নিশ্চয়ই দেখব।”

“ও কথা বলবেন না, ও কথা বলবেন না,” ব্যস্ত হয়ে বলে ওঠে রবি, “আপনি অবশ্যই জিতবেন।”

মাথা নাড়ে হিমু, “এই কওমি পলটনের লোকজন তলোয়ারবাজির নিয়ম কত মানবে, আমার সন্দেহ আছে। রজতকে চ্যালেঞ্জ করলে এরা যে সবাই মিলে আমাকে আক্রমণ করবে না, সে কথা কেউ বলতে পারে না। সবার সঙ্গে একা আমি হয়তো পেরে উঠব না।”

“আরে, চিন্তা করছেন কেন, রবি আপনার সঙ্গে আছে। এই দেখুন।'' কাঁধে ঝোলানো একটা ব্যাগের মুখ খুলে ধরে রবি।

ঝুঁকে দ্যাখে হিমু। ব্যাগের ভেতর শোয়ানো সারি সারি সলতে-পরানো মাটির বোতল।

“রাস্তায়-ঘাটে মাল ফিরি করতে ঘুরে বেড়াতে হয় কি না, তাই কাছে রাখি। কোথায় কখন চোর-ডাকাতের খপ্পরে পড়ি,'' লাজুক হাসি হাসে রবি, “আমি তো আর আপনার মতো তলোয়ার চালাতে জানি না।”

৮

পার্টি হাউসের গম্বুজের ঘরে ওপরদিকে নানা গোপন খাঁজে নীল আলো জ্বলে, পায়ের নীচে টের পাওয়া যায় যান্ত্রিক গুঞ্জন। পার্টির শেষ অঙ্কে এখানে যেসব অভ্যাগত তাদের সঙ্গিনীদের নিয়ে আসবে, তাদের জন্যে বিশাল ঘরটার ভেতর চিক দিয়ে ঘেরা এক সারি ছোট ছোট কামরা তৈরি করে দেওয়া হয়েছে। ভেতরে মেঝেতে পেতে দেওয়া হয়েছে বিছানা।

এখানে লোক আসতে অবশ্য এখনও অনেক দেরি আছে। গম্বুজের ঘর আপাতত ফাঁকা। কেবল একটা ছাউনির ভেতরে বসে রজত আর অতীন, তাদের সামনে ঠররার বোতল।

হাতে ধরা ঠররার গ্লাসের দিকে তাকিয়ে থাকে রজত, “সোমনাথকে মারতে হবে?”

“হ্যাঁ!” উত্তর দেয় অতীন, “ওই চাষার বাচ্চা আমার সব কাজে আজকাল বাগড়া দেয়। মুখে মুখে তর্ক করে। ওকে নিয়ে দল চালানো মুশকিল হয়ে পড়ছে। সোমনাথ না থাকলে বিপুল চুপচাপ আমার কথা মেনে নেবে।”

রজতের দিকে ঝুঁকে পড়ে অতীন, “যত তাড়াতাড়ি পারো। পারলে আজকালের মধ্যেই।”

নীরবে ঠররার গ্লাসে চুমুক দেয় রজত।

একটা হাসি খ্যালে অতীনের মুখে, “তুমি আমার জন্যে আজ পর্যন্ত যা করেছ, তার ঋণ শোধ করা সম্ভব নয়। কিন্তু তা-ও, তুমি আমার এই কাজটা করে দিলে আমি নিজের হাতে তোমাকে একটা উপহার দেব।”

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকায় রজত, কিন্তু কোনও প্রশ্ন করে না।

হাসিটা চওড়া হয় অতীনের, “তোমাকে আমি নিজের হাতে হিমুর মাথাটা উপহার দেব।”

“হিমু?'' চমকে ওঠে রজত।

“হ্যাঁ। বিজনের ভাই। যাকে তুমি মেরেছিলে। হারামির বাচ্চাটা কয়েকদিন হল পিলখানায় তোমার খোঁজে চক্কর লাগাচ্ছে। কাজটা হয়ে গেলেই দলের ছেলেদের বলব ওর মাথাটা নামিয়ে দিতে।''

উঠে পড়ে অতীন, “আমি বেরিয়ে যাচ্ছি। তুমি সোমনাথের ওপর নজর রেখো। সুযোগ পেলে হাতছাড়া কোরো না।”

চিক ঠেলে বেরিয়ে আসে অতীন, এগিয়ে যায় গম্বুজের দরজার দিকে।

কয়েক পা গিয়ে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে অতীন। অন্য আর-একটা চিকের কামরার ভেতর থেকে তার কানে একটা কিছু আওয়াজ এসেছে।

বিদ্যুৎবেগে পেছনে ফের অতীন, আর দৌড়ে গিয়ে কামরাটার ভেতর থেকে হিড়হিড় করে টেনে বের করে আনে মিতাকে।

“মিতা না, তোর নাম? আমাদের কথা শুনছিলি?”

“না, না,'' প্রতিবাদ করে মিতা, “শরীর খারাপ করছিল, তাই বিশ্রাম নিচ্ছিলাম, হুজুর। আপনাদের কোনও কথা শুনিনি।”

টানতে টানতে মিতাকে নিয়ে আসে অতীন। চোখ দিয়ে জল পড়ে মিতার, “যেতে দিন হুজুর। পার্টিতে কাজ আছে।”

“চুপ। কোথাও যাবি না।'' ধমক দেয় অতীন।

চিকের পেছন থেকে রজতের গলা ভেসে আসে আসে, “কী করছ অতীন?”

"কী করছি মানে?'' বিরক্তির সুরে উত্তর দেয় অতীন, "এ মেয়েটা আড়ি পাতছিল। একে জিজ্ঞাসাবাদ করতে হবে। কার হয়ে কাজ করে, আর কী শুনেছে!"

"জিজ্ঞাসাবাদ আবার কী করবে,'' ভাবলেশহীন গলায় বলে রজত, "গলায় তলোয়ারটা চালিয়ে দাও, কাজ মিটে যাবে।"

এমন নিরুত্তাপ কণ্ঠে মানুষ মারার নির্দেশ শুনে অতীনের মতো পোড়খাওয়া তলোয়ারবাজও যেন চমকে ওঠে। ইতস্তত করে বলে, "এইসব চুনোপুঁটির জন্যে অত ঝামেলা করে লাভ নেই।"

"ঠিক আছে। তাহলে আমার কাছে রেখে দিয়ে নিজের কাজে যাও।" আবার সেই ভাবলেশহীন গলায় বলে রজত, "আমায় যা কাজ দিয়েছ, আজকের মধ্যেই শেষ করার চেষ্টা করব।"

"ঠিক আছে তাহলে।'' মিতাকে রজতের চিকের কামরায় ঢুকিয়ে দিয়ে অতীন বিদায় নেয়।

৯

পার্টি হাউসের সামনের হলঘরে ফুর্তির তুফান বইছে। মাটিতে গড়াগড়ি যাচ্ছে মানুষ আর মদের বোতল, বেসুরো গানের সঙ্গে মিশছে হাসির হররা, মোমবাতির সুগন্ধে মিশছে নানান মদের ঝাঁজালো গন্ধ।

হলঘরের একদিকে বসে চোয়াল শক্ত করে সেদিকে তাকায় সোমনাথ, "এরা পলটনের ফৌজি, না রান্ডিখানার দালাল? এদের নিয়ে আমাদের একদিন হকিন্সাবাদ কুচ[১১] করতে হবে? লোকে তো আমাদের গায়ে থুতু দেবে।"

মাথা নেড়ে সায় দেয় বিপুল, "হ্যাঁ। সব অতীনের দোষ। যাকে পেরেছে, পলটনে ঢুকিয়েছে।''

"অতীনের মাথায় আজকাল মেয়েছেলে ছাড়া কিছু নেই। ওর হাবভাবে মনে হয় যেন দৌলতনগরে ও ফুর্তি করতে এসেছে। লড়াইয়ের তৈয়ারি করতে নয়।" সোমনাথের গলায় বিতৃষ্ণা ঝরে পড়ে।

"হ্যাঁ, দেখলে না, বাচ্চা মেয়েটাকে কী বলল? নির্লজ্জ মাগিবাজ একটা।"

জ্বলন্ত দৃষ্টিতে বিপুলের দিকে তাকায় সোমনাথ, “আর বাড়তে দেওয়া যায় না। অতীনকে আজকের মধ্যেই সরিয়ে দিতে হবে।”

“এখানে?”

একটা মদের বোতল গড়িয়ে আসে সোমনাথের কাছে। ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে সেটার দিকে তাকায় সোমনাথ, “না, এখানে না। এখানে ঝামেলা হতে পারে, অনেক লোক আছে। একটু বাদে ও মোহিনী কুঠিতে যাবে, নিজের বাঁধা মেয়েছেলের কাছে। সেখানে।”

কপালে ভ্রূ তোলে বিপুল, “তুমি আর আমি?”

“হ্যাঁ।” উত্তর দেয় সোমনাথ, “আর আরও দুজনকে সঙ্গে নিয়ো।”

“আর রাজেন?”

“অতীনকে খতম করে ফেরার পর আমাদের ছেলেদের কোনও একটা ছুতোয় ওর ওপর লেলিয়ে দিলেই হবে।” নিচু স্বরে উত্তর দেয় সোমনাথ।

বাইরের দরজার দিকে চোখ তুলে ইঙ্গিত করে বিপুল, “অতীন বেরিয়ে যাচ্ছে!”

“যেতে দাও। ওর দিকে তাকিয়ো না। আধ ঘণ্টা বাদে আমরা বেরোব, যাতে কারও সন্দেহ না হয়।”

“ঠিক আছে। ততক্ষণে আমি আরও দুজনকে বলে রাখছি।”

১০

পার্টি হাউসের বাইরে দাঁড়িয়ে-থাকা রবি কপাল কুঁচকোয়, “সাহেব, কিছু একটা গণ্ডগোল হচ্ছে।”

“কেন?” হাউসের জানলা দিয়ে ভেসে-আসা আলো আর হুল্লোড়ের শব্দের দিকে তাকিয়ে বলে হিমু।

“একজন বেরিয়ে খুব সম্ভব মোহিনী কুঠির দিকে গেল। তার আধ ঘণ্টা বাদে আরও চারজন বেরিয়ে হন্তদন্ত হয়ে তার পেছনে পেছনে গেল। আমার খুব একটা ভালো ঠেকছে না।”

“তাহলে কী করব আমরা?”

“না! আমাদের কিছু করার নেই। আমাদের দরকার তো রজতকে। আমাদের এখানেই অপেক্ষা করতে হবে।”

১১

চিকের কামরার ভেতরে গ্লাসে ঠররা ঢালে রজত। সামনে বসা মেয়েটার দিকে তাকিয়ে বলে, “চুপচাপ বসে থাকো। যদি আওয়াজ করো কিংবা পালাতে চেষ্টা করো, গলায় তলোয়ার চালিয়ে দেব।”

“না হুজুর, আওয়াজ করব না।'' এককোণে জড়সড়ো হয়ে বসে থাকে মিতা।

ঠররার গ্লাসটা এক চুমুকে খালি করে দেয় রজত। আজকাল ঠররা ছাড়া সে এক মুহূর্ত থাকতে পারে না। নেশা কেটে গেলেই তার মনের মধ্যে অনেক মুখ ভিড় করে আসে। বিজন, রিমা, চিরাগ আখড়ার তলোয়ারবাজরা, আরও অনেক নাম-না-জানা মুখ। আগে মানুষ মারলে তার ভেতরের বুভুক্ষাটা যেমন তৃপ্তি পেত, আজকাল সেটাও যেন সে অনুভব করতে পারে না। মনে হয়, তার ভেতরটা কেমন অসাড় হয়ে গেছে।

ভয়ার্ত মুখে বসে-থাকা মেয়েটাকে কেমন আবছা লাগে রজতের। শুধু মেয়েটা নয়, আজকাল সবাইকে কেমন আবছা লাগে রজতের। যেন সব ছায়া দিয়ে তৈরি।

একটা আওয়াজ হয়, যেন কে যন্ত্রণায় গোঙাচ্ছে। মিতার দিকে তাকিয়ে ধমক দেয় রজত, “বললাম না কোনও আওয়াজ না করতে।”

“আমি আওয়াজ করিনি, হুজুর।'' ভয়ে ভয়ে বলে মিতা, “তবে লোকে বলে, এই গম্বুজের নীচে নানা আওয়াজ শুনতে পাওয়া যায়।”

“লোকে বলে।” ভাবলেশহীন গলায় বলে রজত।

“হ্যাঁ, হুজুর। নানা আওয়াজ শুনতে পাওয়া যায়, নানা দৃশ্য দেখতে পাওয়া যায়।''

“দৃশ্য।” গলায় ঠররা ঢেলে দিয়ে চোখ বোজে রজত, “হ্যাঁ, আমিও একটা দৃশ্য দেখতে পাচ্ছি। উত্তর-পশ্চিমের উঁচু পাহাড়গুলো যেন মিশে গেছে মেঘের মধ্যে। পাহাড়ি হাওয়ার শব্দ হচ্ছে। উপত্যকা থেকে মাঝেমধ্যে ভেসে আসছে কাইজারী মহামৃগের ডাক। কচি সবুজ পাতাগুলো কাঁপতে কাঁপতে ছড়িয়ে দিচ্ছে কলকে ফুলের বুনো গন্ধ।”

“আমিও এইরকম একটা দৃশ্য দেখেছিলাম।” মিতা বলে।

“তুমি দেখেছিলে?’’ চোখ খোলে রজত, “কোথায়?”

“কালভৈরব পাসে।”

“কালভৈরব পাস!” বিস্মিত কণ্ঠে বলে রজত।

“হ্যাঁ, হুজুর! আপনি চেনেন জায়গাটা?”

“হ্যাঁ, চিনি! ভালো করে চিনি।” গলায় ঠররা ঢালে রজত, “তুমি চেনো?”

“হ্যাঁ, হুজুর। একবার গিয়েছিলাম।”

“আশ্চর্য! দৌলতনগরের মেয়ে কালভৈরব পাস যাবে কেন?” তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে মিতার দিকে তাকায় রজত।

“আমরা গোডেলগাঁও থেকে আসছিলাম, হুজুর। আমি আর আমার দাদু। বছর দুয়েক আগে।’’ মাটির দিকে চোখ নামিয়ে বলে মিতা।

রজতের দু-চোখ বিস্ফারিত হয়ে ওঠে। বেড়ে যায় তার শ্বাসপ্রশ্বাসের গতি।

মিতা লক্ষ করে না, তার মুখ নিচু করা।

“আমি জল আনতে গিয়েছিলাম, তার মধ্যে কেউ এসে দাদুর ওপর তলোয়ার চালিয়ে দেয়।” ফুঁপিয়ে ওঠে মিতা।

ছিটকে লাফিয়ে ওঠে রজত। সে কোথাও দূর থেকে শুনতে পায় একটা বৃদ্ধের কণ্ঠস্বর, ‘হে বাবা কালভৈরব! হে বাবা কালভৈরব!’

ভয়ার্ত চোখে চারপাশে তাকায় রজত। ওই যে, ওই চিকের গায়ে ও কীসের ছায়া? কোনও বৃদ্ধ হাঁটু গেড়ে বসে প্রার্থনা করছে?

চিৎকার করে তলোয়ার টেনে নেয় রজত, চিকটাকে কোপাতে শুরু করে পাগলের মতো। আর্তনাদ করে দূরে সরে যায় মিতা।

আবার একটা কণ্ঠস্বর শুনতে পায় রজত। অনুনয়ের সুরে কে বলছে, ‘আমাকে এখানেই মেরে ফ্যালো রজত।’ কে ও? কার ছায়া ওই চিকের গায়ে, ওই ছায়াটাই কি বলছে, ‘তুমি না থাকলে আমার জীবনটা এমন নরক হয়ে উঠত না?’

পাগলের মতো আবার একটা চিক কোপায় রজত। দৌড়ে গম্বুজ ঘর থেকে পালিয়ে যায় মিতা।

আবার কি আর-একটা চিকের ওপর ছায়া পড়েছে? ওই ছায়াই কি তলোয়ার হাতে বলছে, ‘ভেবেছিস, বিজনের মৃত্যুর বদলা না নিয়ে তোকে ছেড়ে দেব?’

গম্বুজ ঘরের সব ক-টা চিক কুপিয়ে মাটিতে ফেলে দেয় রজত। কিন্তু তা-ও তো ছায়াগুলো তার চারপাশে ভিড় করে আসে। তা-ও তো কণ্ঠস্বরগুলো থামে না।

'নালায়েক, নামর্দ!'

'বুড়ো মানুষ হাঁটতে হাঁটতে হাঁপিয়ে পড়েছি।'

'মানুষ মারা ছাড়া তুমি জানোই বা কী?'

'মৃত্যু তোর প্রাপ্য নয়?'

দু-হাতে নিজের চারপাশে এলোপাথাড়ি তলোয়ার চালায় রজত। তার ডান হাঁটু ভাঁজ করা, ডান ঊরু মাটির সঙ্গে সমান্তরাল। বন্য শ্বাপদের মতো তার খোলা মুখের দু-পাশ দিয়ে ঝরে পড়ে লালা।

আর-একটা নতুন কণ্ঠস্বর শুনতে পায় রজত।

"এই রাজেন, কী করছ?"

কে ও ছায়া? না মানুষ? পার্থক্য করতে চেষ্টা করে না রজত। তলোয়ার চালিয়ে দেয় কণ্ঠস্বর লক্ষ্য করে। একটা আর্তনাদের আওয়াজ হয়। আরও কণ্ঠস্বর শোনা যায়।

"পাগল হয়ে গেছে।"

'নালায়েক, নামর্দ!'

"মাথায় খুন সওয়ার হয়েছে। দূরে থাক!"

'হে বাবা কালভৈরব! হে বাবা কালভৈরব!'

প্রতিটি কণ্ঠস্বর লক্ষ্য করে পাগলের মতো তলোয়ার চালায় রজত। ছায়া-কায়ার তফাত সে বুঝতে পারে না। প্রতিটি চেহারাই ঝাপসা দেখায় তার চোখে।

"অতীনকে ডাক! সোমনাথকে!" কেউ চ্যাঁচায়।

"অতীন মোহিনী কুঠিতে।"

অতীন! সোমনাথ! রজতের একটা কথা মনে পড়ে যায়। অতীন তাকে একটা কাজ দিয়েছিল।

"বিপুল! সোমনাথ!" চিৎকার করতে করতে গম্বুজ ঘর থেকে বেরিয়ে আসে রজত।

বিপুল, সোমনাথ আর তাদের দুই সহকারী তলোয়ার হাতে মোহিনী কুঠির ভেতর এসে দাঁড়ায়। তাদের পেছনে শরীরের রক্তে চৌকাঠ ভেজায় কুঠির দরোয়ান। মোহিনী কুঠির বাইজি আর তাদের সহকারীরা সব পার্টি হাউসে, কুঠি এখন তাই ফাঁকা। কেবল মালকিনের ঘরের তলায় দেখা যায় নীল আলোর রেখা। দরজা ঠেলে ভেতরে ঢোকে সোমনাথ, পেছনে বাকিরা।

লাক্ষার নকশা-তোলা টেবিলের পেছনে খাতাপত্র দেখতে-থাকা মোহিনীর চোখ চারজন তলোয়ারবাজকে একসঙ্গে দেখে আতঙ্কে বিস্ফারিত হয়ে ওঠে।

ভণিতা না করে শান্ত গলায় প্রশ্ন করে সোমনাথ, "অতীন কোথায়?"

আঙুল তুলে ওপরের দিকে দেখায় মোহিনী, "দোতলায়। দশ নম্বর ঘর।"

আর দ্বিতীয় বাক্যটি খরচ না করে তার গলায় তলোয়ার চালিয়ে দেয় সোমনাথ। মোহিনীর গলা থেকে ছিটকে-আসা রক্ত টেবিলের খাতাপত্রের সাদা কাগজে লাল কালিতে জীবন-মৃত্যুর হিসেব লিখতে থাকে।

পা টিপে টিপে দোতলায় ওঠে চারজনে। সিঁড়ির পর একটা লম্বা করিডর। তার দু-পাশে বন্ধ দরজা, তাদের মাথায় নম্বর লেখা।

নম্বর মিলিয়ে মিলিয়ে একটা ঘরের সামনে এসে তার দরজায় কান পাতে বিপুল। তারপরে মাথা নাড়ে।

সহকারী দুজনের দিকে তাকিয়ে নিচু স্বরে সোমনাথ বলে, "একটা তোশক নিয়ে আয়।''

পাশের একটা খালি ঘরের বিছানা থেকে তোশক তুলে আনে দুজনে।

বন্ধ ঘরের দরজায় লাথি মারে বিপুল। ছিটকিনি ভেঙে সজোরে ভেতরদিকে ছিটকে খুলে যায় দরজা। ভেতরে নজরে আসে বিছানায় শোয়া নীরার শরীরের ওপর উপুড় হয়ে ওঠানামা করতে-থাকা অতীনের উলঙ্গ দেহটা।

দৌড়ে গিয়ে তাদের অতীনের ওপর তোশকটা ফেলে দেয় সোমনাথের দুই সহকারী। তারপর চারজনে মিলে তোশকের ভেতর দিয়ে তার শরীরের ওপর তলোয়ারের খোঁচা মারতে আরম্ভ করে।

অতীনের তলা থেকে নগ্ন দেহে বেরিয়ে এসে দরজার দিকে পালাতে চেষ্টা করে নীরা। কিন্তু তার আগেই তার ঘাড়ে সোমনাথের তলোয়ারের কোপ পড়ে। মাটিতে আছড়ে পড়ে

নীরা, তার মাথাটা দেহ থেকে প্রায় বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

তোশকটা টেনে ফেলে দেয় বিপুল। বিছানার ওপর রক্তাক্ত শরীরে পড়ে হাঁপায় অতীন।

“খতম করে দাও।” হুকুম দেয় সোমনাথ।

অতীনকে বিছানা থেকে টেনে নামিয়ে একটা দেওয়ালের গায়ে ঠেসে ধরে দুই তলোয়ারবাজ। তার গলার সামনে বাঁ হাতের কবজিটা ধরে বিপুল, তারপর কবজির ওপর তলোয়ারের ফলাটা শুইয়ে রেখে ডান হাতের চাপে তার ডগাটা গেঁথে দেয় অতীনের গলায়।

অতীনকে খতম করে রাস্তায় এসে দাঁড়িয়েছে চারজন, পার্টি হাউসের দিক থেকে ছুটতে ছুটতে আসে কওমি পলটনের একজন সদস্য।

“অতীন কোথায়?’’ হাঁপাতে হাঁপাতে জিজ্ঞাসা করে সে।

“কেন? কী হয়েছে?” পালটা প্রশ্ন করে সোমনাথ।

“রাজেন পাগল হয়ে গেছে। যাকে পারছে, মারছে।”

বিনা বাক্যব্যয়ে তলোয়ারের আঘাতে লোকটার পেট চিরে দেয় সোমনাথ। তারপর দৌড় দেয় পার্টি হাউসের দিকে।

১৩

পার্টি হাউসের বাইরে দাঁড়িয়ে-থাকা রবি ঘনঘন মাথা ঝাঁকায়, “নাঃ! কিছু একটা সমস্যা তো হয়েছেই। প্রথমে একজন বেরিয়ে গেল, তারপর তার পেছনে পেছনে চারজন গেল। তারপরে আবার একটু আগে একজন দৌড়োতে দৌড়োতে গেল!’’

“ভেতর থেকে চ্যাঁচামেচির আওয়াজও আসছে।” পার্টি হাউসের জানলার দিকে তাকিয়ে বলে হিমু।

“হ্যাঁ, এদের নিজেদের মধ্যে কিছু ঝামেলা লেগেছে মনে হচ্ছে।’’

রাস্তার দিকে তাকায় হিমু, “যে চারজন গিয়েছিল, তারা আবার ফিরে আসছে।”

ছুটতে ছুটতে চারজন পার্টি হাউসে ঢুকে পড়ে। ভেতরে গোলমালের শব্দ বেড়ে যায়।

উদ্‌বিগ্ন দৃষ্টিতে পার্টি হাউসের দিকে তাকায় হিমু, “এদের নিজেদের মধ্যে মারামারি লেগে গেল নাকি? মিতা—’’

হিমুর কথা শেষ হয় না, আর্তনাদ করতে করতে পার্টি হাউস থেকে ছুটে বেরিয়ে আসে কোঠার সমস্ত বাইজি, বাজনদার আর অন্য সব কর্মচারী। সেই ভিড়ে হিমু দেখতে পায় মিতাকেও। হাত নাড়ে সে, "মিতা!"

ছুটতে ছুটতে হিমুর কাছে এসে দাঁড়ায় মিতা, "যাকে আপনি খুঁজছিলেন, রজত না রাজেন, সে পাগল হয়ে গেছে।"

"পাগল হয়ে গেছে?" বিস্মিত কণ্ঠে বলে হিমু।

"হ্যাঁ! যাকে সামনে পাচ্ছে, মারছে! পাগলের মতো চিৎকার করছে!'' হাঁপাতে হাঁপাতে বলে মিতা।

১৪

চিৎকার করতে করতে এলোপাথাড়ি তলোয়ার চালায় রজত। আজ তার তলোয়ারবাজিতে কোনও নৈপুণ্য নেই, কায়দা নেই, তরিকা নেই। উদ্ভ্রান্তের মতো সে যেদিকে পারে, তলোয়ারের কোপ মারে। তাকে ঘিরে-ধরা কওমি পলটনের তলোয়ারবাজদের তলোয়ারের খোঁচায় তার শরীরের নানা জায়গা থেকে রক্ত ঝরে, কিন্তু তা-ও তার ভ্রূক্ষেপ নেই। তার তলোয়ারের কোপ কখনও হাওয়ায় পড়ে, কখনও দেওয়ালে, কখনও তার ধাক্কায় তাক থেকে উলটে পড়ে মোমবাতি, ভেঙে টুকরো হয়ে যায় ঠররার বোতল। মোমবাতির আগুন আর ঠররার কোহলের মিশ্রণে আগুন লেগে যায় দু-এক জায়গায়। তবু তারই মধ্যে উন্মাদের মতো তলোয়ার চালায় রজত।

একজন পেছন থেকে দৌড়ে আসে মাথার ওপর তলোয়ার তুলে। সে কাছে আসতেই দু-হাতে তলোয়ার কাঁধের ওপর তুলে তার পেটে আড়াআড়ি আঘাত করে রজত। তারপর সে ছিটকে গড়িয়ে পড়ে যেতেই আবার এলোপাথাড়ি তলোয়ার চালাতে আরম্ভ করে।

একটা স্বল্প পরিসর জায়গায় রজতকে ঘিরে ধরে চার-পাঁচজন। রজতের তলোয়ার নীচ থেকে লম্বালম্বি উঠে যায়, পেট থেকে বুক অবধি চিরে দেয় একজনের। আর-একজনের সামনে থেকে সরে গিয়ে সে কোপ মারে তার কোমরের ডানদিকে।

রজতের তলোয়ার কখনও ওপরে উঠে নীচে নামে, কখনও নীচ থেকে ওপরে ওঠে। আর প্রত্যেকবার তার পায়ের কাছে গড়িয়ে পড়ে লাশ।

আর প্রত্যেকবারই তাকে ঘিরে-থাকা ছায়ামূর্তির দলে যোগ দেয় আর-একজন।

চিৎকার করে রজত, মাথা ঝাঁকায়, তার মাথা থেকে ছিটকে যায় স্বেদবিন্দু, শরীর থেকে ছিটকে যায় রক্তের ফোঁটা।

ছড়িয়ে-পড়া আগুন এবার উঠতে থাকে দেওয়াল বেয়ে। রজতের ভেতরের বুভুক্ষাটাও যেন আগুন হয়ে হাহাকার করে তার চারপাশে।

"পাগল হয়ে গেছে, একদম পাগল হয়ে গেছে! মার! মেরে ফেল শালাকে!"

চেনা-চেনা লাগে গলাটা। কে? কে ও? ধোঁয়ার মধ্যে দিয়ে দেখার চেষ্টা করে রজত।

হ্যাঁ। সোমনাথ! কী যেন কাজ ছিল একটা সোমনাথের সঙ্গে?

'যত তাড়াতাড়ি পারো। পারলে আজকালের মধ্যেই।'

কে বলল? সোমনাথের পাশে কে ও? অতীন? হ্যাঁ অতীন।

হ্যাঁ, মনে পড়েছে। অতীন বলেছিল, সোমনাথকে মারতে হবে।

টলতে টলতে এগোয় রজত।

দেওয়ালের কোণ থেকে বেরিয়ে এসে কেউ তার কাঁধে তলোয়ারের কোপ মারে। তাকে একদিকে ঠেলে দিয়ে তার পেটে তলোয়ার পুরো গুঁজে দেয় রজত।

সামনে দুজন মাথার ওপর তলোয়ার তোলে। রজতের এক হাতে ধরা তলোয়ার ডানদিক থেকে বাঁদিকে গিয়ে তাদের দুজনের পেট একটানে একই সঙ্গে চিরে দেয়। পেছন থেকে কেউ এই সুযোগে তার পিঠে তলোয়ারের কোপ মারে। পেছন ফিরে রজত তার থুতনির নীচে তলোয়ার লম্বালম্বিভাবে ঢুকিয়ে দেয়।

ছায়ামূর্তির দল ভারী হয়।

আগুন এবার ছাদ স্পর্শ করে। ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে আসে চারপাশ।

সামনে দুজন তার পথ আটকায়। তাদের পেছন থেকে সোমনাথ চ্যাঁচায়, "মার, মার শালাকে, মেরে ফেল।"

ডান কানের কাছের তলোয়ার-ধরা হাতের দুই মুঠি তুলে তাকে একজন আক্রমণ করে। রজতের তলোয়ার নেমে আসে তার বাঁ পাঁজরে। দ্বিতীয়জন এবার মাথার ওপর তলোয়ার তোলে। তার ডান হাত আর পাঁজরের মধ্যে তলোয়ার একবার ঢুকিয়ে দিয়েই সোমনাথকে লক্ষ্য করে ঝাঁপ দেয় রজত।

তলোয়ার চালানোর সুযোগ পায় না সোমনাথ, রজতের শরীরের ধাক্কায় পড়ে যায় মাটিতে। তার বুকের ওপর হাঁটু দিয়ে চেপে ধরে রজত। নিজের তলোয়ার দিয়ে রজতের

শরীরে বারংবার কোপ মারে সোমনাথ। পেছন থেকেও তার পিঠে পড়ে আরও তলোয়ারের কোপ। কিন্তু সব অগ্রাহ্য করে তলোয়ারের ধার সোমনাথের গলায় রেখে করাতের মতো ঘষতে থাকে রজত।

হাহাকার করে জ্বলে আগুন, ছিটকোয় রক্ত, জান্তব চিৎকার করে রজত। শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় সোমনাথের মাথা।

সোমনাথের কাটা মাথা এক হাতে ধরে তলোয়ারে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়ায় রজত। তাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে-থাকা তলোয়ারবাজরা তলোয়ার ওঠায়, কিন্তু তাকে আক্রমণ করে না।

সোমনাথের মাথাটা নিজের মুখের কাছে ধরে কিছুক্ষণ ঘাড় বেঁকিয়ে দ্যাখে রজত, তারপর ছুড়ে ফেলে দেয় আগুনের মধ্যে।

তার সামনে দাঁড়ানো তলোয়ারবাজদের দিকে চোখ যায় রজতের। কে ওই লোকটা? বিপুল? হ্যাঁ, বিপুল। বিপুলের পাশে কে ও, সোমনাথ? সোমনাথ মরেনি? না, না, সোমনাথকে মারতে হবে, অতীনের নির্দেশ।

তলোয়ার তুলে বিপুলের দিকে তেড়ে আসে রজত।

রজতের সঙ্গে লড়াই করার আগ্রহ দেখায় না কেউ। চতুর্দিকে দাউদাউ করে আগুন জ্বলছে। ছত্রভঙ্গ হয়ে যে যেদিকে পারে পালায়।

অবসন্ন শরীরে টলতে টলতে এগোয় রজত। সোমনাথ? সোমনাথ কোথায় গেল? ওই যে, ওখানে একটা দরজা। সোমনাথ নিশ্চয়ই ওদিকেই গেছে।

দরজা দিয়ে টলতে টলতে জ্বলন্ত পার্টি হাউসের বাইরে এসে পড়ে রজত। বাইরে লোকের ভিড়। কিন্তু সবাই কেন ওভাবে তাকিয়ে আছে তার দিকে?

ভিড়ের সামনে কে? হিমু? হিমুর পেছনে কে? বিজন? আর তার পাশে ওটা কে দাঁড়িয়ে? রিমা? ওই তো গালে টোল-পড়া মেয়েটা। তার পেছনে কালভৈরব পাসের বুড়োটা। ওই তো অতীন আর সোমনাথ। তাদের পেছনে চিরাগ আখড়ার তলোয়ারবাজরা। তাদের পেছনে আরও লোক। কে ওরা? আর মানুষের পেছনে ওরা কারা? পোশাক-পরা উটিয়া বাঁদর? আর তাদের পেছনে দাউদাউ করে কী জ্বলে? শহর? গ্রাম? আর জ্বলন্ত শহরের পেছনে ওই যে নিকষকালো আকাশ, কোথা থেকে এল ওটা?

না। এসব সে বুঝতে চায় না। তার পেছনের জ্বলন্ত বাড়িতে আগুনের মধ্যে থেকে হাহাকার করে কে যেন তাকে ডাকে। ওই বুভুক্ষার হাহাকার সে চেনে। ওই বুভুক্ষার কাছে

নিজেকে সঁপে দেবে সে।

তলোয়ার তুলে উন্মাদের মতো চিৎকার করতে করতে আগুনের মধ্যে ঝাঁপ দেয় রজত।

কালভৈরব পাস

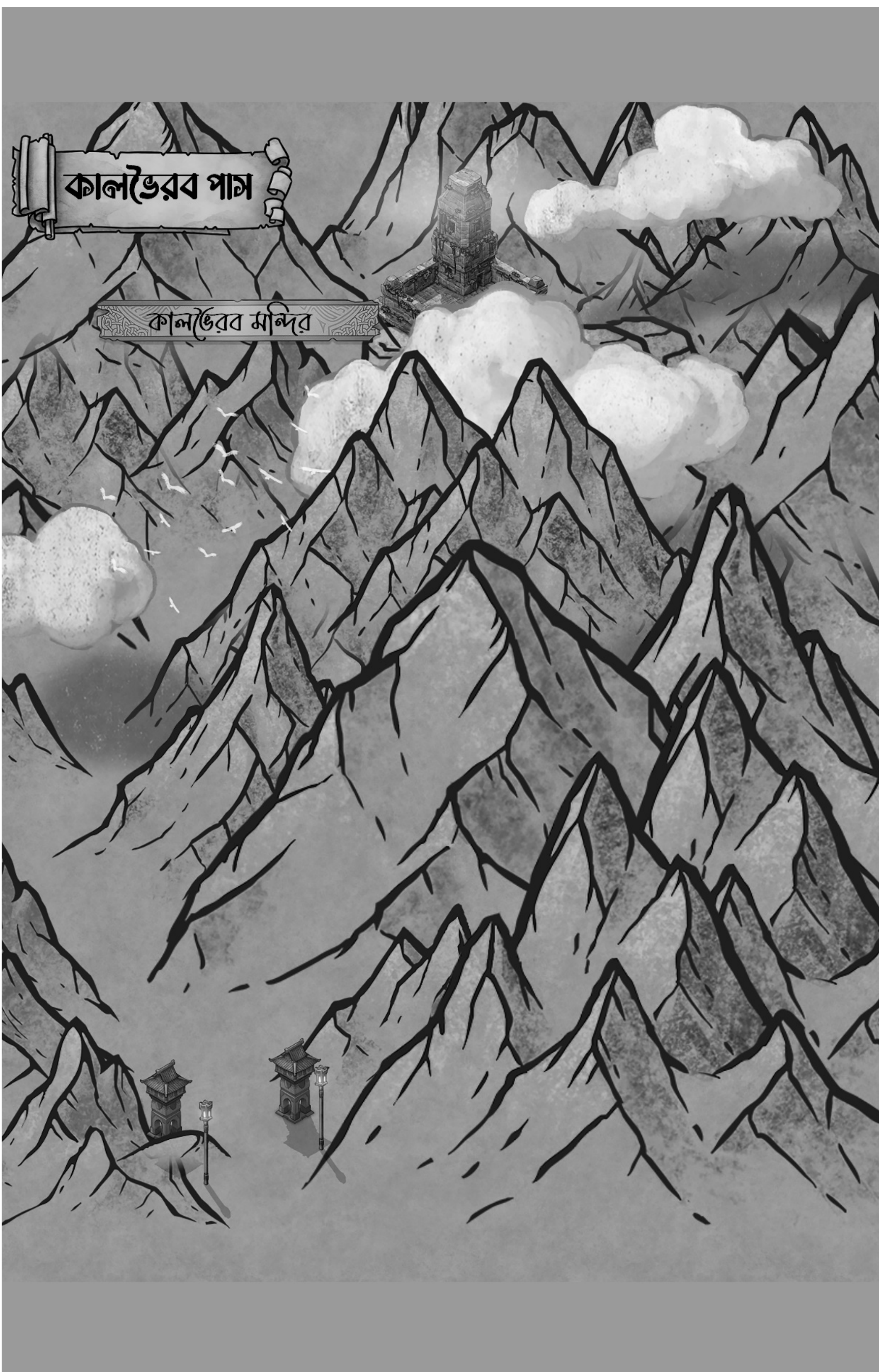


হিমশীতল রাতের পর
ঘণ্টার নিষ্কলুষ শব্দ
নশ্বর জগতে ভোর আসে



আজ,
আমাদের জীবনে প্রতিবিম্ব
ঘাসের শিশিরে




কালভৈরব পাস
কালভৈরব মন্দির



১

আখড়ার ঘরে কিষেনপ্রতাপের সামনে বসে রবি, মিতা আর হিমু। একটু আগেই মিতা তার অভিজ্ঞতার কথা শোনানো শেষ করেছে তাঁকে।

গম্ভীরভাবে মাথা নাড়েন কিষেনপ্রতাপ, “মিতার ইতিহাস জানার পরই রজতের পাগলামি আরম্ভ হয়। গম্বুজ ঘরের যন্ত্র খুব সম্ভব ওর ভেতরের অপরাধবোধকে বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়ে থাকবে।”

“তাহলে কি ভিন্নররা ওই কাজের জন্যেই গম্বুজ ঘরগুলো বানিয়েছিল, ওস্তাদ?” প্রশ্ন করে হিমু।

“খুব সম্ভব।”

“কিন্তু তা-ও তো তারা টিকে থাকতে পারেনি!”

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে উত্তর দেন কিষেনপ্রতাপ, “হয়তো তাদের বিপদ বুঝতে অনেক দেরি হয়ে গিয়েছিল। কিংবা হয়তো ওই কয়েকটামাত্র যন্ত্র লড়ার জন্যে যথেষ্ট ছিল না। কিন্তু তা হলেও, এই অদৃশ্য শত্রুর বিরুদ্ধে লড়ার একটা সূত্র তো পাওয়া গেল!”

“আমি তাহলে এখন কী করব, ওস্তাদ?”

“অম্বালিকা ফের এখন গৃহযুদ্ধের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে। হকিন্সাবাদ আর নিরাপদ জায়গা নয়। আমি আখড়া বন্ধ করে দিয়ে অসিমঠ চলে যাব। তুমি মিতাকে হোমিগঞ্জে রেখে অসিমঠে চলে এসো। তোমার তালিম এখনও বাকি আছে।”

রবির দিকে তাকান কিষেনপ্রতাপ, “তুমি কী করবে? কিছু ভেবেছ?”

“হ্যাঁ হুজুর, ঠিক করে নিয়েছি। আমি মিতার সঙ্গে হোমিগঞ্জেই থাকব। এই হিমু সাহেব না-ফেরা অবধি একটু সব দিকে নজরে রাখব।”

প্রশ্নের ভঙ্গিতে কপালে ভুরু তোলেন কিষেনপ্রতাপ।

ঠোঁট উলটে মাথা ঝাঁকায় রবি, “হ্যাঁ, হুজুর! চতুর্দিকে চোরছ্যাঁচড়ে একেবারে ভরে গেছে, হুজুর। সব চোখে চোখে না রাখলে আবার কোথায় কী ঘটে, বলা যায় না।”

কিষেনপ্রতাপের ঠোঁটের কোণে হালকা হাসিটা কারও নজরে পড়ে না।

২

কালভৈরব পাসের ছায়া-মাখা রাস্তা ধরে হোমিগঞ্জের দিকে হাঁটে তিনজন— হিমু, মিতা আর রবি। নির্জন রাস্তায় মাঝেমধ্যে চিল-বেড়ালের চিৎকার ছাড়া আর কিছু শোনা যায় না।

হাঁটতে হাঁটতে আঙুল তোলে হিমু, “ওই তো, কালভৈরবের মন্দিরের রাস্তা।”

পিঠে বাঁধা ব্যাগটা ঝাঁকিয়ে ঠিক করে মিতা, “চলো, যাওয়ার আগে একবার প্রণাম করে যাই।”

মন্দিরের ঢালু রাস্তাটা দিয়ে কিছুটা উঠেছে হিমু আর মিতা, একটা ‘উঃ’ আওয়াজ করে রবি দাঁড়িয়ে পড়ে।

“কী হল, কাকা?’’ উদ্‌বিগ্ন স্বরে বলে মিতা।

“কিছু না! এই একটা শেকড়ে পা আটকে আঙুলটা মচকে গেল। তোমরা যাও, আমি আসছি।”

“তুমি ঠিক থাকবে তো কাকা?”

“আরে হ্যাঁ হ্যাঁ,’’ আশ্বস্ত করে রবি, “তেমন কিছু হয়নি। একটু বসলেই ঠিক হয়ে যাবে।’’

হিমু আর মিতার চেহারা দুটো গাছের আড়ালে মিলিয়ে যেতেই একটা কান-এঁটো-করা হাসি হেসে পাইপ ধরায় রবি। তার মুখ দেখে বোঝা যায় না যে তার শরীরে কোনও ব্যথা আছে।

পাহাড়চুড়োয় উঠে মন্দিরের সামনেটা দেখায় মিতা, “দাদু ওখানেই—,’’ গলা ধরে আসে তার।

চুপ করে থাকে হিমু, মিতাকে সান্ত্বনা জানানোর ভাষা খুঁজে পায় না সে।

এক হাতে চোখের জল মুছে মিতা মন্দিরের দিকে তাকায়, “এখানে এলে তো কিছু দিতে হয়। কী দিই?”

মৃদু হেসে দু-হাত ওলটায় হিমু, “আমাকে জিজ্ঞেস কোরো না। আমার কাছে কিচ্ছু নেই।”

পিঠের ব্যাগটা নামিয়ে রেখে হাতড়ায় মিতা। তারপর একটা জরির নকশা-তোলা কাপড়ের টুকরো বের করে আনে, “এইটা দিয়ে দিই?”

কাপড়টার দিকে তাকায় হিমু, “এত দামি জিনিস দিয়ে দেবে?”

“এটা ওই বাইজি কোঠায় আমায় দিয়েছিল। নাচের কাঁচুলি বানানোর জন্যে।” মিতার কান কেমন লাল হয়ে ওঠে, “এ রেখে আর কী করব। যাই, দিয়ে আসি।”

মন্দিরে কাপড় রেখে বেরিয়ে এসে মিতা একটা কী তুলে ধরে। তার দু-চোখে কৌতুক, “দ্যাখো, কী পেলাম।”

“কী?”

“একটা শামুক বাঁশের বাঁশি। বাজাবে?”

“দুর, আমি বাঁশি বাজাতে জানি নাকি?” হেসে ফ্যালে হিমু।

“চেষ্টা করে দ্যাখো-না। এমন কী আর শক্ত জিনিস!” কৌতুকে ঝকঝক করে মিতার চোখ।

মন্দিরের সিঁড়িতে বসে বাঁশিতে ফুঁ দেয় হিমু। বাঁশি থেকে কয়েকটা বেসুরো আওয়াজ ছাড়া কিছু বেরোয় না।

হিমুর পাশে বসে হেসে ঢলে পড়ে মিতা, “ধুস, কিচ্ছু হচ্ছে না।”

বাঁশি নামিয়ে হিমু বলে, “বললাম তো পারি না। তুমিই তো বললে বাজাতে।”

পাশ থেকে রবির আওয়াজ আসে, “আমি বাজাব?”

রবি কখন উঠে এসেছে, হিমু আর মিতা কেউ খেয়াল করেনি।

হিমুর হাত থেকে বাঁশিটা নিয়ে রবির দিকে বাড়িয়ে ধরে মিতা, “তুমি বাঁশি বাজাতে পারো কাকা?”

“রাস্তায়-ঘাটে ঘুরে বেড়াই, ওই একটু-আধটু শিখেছি।” হেসে বলে রবি।

মাটিতে বসে বাঁশিতে ফুঁ দেয় রবি, একটা আনন্দের সুর ভেসে যায় তার বাঁশি থেকে। বাতাস সে সুর ছড়িয়ে দেয় আকাশে, আকাশ থেকে বয়ে নিয়ে যায় মেঘের কোলে মাথা

তুলে রাখা পশ্চিমের বরফ-মাখা পাহাড়ে, পাহাড় থেকে বিছিয়ে দেয় নীচের ঘন বনানীর চাদর মুড়ি-দেওয়া গভীর উপত্যকায়।

কালভৈরব পাসের চুড়োয় বসে তিনটি মানুষ বিশৃঙ্খলার অশুভ শক্তিকে পরাস্ত করার একটি শৃঙ্খল নির্মাণের সূচনা করে।

অদৃশ্য সে শৃঙ্খলের নাম ভালোবাসা।

লেখক পরিচিতি

কল্পবিশ্ব ওয়েবজিনের নিয়মিত লেখক সুমিত বর্ধনের কল্পবিজ্ঞানে লেখার হাতেখড়ি অদ্রীশ বর্ধন সম্পাদিত ফ্যানটাসটিক পত্রিকায় লেখালিখি করার সুবাদে। তাঁর বেশ কয়েকটি নতুন ধারার মৌলিক কল্পবিজ্ঞান উপন্যাস বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। স্ক্রোল ডট ইন পোর্টালে প্রকাশিত হয়েছে তাঁর কল্পবিজ্ঞান সাহিত্যের রিভিউ। কল্পবিজ্ঞান নিয়ে নানা পরীক্ষানিরীক্ষা করা সুমিত বর্ধনের এযাবৎ প্রকাশিত বইয়ের মধ্যে রয়েছে ‘নক্ষত্রপথিক’ এবং বহুচর্চিত বাংলা স্টিমপাঙ্ক থ্রিলার ‘অর্থতৃষ্ণা’।

সমাপ্ত

জাপানি সাহিত্যের পুনর্নির্মাণে রচিত এক কল্পিত গ্রহের
অরাজক, অধঃপতিত সমাজের প্রেক্ষাপটে এক
অপ্রতিরোধ্য রক্তলিপ্সু যোদ্ধার
সংগ্রামের কাহিনি


ISBN 978-81-952443-5-5

মূল্য: ৩০০/-